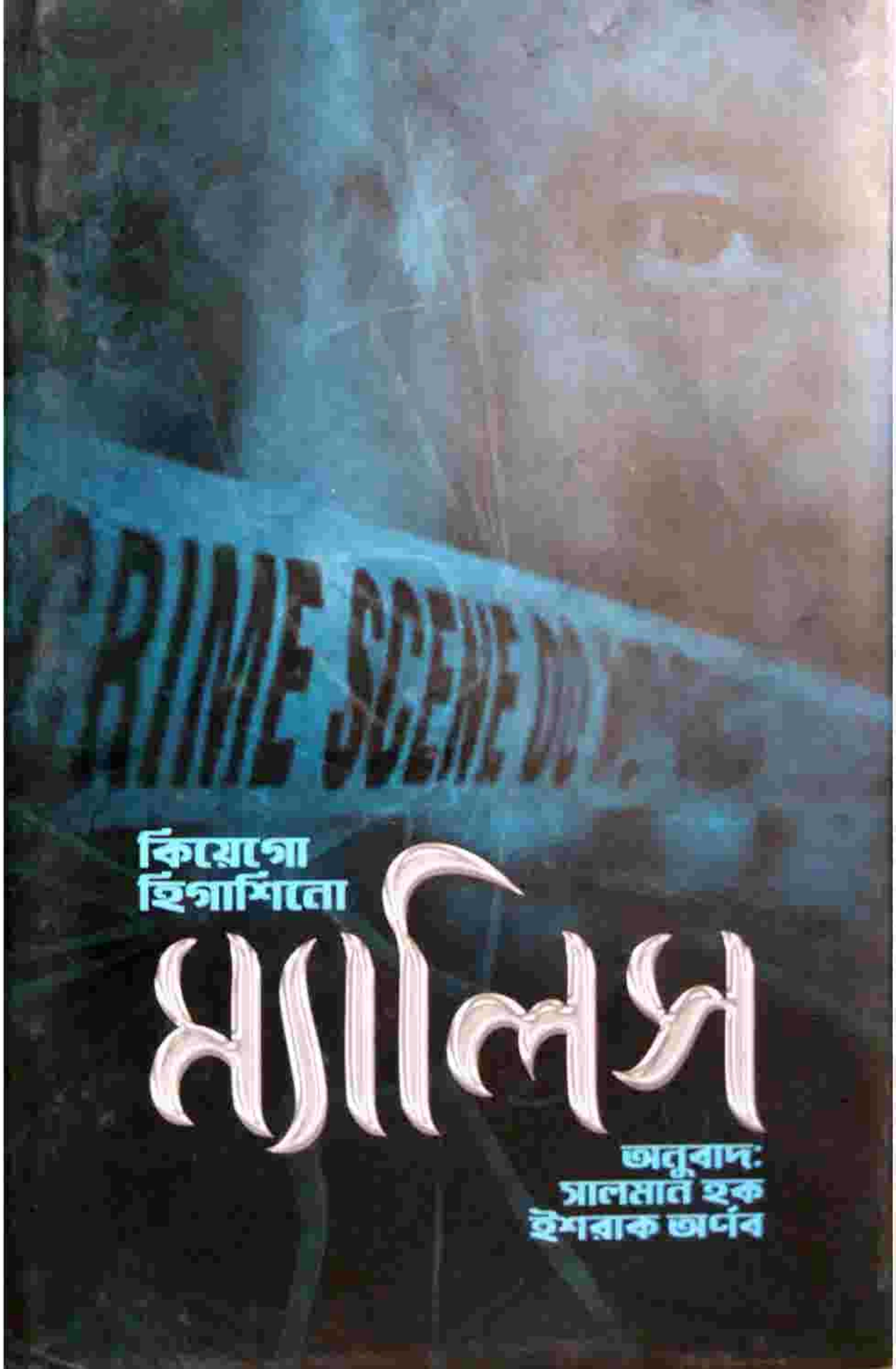
CRIME SCENE DO NOT
কিয়োগো হিগাশিনো
ম্যালিস
অনুবাদ:
সালমান হক
ইশরাক অর্ণব

জাপান থেকে কানাডায় পাড়ি জমানোর ঠিক আগের রাতে নৃশংসভাবে খুন হলেন দেশবরেণ্য লেখক কুনিহিকো হিদাকা। নিজ বাসগৃহে বন্ধ অফিসঘরে হিদাকার মৃতদেহ আবিষ্কার করে তার স্ত্রী এবং সবচেয়ে কাছের বন্ধু, যাদের দু'জনেরই আছে শক্তপোক্ত অ্যালিবাই।

খুনের ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে হিদাকার বন্ধু ওসামুকে চিনতে পারে ডিটেক্টিভ কিয়োচিরো কাগা। আগে একই স্কুলে শিক্ষকতা করতো দু'জনে। এক সময় ওসামু লেখালেখির জন্যে চাকরি ছেড়ে দেয় আর কাগা যোগ দেয় পুলিশে। অবশ্য বন্ধুর মত নাম করতে পারেনি ওসামু।

তদন্তে নেমে কাগা বুঝতে পারে, দুই লেখক বন্ধুর সম্পর্কে বাইরে থেকে যেমনটা মনে হতো, আদতে সেরকমটা ছিল না। তাদেরকে বন্ধু বলাটাও বোধহয় ঠিক হবে না। অন্যান্য কেসের মত 'কে' বা 'কিভাবে' নয়, বরং কাগাকে এই রহস্য উদঘাটনে জানতে হবে যে 'কেন' খুনটা করা হয়েছে। শুরু হয় খুনি এবং তদন্ত কর্মকর্তার ভীষণ এক ইঁদুর বেড়াল খেলা, যার উত্তর প্রোথিত আছে সুদূর অতীতে। কাগা যদি জানতেই না পারে যে কেন খুনটা করা হয়েছে, তাহলে সত্যটা চিরদিনের মত ঢাকা পড়বে।

'ডিভোশন অফ সাসপেক্ট এক্স' এবং 'স্যালভেশন অফ আ সেইন্ট' খ্যাত কিয়েগো হিগাশিনোর সর্বাধিক বিক্রিত উপন্যাসগুলোর একটি হচ্ছে 'ম্যালিস'। পাঠককে স্বাগতম ডিটেক্টিভ কাগার সাথে সত্য উদঘাটনের লড়াইয়ে...

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...
www.batigharprokashoni.com
https://www.facebook.com/monazimuddin
https://www.facebook.com/groups/batigharprokashoni

প্রখ্যাত জাপানিজ থ্রিলার লেখক কিয়েগো হিগাশিনো ১৯৫৮ সালে ওসাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা শেষ করে যোগ দেন নিপ্পন ডেনসো কর্পোরেশনে। সেখানে কর্মরত অবস্থাতেই ১৯৮৫ সালে লিখে ফেলেন তার প্রথম উপন্যাস 'আফটার স্কুল' আর সেটা পেয়ে যায় জাপানিজ থ্রিলার সাহিত্যের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার এডোগাওয়া রাম্পো অ্যাওয়ার্ড। এর পরপরই চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন তিনি। তার উপন্যাসগুলো ঠাঁই পেতে শুরু করে জাপানের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত বইয়ের তালিকায়। তার লেখা ডিভোশন অফ সাসপেক্ট এক্সের ইংরেজি এবং ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হলে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও পরিচিত লাভ করেন তিনি। ম্যালিস তার সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাসগুলোর একটি।

ম্যালিস

কিয়েগো হিগাশিনো

অনুবাদ: সালমান হক এবং ইশরাক অর্ণব

স্বত্ব © বাতিঘর প্রকাশনী

Malice

Copyright © 2023 by Kiego Higashino

প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০২৩

প্রচ্ছদ: কৌশিক জামান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ: একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, কম্পোজ: লেখক

মূল্য: চারশত টাকা মাত্র

ভূমিকা

এর আগে আমি কিয়েগো হিগাশিনোর ডিটেক্টিভ গ্যালিলিও সিরিজের দুটো বই অনুবাদ করেছি–*ডিভোশন অফ সাসপেক্ট এক্স* এবং *স্যালভেশন অফ আ সেইন্ট*। দুটো বই-ই পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। আসলে অনুবাদের উদ্দেশ্য ছিল এটাই, পাঠকদের একদম নতুন কিছুর সাথে পরিচয় করে দেয়া। এখন হিগাশিনোর নাম আমাদের দেশের অনেকেই জানেন। সেজন্যে বাতিঘর প্রকাশনী এবং শ্রদ্ধেয় লেখক, প্রকাশক, বড়ভাই নাজিম ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। *ম্যালিস* ডিটেক্টিভ কাগা সিরিজের ইংরেজিতে অনূদিত হওয়া প্রথম বই। আশা করি গ্যালিলিও সিরিজের মতন ধীরস্থির এই গোয়েন্দাকেও আপনারা আপন করে নেবেন। *ম্যালিস* বেশ আগে প্রকাশিত হওয়ার কথা থাকলেও ব্যক্তিগত কিছু সমস্যার কারণে দেরি হয়ে গেল। প্রিয় অনুজ ইশরাক অর্ণব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিলে হয়তো আরো পিছিয়ে যেত প্রকাশনা। তাকে অশেষ ধন্যবাদ। আশা করি আমাদের এই নিবেদন আপনাদের ভালো লাগবে। সবাই ভালো থাকবেন।

সালমান হক

মার্চ, ঢাকা

উৎসর্গ :

পাঠক, আপনাকে...

অধ্যায় ১

খুন
ওসামু নোনোগুচি'র বয়ান

ঘটনাটা ঘটে ১৯৯৬ সালের ১৬ই এপ্রিল, এক মঙ্গলবারে।

বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ কুনিহিকো হিদাকার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হই আমি। মাত্র এক স্টেশন দূরেই ওর বাসা, ট্রেনে চেপে যেতে খুব বেশিক্ষণ লাগে না। স্টেশন থেকে বেরিয়ে খানিকটা পথ বাসে যেতে হয়, এরপর বাকিটা হেঁটে। মেরেকেটে বিশ মিনিট।

ওর বাসায় যেতে বিশেষ কোন উপলক্ষের দরকার পড়তো না কখনোই; বন্ধুর বাসায় যেতে আসলে কোন কারণ লাগেও না। তবে আজকের ব্যাপারটা ভিন্ন। একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নিয়ে ওর ওখানে গিয়েছিলাম। আজকে না গেলে হয়তো লম্বা একটা সময় হিদাকার সাথে দেখা হতো না।

ওর বাড়িটা এক অভিজাত আবাসিক এলাকায়। আশপাশের বাড়িগুলোর প্রত্যেকটাই রুচিশীল, রীতিমত ম্যানশন বলা চলে। আগে একসময় বন ছিল জায়গাটায়। অনেক বাসিন্দাই পুরনো গাছগুলো না কেটে নিজের সীমানার মধ্যে রেখে দিয়েছে সৌন্দর্য বর্ধনের নিমিত্তে। লম্বা লম্বা বিচ আর ওক গাছগুলোর কারণে রোদের মধ্যে রাস্তায় হেঁটে বেশ আরাম। তবে রাস্তাগুলো কিন্তু যথেষ্ট চওড়া; সবগুলোই ওয়ান-ওয়ে। সুতরাং, বুঝতেই পারছেন যে এখানে কেমন লোকেদের আবাস।

কয়েক বছর আগে যখন জানতে পারলাম যে হিদাকা এই এলাকায় বাড়ি কিনেছে, খুব একটা অবাক হইনি। এখানে একটা স্থায়ী ঠিকানার ব্যবস্থা করা অনেকের জীবনেরই স্বপ্ন।

হিদাকাদের বাড়িটাকে অবশ্য ঠিক ম্যানশন বলা চলে না। কিন্তু

নিঃসন্তান কোন দম্পতির বসবাসের জন্যে যথেষ্ট বড়। সূঁচালো ছাদ আদ্দিকালের জাপানিজ বাড়িগুলোর কথা মনে করিয়ে দেবে। কিন্তু বাদবাকি সবকিছু পাশ্চাত্য তরিকায় তৈরি–জানালা, ঝুলবারান্দা, বাগান–সবই। বাড়ির নকশা কেমন হবে, সেটা নিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনই বিস্তর আলোচনা করেছে নিশ্চিত। তবে বাড়ির চারধারের নিচু দেয়ালগুলো দেখলেই বোঝা যাবে, গিন্নির মতই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। কথায় কথায় সে একবার আমাকে বলেছিল, ছোট থেকেই ইউরোপিয়ান কায়দার দূর্গগুলো আকর্ষণ করতো তাকে। হ্যাঁ, চিন্তাভাবনা কিছুটা অদ্ভুতই ছিল ওর স্ত্রীর।

মৃত মানুষের ব্যাপারে অবশ্য এভাবে কথা বলাটা উচিত নয়। কিন্তু সত্য তো সত্যই।

দেয়ালের পাশ দিয়ে কিছুদূর হেঁটে গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ইন্টারকমের বাটনটা গেটের পাশেই। দেয়ালের ইটগুলো এমনভাবে গাঁথা হয়েছে যে পাশ দিয়ে হাঁটার সময় কেবল লম্বাটে অংশটুকু দেখা যায়।

বাটনটায় চাপ দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও ভেতর থেকে কোন শব্দ ভেসে এলো না। এ সময় খেয়াল করলাম ড্রাইভয়েতে টয়োটা গাড়িটা নেই। ভাবলাম, হয়তো বাইরে গেছে।

ওর ফেরত আসা পর্যন্ত কিভাবে সময় কাটাবো চিন্তা করছিলাম, এমন সময় ওদের বাগানের চেরি গাছটার কথা মনে হলো। শেষবার হিদাকাদের বাসায় আমি আসি দশদিন আগে। তখনও চেরি ফুলগুলো পুরোপুরি ফোটেনি। হঠাৎই দেখার ইচ্ছে হলো গাছটা।

সাত-পাঁচ না ভেবে গেট খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। আশা করছি আমার অনধিকার প্রবেশে খুব বেশি কিছু মনে করবে না ওরা। গেটের সামনে থেকে বাড়ির দিকে যে রাস্তাটা চলে গেছে তা কিছুদূর যাবার পরেই দুই ভাগ হয়ে যায়। বাড়তি রাস্তাটা ধরে কিছুদূর এগোলেই বাগান। আমার গন্তব্যও সেই দিকে।

কিছু ফুল মাটিতে পড়ে আছে। তবুও গাছে যা আছে, তাকে একদম আদর্শ 'চেরি ব্লসম' বলা চলে। মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। আমি হয়তো লম্বা সময় ধরে গাছটার দিকেই তাকিয়ে থাকতাম, যদি অচেনা এক নারীকে ওখানে

চোখে না পড়তো। মাটির দিকে তাকিয়ে কিছু একটা খুঁজছিল সে। পরনে ক্যাজুয়াল জিন্স আর সোয়েটার। সাদা কিছু একটা ধরে রেখেছে এক হাতে।

"হ্যালো?" তাকে বললাম।

আমার ডাক শুনে চমকে গেল মহিলা, দ্রুত মাথা তুলে বলল, "ওহ, সরি।"

এবারে খেয়াল করলাম, তার হাতের সাদা জিনিসটা আসলে হ্যাট।

"বাতাসের আমার হ্যাটটা বাড়ির ভেতরে এসে পড়েছিল। সরি, কাউকে দেখলাম না বাসায়।"

দেখে মনে হচ্ছে মহিলার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। সরু চোখ, সূচালো নাক এবং চাপা ঠোঁটজোড়ায় বিশেষ কোন কিছু নেই। একদমই গড়পড়তা ধাঁচের ফ্যাকাসে চেহারা। এক মুহূর্তের জন্যে কেমন যেন সন্দেহ হলো আমার। আসলেই কি এত জোরে বাতাস বইছিল যে হ্যাট উড়ে যাবে কারো?

"ওখানে কিছু চোখে পড়েছে নাকি আপনার?" জিজ্ঞেস করলাম।

"এত সুন্দর করে জন্মেছে এখানকার ঘাস, ভাবছিলাম কিভাবে এগুলোর যত্ন নেয় এখানকার বাসিন্দারা," হেসে বলল সে।

"আসলে আমি নিজেও জানি না," বলে একবার কাঁধ ঝাঁকালাম। "এটা আমার বন্ধুর বাড়ি।"

জবাবে মাথা নাড়লো মহিলা। বোধহয় আগেই বুঝতে পেরেছিল আমি এখানে থাকি না। "এভাবে হুট করে ঢুকে পড়ার জন্যে দুঃখিত," বলে একবার বাউ করে আমাকে পাশ কাটিয়ে গেটের দিকে পা বাড়ালো।

এর পাঁচ মিনিট পর ড্রাইভওয়ে থেকে একটা গাড়ির শব্দ কানে এলো আমার। চলে এসেছে হিদাকা। বাড়ির সামনের দরজার কাছে এসে দেখি গ্যারেজে টয়োটাটা ঢোকাচ্ছে সে। আমাকে দেখে একবার মাথা নাড়লো কেবল। পেছনের সিটে বসে আছে ওর নব পরিণীতা স্ত্রী। মিষ্টি হেসে আমার উদ্দেশ্যে একবার বাউ করলো সে।

"সরি," গাড়ি থেকে বেরিয়ে বলল হিদাকা। "শেষ মুহূর্তের কেনাকাটায় বের হয়েছিলাম, আসার পথে রাস্তায় ভীষণ জ্যাম ছিল, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছো নাকি?"

"তোমাদের চেরি গাছটা দেখছিলাম।"

"সব ফুল তো ঝরেই গেছে।"

"যা আছে, তা-ও কম কী?"

হাসলো হিদাকা। "তা অবশ্য ঠিক। খুব সুন্দর লাগে না দেখতে? কিন্তু আসলে ঝামেলাটা শুরু হয় সব ফুল ঝরে যাওয়ার পরে। শয়ে শয়ে শুঁয়োপোকা জড়ো হয় বাগানে। আমার অফিসের একদম পাশেই তো গাছটা...সেখান থেকে সব দেখা যায়।"

"তাহলে তো তোমার ভাগ্য ভালো বলতে হচ্ছে। লম্বা একটা সময়ের জন্যে চলে যাচ্ছো।"

"ভাই, ওই সময় এখানে পাগলেও থাকতে চাইবে না। যাইহোক, ভেতরে চলো। এখনও সব কাপ ব্যাগে ভরিনি। তোমাকে এক কাপ কফি খাওয়াতে পারবো অন্তত।"

ভেতরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালাম আমরা।

বাড়ির সবকিছুই ততক্ষণে বাক্সপেটরায় ভরে ফেলা হয়েছে। এমনকি দেয়ালে ঝোলানো পেইন্টিংগুলো অবধি উধাও।

"প্যাকিং শেষ নাকি?" জিজ্ঞেস করলাম।

"শুধু অফিস রুমের জিনিসপত্রগুলো গোছগাছ করা বাকি," হিদাকা বলল। "অবশ্য আমরা নিজেরা খুব বেশি কিছু করিনি। মুভিং কোম্পানির লোকেরা এসেছিল বেশ কয়েকবার।"

"আজ রাতে কোথায় থাকবে?"

"হোটেলে একটা রুম বুক করে রেখেছি। দ্য ক্রাউন...চেনো বোধহয়? তবে আমার মনে হয় এখানেই থেকে যেতে হবে।"

ওর অফিসে চলে গেলাম আমরা। ঘরটা ঠিক বড়ও না, আবার ছোটও না। ভেতরে আসবাব বলতে একটা কম্পিউটার টেবিল আর বুকশেলফ রয়ে গেছে।"

"তোমার বোধহয় কালকে একটা বই জমা দেয়ার ডেডলাইন?"

ভ্রু কুঁচকে মাথা নাড়লো হিদাকা। "হ্যাঁ, সিরিজের শেষ বই। আজকে রাতের মধ্যে প্রকাশককে ফ্যাক্স করে পাঠাতে হবে। সেজন্যেই ফোনের লাইন খুলে ফেলিনি এখনও।"

"আর কত পৃষ্ঠার মত লেখা বাকি?"

"ত্রিশের আশপাশে...হয়ে যাবে।"

ডেস্কের একপাশে মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসলাম আমরা। এসময় কফি হাতে রাই প্রবেশ করলো ভেতরে।

"ভ্যাঙ্কুভারে আবহাওয়া যে কেমন এখন, কে জানে। এখানকার চেয়ে ঠান্ডা হবে নিশ্চিত," ওদের দুজনের উদ্দেশ্যে বললাম আমি।

"পুরোপুরি ভিন্ন একটা মহাদেশে পাড়ি জমাচ্ছি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেকটাই উপরে...ঠান্ডা বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক।"

"ওদের গ্রীষ্মকালেও তাপমাত্রা অনেক কম থাকে, এটা একটা স্বস্তির বিষয়," রাই বলল। "সব সময় এসি চালিয়ে রাখতে ভালো লাগে না আমার।"

"হিমেল হাওয়ায় রুমের মধ্যে বসে আরামসে লেখালেখি করতে পারবো, এটা ভাবতে ভালো লাগে আমার। কিন্তু আমরা দুজনেই জানি, সেরকম কিছু হবে না," হাসি ফুটলো হিদাকার মুখে।

"ওসামু, আপনি কিন্তু আমাদের ওখানে ঘুরতে আসবেন। পুরো ভ্যাঙ্কুভার ঘুরে দেখাবো," প্রস্তাব দিলো রাই।

"ধন্যবাদ। চেষ্টা করবো।"

"অবশ্যই আসবে কিন্তু," বলে একবার বাউ করলো রাই। "আপনারা দুই বন্ধু গল্প করুন তাহলে।" রুম থেকে বেরিয়ে গেল সে।

কাপ হাতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো হিদাকা। "শেষবারের মতন নিজের আঙিনায় চেরি ব্লসম দেখে যেতে পারছি, এই বা কম কী?"

"আচ্ছা যাও, আগামী বছর যদি ফুল ফোটে, আমি ছবি তুলে পাঠাবো তোমাদের। কানাডায় কি চেরি গাছ আছে?"

"জানি না। আমরা যেখানটায় উঠছি, সেখানে নেই অন্তত," কফির কাপে চুমুক দিলো সে।

"ওহ্, একটা ব্যাপার। তোমরা আসার আগে আমি ভেতরে ঢুকে দেখি একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে চেরি গাছটার সামনে," ওকে কথাটা বলবো কি না বুঝতে পারছিলাম না এতক্ষণ।

"তাই নাকি?" ভ্রু কুঁচকে গেল হিদাকার।

মহিলাটার ব্যাপারে সব খুলে বললাম। সন্দেহের জায়গায় এবারে শুকনো একটা হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। "ভদ্রমহিলা দেখতে কি 'কোকেশি' পুতুলগুলোর মতন? মাথাটা একদম গোল?"

"হ্যাঁ, তুমি বলার পর এখন সেরকমই মনে হচ্ছে," হেসে বললাম।

"ওনার নাম নিমি। এই রাস্তারই শেষ মাথায় থাকে। দেখলে বোঝা যায় না কিন্তু ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশের ওপরে। রাইয়ের ধারণা সে বিবাহিত, স্বামী চাকরির সুবাদে অন্য কোন শহরে থাকে। দূরত্বের সাথে মানিয়ে নিয়েছে দুজনে।"

"বাহ, বেশ ভালোই খোঁজখবর রাখো দেখছি। তোমাদের পারিবারিক বন্ধু নাকি?"

"বন্ধুর উল্টোটা বলতে পারো," কথাটা বলে জানালা খুলে দিলো হিদাকা। পর্দা অবশ্য ভেজানো এখন। ঝিরঝির হাওয়া প্রবেশ করলো ঘরের ভেতরে, সেই সাথে শুকনো পাতার সোঁদা গন্ধ। "আমাকে দেখতে পারে না নিমি।"

"দেখতে পারে না? কেন?"

"বিড়াল। ওর বিড়ালটা মারা গেছে কিছুদিন আগে। কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে দেখে মরে পড়ে আছে রাস্তার পাশে। পশু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর জানা যায় বিষ মেশানো খাবার দেয়া হয়েছিল বিড়ালটাকে।"

"সেটার সাথে তোমার কি সম্পর্ক?"

"নিমির ধারণা আমিই দায়ী এর জন্যে। ইচ্ছেকৃতভাবে মিটবলে বিষ মিশিয়ে বাইরে রেখে দিয়েছিলাম আর সেটা খেয়ে মারা গেছে বিড়ালটা।"

"কী বলছো আবোল তাবোল, এসব ভাবতে যাবে কেন সে?"

"আরে, এখানেই তো মজার শুরু," বলে শেলফ থেকে একটা পত্রিকা নামালো হিদাকা। নির্দিষ্ট একটা পেইজ খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিলো। "দেখো।"

'ধৈর্য্যের সীমা'-শিরোনামে একটা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে পত্রিকাটায়। ইনসেটে হিদাকার ছবি। প্রবন্ধটার বিষয়বস্তু একটা বিড়াল, যে কি না বারবার

চলে আসে এক লেখকের বাগানে। তবে শুধু ঘুরতেই আসে না, প্রবন্ধটা পড়ে মনে হবে যেন লেখককে বিরক্ত করাই তার মূল উদ্দেশ্যে। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে লেখককে আগে বাগান থেকে বিড়ালের মল পরিষ্কার করতে হয়। ছোট ছোট গাছগুলোরও রেহাই নেই, থাবা দিয়ে আঁচড়ে সেগুলোর অবস্থা করুণ করে দেয় বিড়ালটা। পায়ে কাদামাখা অবস্থায় গাড়ির উপর দিয়ে হেঁটে বেড়ায়। সাদা-খয়েরি রঙের বিড়ালটাকে বেশ কয়েকবার দেখেছে লেখক, জানে যে সে-ই কালপ্রিট। তবুও কোন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয় না। অনেক চেষ্টা করেছে সে কিন্তু ফলাফল শূন্য। একবার একজন পরামর্শ দেয় বিড়ালেরা নাকি প্রতিবিম্ব দেখে ভয় পায়, তাই বাগানজুড়ে পানি ভর্তি বোতল রেখে দেয় লেখক, যাতে বিড়ালটা সেখানে আর পা না দেয়। কিন্তু লাভ হয়নি। প্রবন্ধটার সারকথা–প্রতিদিন ধৈর্য্য পরীক্ষা দিতে হচ্ছে লেখককে।

"একটু আগে যে একটা বিড়াল মারা গেছে বললে, সেটাও কি খয়েরি-সাদা রঙের?" জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, ওরকমই।"

"তাহলে তো তোমাকে সন্দেহ করার উপযুক্ত কারণ আছে ভাই।"

"গত সপ্তাহে নিমির চেহারা যদি দেখতে! দুদ্দাড় করে এখানে এসে বলে যে ওর বিড়ালকে কেউ একজন বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে। সরাসরি আমাকে দোষারোপ করেনি অবশ্য কিন্তু হাবভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। রাই তাকে বলে একজন মানসিক রোগের ডাক্তার দেখাতে। ভেবেছিলাম আর হয়তো জ্বালাতন করবে না কিন্তু এখন দেখছি বাগানে এসে ছোঁকছোঁক শুরু করেছে। বোধহয় আমাকে এখনও সন্দেহ করে। বিষ মেশানো খাবার খুঁজতে এসেছিল।"

"সন্দেহবাতিক, নাকি?"

"আরে, মেয়েরা এমনই হয়।"

"নিমি কি জানে না তোমরা কানাডা চলে যাচ্ছো?"

"রাই তাকে গত সপ্তাহে আমাদের ভ্যাঙ্কুভার যাওয়ার ব্যাপারে ওকে বলেছিল। 'বুঝতে পারছো, কি বলছি? আমরা তো চলেই যাচ্ছি এখান

থেকে, তাহলে বিড়ালটাকে মাথা ঘামানোর দরকারটা কি, শুনি?' রাইকে দেখে বোঝা যায় না কিন্তু দরকারের সময় ঠিকই উচিত কথা শুনিয়ে দিতে পারে সে," হাসি ফুটলো হিদাকার মুখে।

"ওর কথায় কিন্তু যুক্তি আছে। বিড়ালটাকে হত্যা করার তোমাদের কোন কারণই নেই।"

কেন জানি আমার কথা প্রেক্ষিতে সাথে সাথে কিছু বলল না হিদাকা। শুধু হেসে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। খানিক বাদে কফির কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে তাকালো আমার দিকে। "কাজটা আমি-ই করেছি।"

"কী?" ওর কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না প্রথমে। "কী করেছো?"

"বিড়ালটাকে আমিই মেরেছি। মিটবলে বিষ মিশিয়ে বাগানে রেখে দিয়েছিলাম। তবে পদ্ধতিটা যে কাজে আসবে বুঝতে পারিনি। মানে একদম মরেই যাবে।"

প্রথমে মনে হলো আমার সাথে ঠাট্টা করছে হিদাকা কিন্তু এরপরেই ওর হাসিটা খেয়াল করলাম। নির্জীব।

"বিষ মেশানো মিটবল কোথায় পেলে?"

"আরে, এটা কোন ব্যাপার? ক্যাট ফুডের সাথে কীটনাশক মিশিয়ে বাগানে রেখে দিয়েছিলাম। বিড়াল যা দেখে সেটাতেই মুখ দেয়," সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল হিদাকা। আয়েশ করে টান দিলো একবার। জানালার বাতাসে ধোঁয়া মিলিয়ে গেল বাইরে।

"কিন্তু কেন?" সত্যি বলতে হিদাকার অকপট স্বীকারোক্তিটা মানতে একটু কষ্টই হচ্ছিল আমার।

"তোমাকে তো বলেছিলাম, আমরা এখনো কোন ভাড়াটে খুঁজে পাইনি?" শীতল হাসিটা মিইয়ে গেল ওর মুখ থেকে।

"হ্যাঁ।"

"আমাদের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু গতদিন এখানে এসে এমন একটা কথা বলে সে, যেটা আমার পছন্দ হয়নি।"

"কি?"

"তার মতে বাগানে অতগুলো প্লাস্টিকের বোতল দেখে অনেকেই ভাবতে পারে রাস্তার বিড়ালগুলো নিয়মিত জ্বালাতন করে আমাদের, সেজন্যেই কেউ ভাড়া নিচ্ছে না।"

"তাহলে তো বোতলগুলো ফেলে দিলেই হতো। এমনিতেও কোন কাজে আসেনি ওগুলো।"

"হ্যাঁ, কিন্তু তাতে মূল সমস্যার সমাধানটা হতো না। যদি কেউ বাড়ি দেখতে এসে খেয়াল করে বাগানের এখানে সেখানে বিড়াল পায়খানা করে রেখেছে, তখন? আমরা থাকলে নাহয় পরিষ্কার করতে পারবো কিন্তু চলে যাওয়ার পরে কি হবে? আমি চাই না বাড়িটা বিড়ালের টাট্টিখানায় পরিণত হোক।"

"এজন্যে মেরে ফেললে বিড়ালটাকে?"

"এভাবে বলছো কেন? বিড়ালটার মালিকও সমান দোষী। অবশ্য এই সত্যটা বোঝার ক্ষমতা নেই ওর," সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বলল হিদাকা।

"রাই জানে এটা?"

আবারো হাসি ফিরে এলো হিদাকার মুখে। "পাগল হয়েছো? মেয়েরা বিড়াল খুব পছন্দ করে। সত্যিটা বলতে আমাকে সাক্ষাৎ শয়তান ভাববে ও।"

চুপচাপ বসে রইলাম আমি। আসলে কী বলবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ঠিক এই সময় ফোনটা বেজে ওঠায় রিসিভার তুলে কানে ঠেকালো হিদাকা।

"হ্যালো?...ওহ, হাই। তোমার ফোনেরই অপেক্ষা করছিলাম...হ্যাঁ, সব শিডিউল অনুযায়ীই হচ্ছে...না, মানে, এই এখনই শুরু করবো। ঠিক আছে, শেষ হলেই পাঠিয়ে দেব, ভেবো না। না, আসলে এই ফোনের সংযোগ কালকে দুপুরের পরেই কেটে দিবে। আমিই ফোন করবো তোমাকে...হ্যাঁ, হোটেল থেকে। আচ্ছা, বাই।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে একবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো হিদাকা।

"তোমার সম্পাদক নাকি?"

"হ্যাঁ। জমা দিতে সাধারণত একটু দেরিই হয়ে যায় আমার কিন্তু এবারে পরিস্থিতি অন্যরকম। যদি আজকে রাতে না দিতে পারি, তাহলে সময়মত আর দেয়া সম্ভব হবে না। পরশুদিনই দেশ ছাড়বো

"বেশ," বলে উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার ছেড়ে। "আমি তাহলে আসি এখন। তোমাকে আর বিরক্ত করবো না।"

কলিংবেল বেজে উঠল এসময়। "কোন সেলসম্যান এসেছে নিশ্চয়ই," বলল হিদাকা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই অফিসের দরজায় কড়া নাড়লো রাই।

"কি হয়েছে?" গলা চড়িয়ে বলল আমার বন্ধু।

দরজা খুলে গম্ভীর ভঙ্গিতে বাইরে থেকে উঁকি দিলো রাই। "মিস ফুজিও এসেছেন," বলল শান্ত স্বরে।

নামটা শোনামাত্র চেহারায় মেঘ ভর করলো হিদাকার। "আবার?"

"তোমার সাথে নাকি জরুরি একটা বিষয়ে কথা আছে।"

"বাহ্," বলে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে লাগলো হিদাকা। "নিশ্চয়ই জানতে পেরেছে আমরা কানাডা চলে যাচ্ছি।"

"তুমি ব্যস্ত আছো বলে দেব?"

"হ্যাঁ,"–বলেই মত পরিবর্তন করলো হিদাকা, "না, আমি দেখা করবো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঝামেলা চুকিয়ে ফেলাই ভালো, তাহলে আর পরে অযথা মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি ওনাকে ভেতরে এনে বসাও।"

"আচ্ছা, তুমি যখন বলছো..." বলে আমার দিকে তাকালো রাই।

"আরে, আমাকে নিয়ে ভাববেন না," বললাম। "এখনই চলে যাচ্ছি।"

"ঝামেলায় পড়ে গেলাম," রাই চলে যাবার পরে লম্বা একটা শ্বাস ছেড়ে বলল হিদাকা।

"ফুজিও বলতে কি মাসায়া ফুজিও?"

"হ্যাঁ, ওর বোন...নাম মিয়াকো।" একবার মাথা চুলকালো হিদাকা। "যদি শুধু নগদ টাকা চাইতো, তাহলে কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু সবকিছু আবার মনে করে বলাটা অসম্ভব। পুনর্লিখনও সম্ভব না।"

হলরুম থেকে দুজনের পদশব্দ কানে এলো এসময়। সাথে সাথে মুখ বন্ধ করে ফেলল হিদাকা। স্বল্প আলোর জন্যে কারো কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে শুনলাম রাইকে। কিছুক্ষণ পরেই দরজায় কড়া নাড়লো সে।

"কি?" জিজ্ঞেস করলো হিদাকা।

"মিস ফুজিও এসেছেন," বলে দরজা খুলল রাই।

তার পেছনে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাকে মহিলা না বলে যুবতী বলাটাই ঠিক হবে। বয়স ত্রিশ ছুঁইছুঁই। লম্বা চুল কোমর অবধি নেমে এসেছে, পরনে সদ্য ইন্টারিভিউয়ে ডাক পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রিদের মত স্যুট। দেখে মনে হচ্ছে না যে হুট করে এসে পড়েছে সে। বেশ সময় নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে।

"তোমার সাথে তাহলে পরে দেখা হবে," হিদাকার উদ্দেশ্যে বললাম। পরশুদিন আবারো ওকে বিদায় জানাতে আসবো বলতে গিয়েও সামলালাম নিজেকে। মিস ফুজিও হয়তো জানেন না যে কানাডা পাড়ি জমাচ্ছে আমার বন্ধু। সেক্ষেত্রে ঝামেলায় পড়ে যাবে বেচারা। একবার মাথা নাড়লো হিদাকা।

আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো রাই। "সরি, আপনাকে এখনই চলে যেতে হচ্ছে," দুই হাত এক করে বলল সে। হিদাকার তুলনায় বেশ খাটো ও, তন্বী গড়ন। চেহারা দেখে মনে হবে যেন এখনও কলেজে পড়ছে। অথচ বয়স ত্রিশের উপরে।

"সমস্যা নেই। পরশুদিন আপনাদের বিদায় জানাতে আসবো।"

"আরে, আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবে না। অন্য কাজ আছে নিশ্চয়ই..."

"কিসের কষ্ট? আসবো অবশ্যই।"

"বাই," বলে আমি দৃষ্টির আড়াল হওয়া অবধি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলো রাই।

***

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে সবে কাজে হাত দিয়েছি, এমন সময় কেউ কড়া নাড়লো দরজায়। আমার বাড়িটা কিন্তু হিদাকাদের বাড়িটা থেকে একদম অন্যরকম; একটা পাঁচতলা বিল্ডিংয়ে বড় স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট। জায়গাটা একদম মাঝে ভাগ করা। একদিকে বেডরুম আর ওয়ার্কস্পেস, অন্যদিক লিভিং রুম, ডাইনিং রুম আর রান্নাঘর।

রাইয়ের মতন কেউ নেই আমার জীবনে, তাই দরজায় কারো কড়া নাড়ার শব্দ কানে এলে নিজেকেই উঠতে হয়।

পিপহোল দিয়ে একবার বাইরে তাকিয়ে দরজা খুলে দিলাম। আমার সম্পাদক, ওশিমা এসেছে।

"সময়মতই হাজির হয়েছো তাহলে," বললাম।

"তোমাকে নিয়ে আমার অনেক আশা, ভাই," বলে বিখ্যাত একটা মিষ্টির দোকানের প্যাকেট আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলো সে। "এই নাও, ঘুষ।"

আমাকে খুব ভালো করেই চেনে ও।

"কষ্ট করে এত দূরে আসতে হলো তোমাকে, সরি।"

জবাবে মাথা ঝাঁকালো ওশিমা। "আরে, এদিক দিয়ে বাড়ি ফিরতে হয় আমাকে।"

ওকে ভেতরে বসতে বলে কেতলি থেকে চা ঢেলে আনলাম। এরপর আমার অফিসে ঢুকে ডেস্ক থেকে তুলে নিলাম নতুন খসড়াটা। "কেমন হয়েছে জানি না, কিন্তু কাজ শেষ।"

"দেখি একবার।"

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে খসড়াটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়ালো ওশিমা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডুবে গেল গল্পে। খবরের কাগজ তুলে নিলাম আমি। কেউ আমার সামনে বসে আমার লেখা পড়লে বরাবরই অস্বস্তিতে ভুগি।

ওশিমা খসড়ার প্রায় অর্ধেকটা পড়ে ফেলেছে, এমন সময় ফোনের আওয়াজ ভেসে এলো ডাইনিং রুম থেকে।

উঠে গিয়ে তুলে নিলাম রিসিভারটা। "হ্যালো, নোনোগুচি বলছি।"

"আমি, হিদাকা," ওর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো কিছু একটা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে।

"কি অবস্থা?" আসলে আমি জানতে চাইছি, মিয়াকো ফুজিও'র সাথে ওর কি আলাপ হলো আজকে।

"তুমি কি ব্যস্ত নাকি?" কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলল হিদাকা।

"একজন মেহমান এসেছে আমার বাসায়।"

"আচ্ছা। কাজ শেষ হবে কখন?"

ঘড়ির দিকে তাকালাম এক ঝলক। সোয়া ছয়টার মতন বাজছে। "খুব বেশিক্ষণ না। কেন?"

"ইয়ে, মানে...ফোনে আলাপ করার মতন বিষয় না এটা। একটা ব্যাপারে তোমার সাথে কিছু কথা আছে। আসতে পারবে?"

"নিশ্চয়ই," আরেকটু হলেই জিজ্ঞেস করে বসেছিলাম, বিষয়টা ফুজিওকে নিয়ে কি না, কিন্তু সামলে নিলাম শেষ মুহূর্তে। ওশিমা যে লিভিং রুমে বসে আছে সেটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

"আটটার দিকে আসো, নাকি?"

"ঠিক আছে।"

"আমি অপেক্ষা করবো। রাখলাম," বলে লাইন কেটে দিলো হিদাকা।

রিসিভারটা কেবলই নামিয়ে রেখেছি এমন সময় সোফা ছেড়ে উঠতে শুরু করলো ওশিমা।

"তুমি যদি ব্যস্ত থাকো, তাহলে আমি নাহয়–"

"আরে, বসো বসো," হাত নেড়ে বললাম। "আমার বন্ধুর সাথে দেখা করবো আটটার দিকে। অনেক সময় আছে হাতে। পড়ো তুমি।"

"ঠিক আছে তাহলে," বলে আবারো পড়ায় মনোযোগ দিলো ওশিমা।

খবরের কাগজে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে হিদাকা আর মিয়াকোর কথা। দু' বছর আগে একজন কাঠশিল্পীকে নিয়ে 'নিষিদ্ধ প্রান্তর' নামে উপন্যাস লিখেছিল আমার বন্ধু। গল্প কাল্পনিক হলেও উপন্যাসের মূল চরিত্রটি ছিল বাস্তব থেকে অনুপ্রাণিত–মিয়াকা ফুজিও'র ভাই মাসায়া ফুজিও।

আমার আর হিদাকা'র সাথে একই মিডল স্কুলে পড়াশোনা করতো ফুজিও। কিশোর বয়সে আমরা যা যা করেছি, সেসবের অনেক কিছুই উঠে এসেছিল বইটায়। সতর্কতা হিসেবে অবশ্য চরিত্রগুলো নাম বদলে দেয়া হয়। কিন্তু উপন্যাসটায় এমন কিছু বিষয় উঠে আসে, যেগুলো ছাপার অক্ষরে দেখলে খুশি হতো না মাসায়া ফুজিও। ছাত্রজীবনে তার যাবতীয় কুকীর্তি যতটা সম্ভব সত্যের কাছাকাছি থেকে বর্ণনা করে হিদাকা। এক

দেহপসারিনীর হাতে ফুজিওর খুন হবার ঘটনাটাও বাদ যায়নি।

কিছুদিনের মধ্যেই বেস্টসেলার তালিকার শীর্ষে উঠে আসে 'নিষিদ্ধ প্রান্তর'। যারা মাসায়াকে চিনতো, বইটা পড়ে তাদের বুঝতে অসুবিধে হবে না যে কার কথা বলা হচ্ছে। ঘটনাক্রমে ফুজিও পরিবারের এক সদস্যের কাছেও চলে যায় উপন্যাসটি।

মাসায়ার বাবা ততদিনে পরলোকগমন করেছেন কিন্তু তার মা এবং বোন ছেড়ে কথা বলেনি। উপন্যাসটা যে মাসায়ার জীবনের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে সেটা বুঝতে কোন সমস্যা হয়নি তাদের; বিনাঅনুমতিতে এরকম একটা বই লিখে ফেলায় হিদাকার কঠোর সমালোচনাও করে। তাদের চোখে বিষয়টা ব্যক্তিগত এবং সামাজিক মর্যাদাহানির সামিল। কিছুদিনের মধ্যে 'নিষিদ্ধ প্রান্তরে'র সবগুলো কপি দোকান থেকে তুলে নেয়ার দাবি জানানো হয়।

"উপন্যাসটির কিছু অংশের পুনর্লিখন করা হলে আমরা পুনরায় প্রকাশের অনুমতি দেব, এর আগে নয়," এমনটাই জানান ফুজিওর মা।

হিদাকা যেমনটা বলেছে, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়নি ফুজিওর পরিবার থেকে। তবে পুনর্লিখনের বিষয়টা কেবল বলার জন্যে বলা নাকি দর কষাকষির প্রথম ধাপ, সেই বিষয়টা এখনও অনিশ্চিত।

ফোনে ওর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়নি যে অনিশ্চয়তা দূর হয়েছে। তবুও, আমাকে ফোন করার হেতু বুঝে উঠতে পারছি না। হয়তো আসলেও ঝামেলায় পড়ে গেছে। আমি কিভাবে কোন কাজে আসবো, কে জানে।

আমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতেই খসড়াটা পড়া শেষ হয়ে গেল ওশিমার। "বেশ ভালো। খানিকটা নস্টালজিক, কিন্তু আমার পছন্দ হয়েছে।"

"বাহ, শুনে খুশি হলাম," আসলেও স্বস্তি ভর করেছে আমার চিত্তে। চায়ের কাপে লম্বা একটা চুমুক দিলাম। ওশিমা ছেলেটা ভালো, শুধু শুধু তেল দেয়ার জন্যে কথাগুলো বলেনি।

সাধারণত ওর খসড়া পড়া শেষে পরবর্তি প্রজেক্ট নিয়ে আলাপ করি আমরা, কিন্তু আজকে হিদাকার সাথে দেখা করতে হবে। ঘড়ির দিকে তাকালাম। সাড়ে ছ'টার একটু বেশি বাজছে।

"তোমার হাতে সময় আছে?" ওশিমা জানতে চাইলো।

"হ্যাঁ, কিন্তু আমি ভাবছিলাম–এখানে কাছেই একটা ভাল রেস্তোরাঁ আছে, আমরা নাহয় খেতে খেতে কথা বলি?"

"নিশ্চয়ই, আমারও খেতে হবে," বলে খসড়াটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলো ওশিমা। যতদূর জানি, ওর বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, এখনও বিয়ে করেনি।

রেস্তোরাঁটা আমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা দূরত্বে। ক্যাজেরোল খেতে খেতে এটাসেটা বিষয়ে আলাপ করলাম আমরা। একসময় ইচ্ছে করেই হিদাকার কথা তুললাম।

ওর নাম শুনে বিস্ময় ভর করলো ওশিমার চেহারায়। "তাকে চেনো তুমি?"

"ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু। একই এলাকায় বড় হয়েছি, জায়গাটা এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। চাইলে হেঁটেই চলে যেতে পারবে ওখানে, অবশ্য আমাদের আগের বাড়িগুলো আর নেই। অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং বানানোর জন্যে ভেঙে ফেলা হয়েছে অনেক আগেই।"

"তাহলে স্কুলে থাকতেই পরিচয় হয় তোমাদের?"

"হ্যাঁ, এখনও যোগাযোগ আছে।"

"বাহ," আগ্রহ চকচক ওশিমার চোখজোড়ায়, সেই সাথে খানিকটা ঈর্ষার ছাপও আছে। "জানতামই না।"

"ও-ই কিন্তু আমাকে তোমাদের পত্রিকায় কাজ পাইয়ে দিয়েছে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, তোমাদের প্রধান সম্পাদক ওর কাছে একটা লেখা চায়, কিন্তু বাচ্চাদের গল্প লিখতে অতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না হিদাকা, তাই মানা করে দিয়েছিল। পরে আমাকে নিয়ে যায় ভদ্রলোকের কাছে। এজন্যে আমি ওর প্রতি কৃতজ্ঞ," ম্যাকারনি মুখে দিয়ে বললাম।

"কই! আমাকে তো কেউ এসব বলেনি। বাচ্চাদের সাহিত্যে হিদাকার মত লেখকের বিচরণ কেমন হবে, তা কিন্তু ভাবনার বিষয় আসলেও," আমার দিকে তাকালো ওশিমা। "আচ্ছা নোনোগুচি, তুমি কি কখনো বড়দের জন্যে কিছু লেখার কথা ভেবেছ?"

"হয়তো পরে কোন একসময় লিখবো, যদি সুযোগ হয়," মন থেকেই বললাম কথাটা।

সাড়ে সাতটায় রেস্তোরাঁটা থেকে বেরিয়ে একসাথে হেঁটে স্টেশনে চলে এলাম দু'জনে। আমাদের গন্তব্য ভিন্ন, তাই প্লাটফর্মে বিদায় জানালাম ওশিমাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়লো ট্রেন।

ঠিক আটটার সময় পৌঁছে গেলাম হিদাকাদের বাসায়। সামনের দরজার কাছে গিয়েই মনে হলো কি যেন একটা ঠিক নেই। পুরো বাড়ি অন্ধকার। এমনকি প্রবেশপথের বাতিও নেভানো।

ইন্টারকমের বাটনে চাপ দিলাম কিন্তু কোন জবাব এলো না ভেতর থেকে। প্রথমে মনে হলো আমার বুঝতে ভুল হয়েছিল। হিদাকা আটটায় সময় দেখা করতে বলেছিল ঠিকই, তবে সেটা হোটেলেও হতে পারে। আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর উল্টোদিকে ঘুরে স্টেশনের পথে রওনা হয়ে গেলাম। কিছুদূর এগোলেই একটা পার্কের পাশে সারি সারি অনেকগুলো পে-ফোন। ওয়ালেট বের করে ঢুকে পড়লাম একটা বুথে।

ইনফরমেশন সেন্টারের ফোন দিয়ে ক্রাউন হোটেলের নম্বর নিলাম প্রথমে। এরপর ওখানে যোগাযোগ করে হিদাকার নাম বললাম। কিছুক্ষণের মধ্যে রাইয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো রিসিভারে। "হ্যালো?"

"আমি, নোনোগুচি। হিদাকা আছে?"

"না, ও তো এখনও হোটেলে আসেনি। বাড়িতেই আছে বোধহয়। কাজ বাকি রয়ে গেছিল।"

"বাড়িতে তো কেউ নেই," কিছুক্ষণ আগের ঘটনা খুলে বললাম রাইকে।

"ও আমাকে বলেছিল যে হোটেলে ফিরতে বেশ দেরি হবে।"

"তাহলে বোধহয় বাইরে হাঁটতে বেরিয়েছে?"

"এরকমটা তো করার কথা নয় ওর," উদ্বেগ খেয়াল করলাম রাইয়ের কণ্ঠস্বরে। "তুমি দাঁড়াও, আমি এসে দেখছি," খানিকক্ষণ বাদে বলল ও। "চল্লিশ মিনিটের মত লাগবে আসতে, তুমি এখন কোথায় আছো?"

বললাম যে স্থানীয় একটা ক্যাফেতে সময় কাটিয়ে চল্লিশ মিনিট পর

ওদের বাসার সামনে উপস্থিত হবো। ফোন বুথ থেকে বেরিয়ে ক্যাফেটায় যাওয়ার আগে হিদাকাদের বাসায় আরেকবার ঢুঁ মারার সিদ্ধান্ত নিলাম। ওখানে পৌছে দেখি বাতি এখনও নেভানো। কিন্তু এবারে ড্রাইভওয়েতে টয়োটা গাড়িটা নজর এড়ালো না। বাইরে কোথাও গেলে সাধারণত গাড়ি নিয়েই যায় হিদাকা।

ক্যাফেটা হচ্ছে একটা স্পেশালিটি কফি শপ, হিদাকার সবচেয়ে পছন্দের জায়গাগুলোর একটা। হাওয়া বদলের দরকার হলেই এখানে এসে পড়তো সে। আমিও এসেছি কয়েকবার। মালিক লোকটা আমাকে দেখামাত্র হেসে হিদাকার কথা জিজ্ঞেস করলো। জবাবে বললাম, হিদাকারও আসার কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে না করে দিয়েছে। আধঘন্টা বেইজবল এবং অন্যান্য কিছু বিষয়ে আলাপ শেষে বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এলাম ক্যাফে থেকে। হিদাকাদের বাসার উদ্দেশ্যে পা চালালাম দিনে চতুর্থবারের মতন।

আমি গেইটের সামনে পৌছে দেখি রাই ট্যাক্সি থেকে নামছে। ডাক দিতেই আমার দিকে ফিরে হাসলো সে। কিন্তু বাড়ির দিকে তাকাতেই মুখটা কালো হয়ে গেল বেচারির। "একটা বাতিও জ্বলছে না।"

"বোধহয় এখনও বাইরে।"

"কিন্তু আমাকে তো বলেছিল এখানেই থাকবে।"

প্রবেশপথ পেরিয়ে বাড়ির সামনের দরজার কাছে এসে ব্যাগ থেকে চাবি বের করলো রাই। আমিও ওর ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছি। কি-হোলে চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিতেই খুলে গেল দরজাটা। ভেতরে ঢুকে প্রথমে বাতিগুলো জ্বেলে দিলো সে। পুরো বাড়ি একদম নিশ্চুপ, ঠান্ডা।

হলওয়ে থেকে হিদাকার অফিসের দিকে এগোলো রাই। এই দরজাটাও বন্ধ।

"বাইরে যাওয়ার আগে সবসময়ই অফিস বন্ধ করে যায় নাকি হিদাকা?" জিজ্ঞেস করলাম।

"না," মাথা ঝাঁকিয়ে পার্স থেকে আরেকটা চাবি করলো ও। "অন্তত আমি আসার পর বন্ধ করেনি।"

দরজাটা খুলে ভেতর দিকে ঠেলা দিলো রাই। রুমটায় কোন বাতি

জ্বলছে না, তবে কম্পিউটারটা চালু বিধায় অন্ধকার পুরোপুরি কব্জা করতে পারেনি। মণিটরের টিমটিমে আলোয় আলোকিত হয়ে আছে একপাশ। দেয়ালে সুইচবোর্ডের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে হঠাৎই থেমে গেল রাই।

ঘরের মাঝখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে হিদাকা।

দৃশ্যটা দেখে জমে গেলাম আমরা দু'জনেই। তবে দ্রুত ঘোর ভেঙে স্বামীর দিকে এগোলো রাই, হিদাকার দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো সে। মুখে হাতচাপা দিয়ে রেখেছে এখন।

ধীরে ধীরে আমিও এগোলাম ওদিকে। উপুড় হয়ে থাকলেও হিদাকার চেহারার বাম পাশ দেখা যাচ্ছে। আধখোলা চোখটায় কোন প্রাণ নেই।

"মারা গেছে ও," বললাম।

মেঝেতে ঢলে পড়লো রাই। বুক চিড়ে বেরিয়ে এলো স্বজন হারানোর কান্না।

***

পুলিশের লোকেরা সবকিছু পরীক্ষা করে দেখার সময় লিভিং রুমেই অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি আর রাই। এখন অবশ্য এই ঘরটাকে লিভিং রুম বলার জো নেই। সোফা এবং টেবিল সবই নিয়ে গিয়েছে মুভিং কোম্পানির লোকেরা। পত্রিকা ভর্তি একটা কার্ডবোর্ড বাক্সের উপরে বসে আছে রাই আর আমি পায়চারি করছি ঘরজুড়ে। একটু পরপর হলওয়েতে গিয়ে দেখে আসছি তদন্তের কতটা অগ্রগতি হয়েছে। তখন থেকে একটানা কেঁদেই চলেছে রাই। আমার হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। সাড়ে দশটার মতন বাজছে।

অবশেষে দরজায় কড়া নেড়ে রুমের ভেতরে প্রবেশ করলেন সৌম্য দর্শন এক পুলিশ কর্মকর্তা। ডিটেক্টিভ সাকোদার বয়স পঞ্চাশের আশপাশে। আজকের তদন্ত তিনিই পরিচালনা করছেন।

"আপনাদের সাথে একটু কথা বলতে পারি?" রাইয়ের দিকে একবার তাকিয়ে আমার উদ্দেশ্যে প্রশ্নটা করলেন ডিটেক্টিভ।

"নিশ্চয়ই।"

"আমিও কথা বলতে পারবো," রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল রাই। গলার স্বর এখনও ভারী হয়ে আছে, কিন্তু কথা বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট। সকালবেলা হিদাকার বলা কথাটা মনে পড়লো, দেখতে যতটা না মনে হয়, তার চেয়ে অনেক শক্ত রাই।

"খুব বেশিক্ষণ লাগবে না।"

হিদাকার মৃতদেহ আবিষ্কারের আগ অবধি যা যা ঘটেছে, সব বিস্তারিত জানতে চাইলেন ডিটেক্টিভ সাকোদা। আমিই মুখ খুললাম প্রথমে। কথা বলার এক পর্যায়ে মনে হলো মিয়াকো ফুজিও'র আগমনের বিষয়টাও তুলতে হবে।

"হিদাকা আপনাকে ফোন দিয়েছিলেন কখন?"

"ছয়টার একটু পরে বোধহয়।"

"তখন কি মিস ফুজিও'র বিষয়ে কিছু বলেছিলেন তিনি আপনাকে?"

"না, শুধু বলেছিল কি একটা বিষয়ে যেন কথা বলবে।"

"তাহলে হয়তো অন্য কোন ব্যাপারে আপনার সাথে আলাপ ছিল তার?"

"হয়তো।"

"আপনি কি আন্দাজ করতে পারছেন, কেন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন হিদাকা?"

"নাহ্।"

আলতো করে একবার মাথা নেড়ে রাইয়ের দিকে ঘুরলেন ডিটেক্টিভ। "মিস ফুজিও ফিরে যান কখন?"

"পাঁচটার দিকে।"

"এরপর কি হিদাকার সাথে কথা হয়েছিল আপনার?"

"অল্প।"

"কেমন মনে হয়েছিল তাকে দেখে?"

"ভালো না। মিস ফুজিওর সাথে আলাপটা আশানুরূপ হয়নি। তবে আমাকে ও বলেছিল, দুশ্চিন্তার কিছু নেই।"

"এরপরই বাড়ি থেকে বেরিয়ে হোটেলে চলে যান আপনি?"

"হ্যাঁ।"

আবারো মাথা নাড়লেন ডিটেক্টিভ। "তাহলে আজকে রাতটা এবং আগামীকাল ক্রাউন হোটেলে থেকে পরশু কানাডার উদ্দেশ্যের রওনা দেয়ার কথা ছিল আপনাদের? কিন্তু আপনার স্বামীর কিছু কাজ বাকি ছিল, তাই বাসায় রয়ে যান তিনি।" হাতের নোটবুকটার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললেন সাকোদা। "আপনার স্বামী যে বাড়িতে একা থাকবে, এটা কে কে জানতো?"

"আমি আর..." বলে আমার দিকে তাকালো রাই।

"হ্যাঁ, আমি জানতাম। 'সোমেই' পত্রিকার কেউ একজনও জানতো বোধহয়।" হিদাকা যে মাসিক পত্রিকাটার জন্যে একটা ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছিল, সেই বিষয়ে খুলে বললাম। মূলত উপন্যাসটার কাজ শেষ করার জন্যেই বাড়িতে রয়ে যায় সে। "সন্দেহভাজনের তালিকা ছোট করে আনতে এই তথ্যটা আপনাদের বিশেষ কাজে আসবে বলে মনে হয় না।"

"তদন্তে কোন তথ্যই ফেলনা নয়," মৃদু হেসে বললেন ডিটেক্টিভ সাকোদা।

এরপর রাইয়ের কাছে জানতে চাইলেন গত কয়েক দিনে বাড়ির আশেপাশে সন্দেহজনক কাউকে চলাফেরা করতে দেখেছে কি না। জবাবে মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলো সে। এসময় আমার মনে হলো, দিনের বেলা বাগানে একজন মহিলাকে দেখেছিলাম কিন্তু বিষয়টা চেপে গেলাম। বিড়াল হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে কেউ তো আর মানুষ খুন করবে না।

প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হলে ডিটেক্টিভ বললেন, তার একজন অফিসার আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। ভেবেছিলাম রাইয়ের সাথেই থেকে যাবো কিন্তু তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হলো ইতোমধ্যে রাইয়ের বাবা-মা'র সাথে আলাপ হয়ে গেছে; ওকে নিতে আসছে তারা।

বন্ধুর মৃতদেহ আবিষ্কারের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে আসার সাথে সাথে ক্লান্তি ভর করলো আমার দেহে। এই অবস্থায় স্টেশনে হেঁটে ফেরাটা সহজ হবে না। তাই সাকোদার প্রস্তাব মেনে নিলাম।

অফিস রুমটার ভেতরে আর বাইরে এখনও অনেক পুলিশ অফিসার কাজে ব্যস্ত। কেউ কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে গোটা বাসায়। অফিসের দরজাটা

খোলা হলেও ভেতরে কিছু দেখতে পাচ্ছিনা। মৃতদেহটা খুব সম্ভবত সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

ইউনিফর্ম পরিহিত এক অফিসার আমাকে ডেকে সামনের গেটের বাইরে দাঁড়ানো টহল গাড়িটার কাছে নিয়ে গেল। পুলিশের গাড়িতে চড়ার অভিজ্ঞতা নেই আমার। বেশি জোরে গাড়ি চালানোর জন্যে এক অফিসার আমাকে জরিমানা করেছিল একবার। পুলিশি বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা বলতে এটুকুই। লম্বা মতন একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে ক্রুজারটার পাশে। পুলিশ অফিসার হলেও ইউনিফর্ম পরেনি। আলোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার চেহারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

"অনেক দিন পর আপনার দেখা পেলাম, নোনোগুচি," বলল সে।

"আমি কি আপনাকে চিনি?" চোখ কুঁচকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করলাম।

ছায়া থেকে একটু সামনে এগিয়ে এলো অফিসার। এবার পরিচিত চেহারাটা চিনতে কোন অসুবিধে হলো না। সেই টিকোলো নাক, সরু চোখ। তবে নামটা কেন যেন মনে পড়ছে না।

"আমাকে মনে আছে আপনার?"

"হ্যাঁ! ইয়ে.. " পেটে আসলেও মুখে আসছে না নামটা। "কাগা না আপনি?"

"বান্দা হাজির," একবার বাউ করে বলল সে। "লম্বা সময় পর।"

"আসলেও," তার উদ্দেশ্যে মাথা নেড়ে বললাম। সুদর্শন চেহারাটা বয়সের সাথে আরো পরিণত হয়েছে। কম করে হলেও দশ বছর দেখিনি ওকে। "আপনি যে পুলিশে যোগ দিয়েছেন, এটা তো জানতাম না। আর এরকম একটা পরিস্থিতিতে দেখা হয়ে যাবে, সেটাও কল্পনার অতীত।"

"তা বটে। মরদেহটা কে আবিষ্কার করেছে, সেটা শোনার পর ভেবেছিলাম হয়তো একই নামের অন্য কেউ। কিন্তু আপনার বিজনেস কার্ডটা দেখার পর বুঝতে পারি..."

"নোনোগুচি নামটা অত প্রচলিত নয়, জানি আমি," মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম। "জীবন মাত্রই কাকতাল! কি বলেন?"

"গাড়িতে যেতে যেতে কথা বলি আমরা। আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেব আমি। সরি, আজকে টহল গাড়িতেই উঠতে হবে," পেছনের দরজাটা আমার জন্যে খুলে ধরলো কাগা। ইউনিফর্ম পরা অফিসার চালকের আসনে বসে পড়েছে আগেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে মিডল স্কুলে টিচার হিসেবে যোগ দেয় কাগা। সেই স্কুলে আগে থেকেই সামাজিক বিজ্ঞান পড়াতাম আমি। অন্যান্য নতুন টিচারদের মতনই, প্রথমদিকে উৎসাহ উদ্দীপনার কোন কমতি ছিল না কাগার মধ্যে। কেন্ডোকা নামে জাপানিজ মার্শাল আর্টে তার দক্ষতা ছিল। চাকরিতে যোগ দেয়ার কিছুদিনের মধ্যে কেন্ডো ক্লাবের দায়িত্ব নেয়। অন্যান্য টিচারেরাও ওর ব্যবহারে মুগ্ধ ছিল।

কিন্তু মাত্র দু'বছর পরেই কিছু কারণে শিক্ষকতা ছেড়ে দেয় সে। আমি যতদূর জানি, কোন দোষ ত্রুটির কারণে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি ওকে, নিজে থেকেই ছেড়েছিল। তবে সত্যি বলতে, আমার কখনোই মনে হয়নি, শুধুমাত্র একটা মিডল স্কুলের শিক্ষতার পেশাতেই আটকে থাকবে সে।

"এখন আপনি কোন স্কুলে আছেন?" কাগা জানতে চাইলো কিছুদূর এগোনোর পর।

কাগা। স্কুলে নতুন যোগ দেয়ার পরে এই নামেই তাকে ডাকতাম। এখন থেকে ডিটেকটভিভ কাগা বলে ডাকতে হবে, নিজেকে বললাম মনে মনে।

"আমার এলাকায় একটা মিডল স্কুলে চাকরি করতাম কিছুদিন আগ পর্যন্ত," একবার মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম। "মার্চে চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি।"

বিস্ময় ভর করলো কাগার চেহারায়। "তাই নাকি? কেন?"

"আসলে, ব্যাপারটা ওরকম কিছু না। এখন লেখালেখির দিকেই পুরো মনোযোগ দেব বলে ঠিক করেছি। টুকটাক লেখালেখিও করছি বাচ্চাদের জন্যে।"

"তাই নাকি! কাজের সূত্রেই তাহলে কুনিহিকো হিদাকাকে চিনতেন?"

"নাহ্।" আমাদের দু'জনের অতীত সম্পর্কে খুলে বললাম। সবকিছু গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলো কাগা। ডিটেক্টিভ সাকোদা বোধহয় কিছু জানায়নি ওকে।

"শিক্ষকতা করার সময়ই লেখালেখি শুরু করেছিলেন?"

"হ্যাঁ, কিন্তু খুব বেশি লিখতাম না তখন। এই বছরে দুয়েকটা ছোটগল্প। যখন সিদ্ধান্ত নিলাম লেখালেখিকেই মূল পেশা হিসেবে নিব, তখন বুঝতে পারি, চাকরিটা ছেড়ে দিতে হবে।"

"ওহ, আচ্ছা। সিদ্ধান্তটা সহজ ছিল না নিশ্চয়ই," কাগার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে আমার চাকরি ছেড়ে দেয়ার বিষয়টাকে ইতিবাচক হিসেবেই নিয়েছে। নিজের চাকরি ছেড়ে দেয়ার ঘটনার সাথে তুলনা করেছে কি না কে জানে। তুলনাটা ঠিক যথার্থ হবে না। পঁচিশের আগে চাকরি ছাড়লে নিজেকে গুছিয়ে নেয়ার সময় পাওয়া যায়। কিন্তু চল্লিশের পরে সেই সুযোগটা কম।

"মি. হিদাকা কেমন উপন্যাস লিখতেন?"

"আপনি কুনিহিকো হিদাকার লেখা কিছু পড়েননি!" ওর দিকে তাকিয়ে বললাম।

"নামটা শুনেছি কিন্তু পড়ার সৌভাগ্য হয়নি। আসলে এখন খুব একটা বই পড়া হয় না।"

"ব্যস্ত থাকেন নিশ্চয়ই?"

"নাহ্, অলসতার কারণে পড়া হয় না। জানি, মাসে দুই তিনটা হলেও বই পড়া উচিত।" মাথায় হাত রাখলো ও।

মাসে দুই তিনটা বই পড়া উচিত –এই কথাটা শিক্ষকতার সময়ে প্রায়ই বলতাম আমি। কাগা বোধহয় সেটা মনে রেখেছে এখনও।

হিদাকার লেখালেখির ক্যারিয়ার সম্পর্কে সংক্ষেপে খুলে বললাম তাকে। দশ বছর আগে প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় আমার বন্ধুর। কিছুদিনের মধ্যেই অনেকগুলো পুরষ্কারে ভূষিত হয় সে। বেস্টসেলার লিস্টে জায়গা করে নেয়। চলতি সাহিত্যের পাশাপাশি গুরুগম্ভীর সাহিত্য রচনার বিষয়েও সমান আগ্রহী ছিল হিদাকা।

"ওনার কোন লেখা কি আমার ভালো লাগতে পারে?" কাগা জিজ্ঞেস করলো। "কোন রহস্যোপন্যাস?"

"বেশ কয়েকটা মার্ডার মিস্ট্রি লিখেছে হিদাকা।"

"আমাকে নামগুলো বলেন তো।"

হিদাকার 'সমুদ্রের ডাক' উপন্যাসটার নাম বললাম ওকে। অনেক আগে পড়েছিলাম বিধায় খুব বেশি কিছু মনে নেই কিন্তু খুন-খারাবি ছিল গল্পে।

"হিদাকা কানাডায় কেন পাড়ি জমাচ্ছিল, সেটা জানেন?" আমার কথা শেষে জানতে চাইলো কাগা।

"নির্দিষ্ট একটা কারণ বলাটা একটু কঠিন। তবে আমার ধারণা এখানে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল ও, সেজন্যেই বিদেশে গিয়ে কয়েক নিভৃতে কিছু সময় কাটাতে চাইছিল আর কি। ভ্যাঙ্কুভারে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা অবশ্য রাইয়ের।"

"রাই তো বোধহয় ওনার স্ত্রী'র নাম, তাই না? বয়স বেশ কম মনে হলো।"

"গত মাসেই বিয়ে হয়েছিল ওদের। এটা হিদাকার দ্বিতীয় বিয়ে।"

"আর প্রথম স্ত্রী?...তার সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। কিন্তু ডিভোর্স বা ওরকম কিছু নয়। পাঁচ বছর আগে দুর্ঘটনায় মারা যায় হিদাকার প্রথম স্ত্রী।"

হিদাকাকে যে আর কোনদিন দেখতে পাবো না, এই ভাবনাটা মাথায় আসতেই অবসাদ জেঁকে বসলো মনে। কেমন যেন শূন্য একটা অনুভূতি। আজকে সন্ধ্যায় কোন ব্যাপারে কথা বলতে চেয়েছিল কে জানে। ওশিমার সাথে সময় না কাটিয়ে ওর ওখানে গেলেই ভালো হতো। বলা যায় না, আমি তখনই চলে গেলে হয়তো বেঁচে যেত আমার বন্ধু। জানি, এসব ভেবে এখন আর কোন লাভ নেই, তবুও সখেদ চিন্তাগুলো দূর করতে পারলাম না মন থেকে।

"আচ্ছা, ওনার একটা উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর একটু ঝামেলা হয়েছিল শুনেছিলাম। মি. ফুজিও নামের একজনের জীবন অবলম্বনে কিছু লিখেছিলেন বোধহয়," কাগা বলল। "এরকম কি আর কোন ঘটনা আছে? কিংবা ব্যক্তিগত জীবনে কারো সাথে কোন সমস্যা ছিল?"

"আমার জানামতে তো নেই," এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, কৌশলে আমাকে জেরা করছে কাগা। সামনে বসে থাকা ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ অফিসারের নীরবতা বড্ড কানে লাগলো হঠাৎ।

"ওহ্, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে তো ভুলেই গেছি," নোটবুক খুলে বলল কাগা। "আপনি কি নামিকো নিশিজাকি নামে কাউকে চেনেন?"

"কী?"

"আরো দুটো নাম আছে আমার কাছে–তেতসুজি ওসানো আর হাজিমে নাকানে।"

"বুঝতে পেরেছি," কিছুক্ষণ ভাবনার পর বললাম। "এগুলো হিদাকার 'তুষার দ্বার' উপন্যাসের চরিত্রের নাম। এই উপন্যাসটাই ধারাবাহিকভাবে লিখছিল ও।" উপন্যাসটার এখন কি হবে কে জানে। মাঝপথেই ওটা থামিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় নেই সম্পাদকের।

"মৃত্যুর আগ অবধি এই উপন্যাসটা নিয়েই কাজ করছিলেন তিনি।"

"ওহ্! ওর কম্পিউটারটা তো ছিল, তাই না?"

"ডকুমেন্ট ফাইলটাও ওপেন করা ছিল মনিটরে।"

"আচ্ছা," হঠাৎই একটা ভাবনা এলো মাথায়। "উপন্যাসটির কতটুকু লেখা হয়েছে?"

"কতটুকু বলতে কী বোঝাচ্ছেন?"

"কত পৃষ্ঠা?"

ওকে বললাম, হিদাকা আমাকে সকাল বেলা জানিয়েছিল রাতের মধ্যে আরো অন্তত ত্রিশ পাতা লিখতে হবে তাকে।

"আড়াই পাতার মত লেখা হয়েছিল," ডিটেক্টিভ কাগা বলল।

"এখান থেকে আপনারা মৃত্যুর সময়টা আন্দাজ করতে পারবেন। আমি যখন ওদের বাসা থেকে বের হই তখনো কাজ শুরু করেনি হিদাকা।"

"হ্যাঁ, এটা আমরাও ভেবেছি। কিন্তু লেখালেখি তো আর নির্দিষ্ট সময় বেঁধে হয় না। সুতরাং কতটুকু লেখা হয়েছে, সেটা দেখে কিছু আন্দাজ করাটা একটু মুশকিল।"

"সেটা ঠিক বলেছেন। কিন্তু আপনারা যদি হিদাকার লেখার সর্বোচ্চ গতি সম্পর্কে জানতে পারেন, তাহলে আন্দাজ করতে সুবিধা হবে।"

"তাই তো," কাগা বলল। "আপনার কি মনে হয়, হিদাকার লেখালেখির সর্বোচ্চ গতি কত ছিল?"

"ভালো প্রশ্ন। আমাকে একবার ও বলেছিল, ঘন্টায় গড়ে চার পাতার মতন লেখে।"

"তাহলে ধরে নেয়া যায়, খুব তাড়াহুড়ো করলেও ঘন্টায় ছয় পাতার বেশি লেখাটা বোধহয় সম্ভব নয় তার পক্ষে।"

"ওরকমই।"

চুপ হয়ে গেল ডিটেক্টিভ কাগা। বোধহয় মনে মনে কিছু একটা হিসেব করছে।

"কী হয়েছে?"

"বলাটা একটু কঠিন," একবার মাথা ঝাঁকালো কাগা। "আমি আসলে নিশ্চিত নই, কম্পিউটারের মনিটরে যে ডকুমেন্ট ফাইলটা ওপেন করা ছিল সেটা নতুন উপন্যাসটার কি না।"

"হয়তো প্রথম দিকের পর্বগুলোর কোন একটা দেখছিল হিদাকা।"

"হতে পারে। প্রকাশকের সাথে আগামীকাল কথা বললে জানা যাবে।"

কী ঘটতে পারে, সেটা নিয়ে আপনমনেই ভাবতে লাগলাম। রাইয়ের ভাষ্যমতে মিয়াকো ফুজিও বাড়ি ফিরে যায় পাঁচটার দিকে। আমাকে হিদাকা ফোন দেয় ছয়টার সময়। ওই এক ঘন্টায় যদি লিখতে বসে হিদাকা, তাহলে সর্বোচ্চ পাঁচ কি ছয় পাতা লেখা সম্ভব হতো ওর পক্ষে। তাহলে মূল প্রশ্নটা হচ্ছে, আসলে কতটুকু লিখেছিল ও?

"জানি, আপনাদের অনেক বিধি নিষেধ আছে, আমাকে হয়তো বলতে পারবেন না," ডিটেক্টিভ কাগার দিতে তাকালাম। "কিন্তু মৃত্যুর সম্ভাব্য সময় কি আন্দাজ করতে পেরেছেন আপনারা?"

"ঠিক বলেছেন, এটা কাউকে জানানো যাবে না। নিষেধ আছে। তদন্তের এই পর্যায়ে বাইরের কাউকে কিছু বলাটা উচিতও নয় আসলে। কিছু মনে করবেন না," হেসে বলল কাগা। "তবে এখনও সুরতহালের রিপোর্ট আমাদের হাতে আসেনি, তাই আন্দাজটুকু বলতে দোষ নেই। আমরা মোটামুটি নিশ্চিত, পাঁচটা থেকে সাতটার মধ্যে মারা গেছেন হিদাকা।"

"কিন্তু আমাকে ছয়টার সময় ফোন দিয়েছিল ও।"

"তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি, ছয়টা থেকে সাতটার মধ্যে ঘটেছে ঘটনাটা।"

তার মানে আমার সাথে কথা বলার কিছুক্ষণের মধ্যেই খুন হয় হিদাকা।

"কীভাবে মারা গেছে ও?" শুনে মনে হবে, নিজেকেই প্রশ্নটা করেছি। চোখ বড় করে আমার দিকে তাকালো কাগা। আমি আর রাই আবিষ্কার করেছিলাম হিদাকার মরদেহ, সুতরাং আমার মুখে প্রশ্নটা বোধহয় একটু বেমানানই বটে। কিন্তু আমি আসলেও জানি না জবাবটা। এতটাই ভয় পেয়ে গেছিলাম যে ভালোমত যাচাই করে দেখার কথাও মাথায় আসেনি।

কাগাকে খুলে বললাম বিষয়টা। সব শুনে মাথা নাড়লো ও। "সুরতহালের রিপোর্ট পাওয়া অবধি কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে প্রথম দর্শনে আমার মনে হয়েছে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে আপনার বন্ধুকে।"

"মানে কেউ হাত দিয়ে গলা চেপে ধরেছিল?"

"নাহ্, টেলিফোনের তারটা পেঁচানো অবস্থায় পাওয়া যায় হিদাকার গলায়।"

"কী?" টেলিফোনটা দেখেছিলাম কি না মনে করতে পারলাম না।

"এছাড়াও আরেকটা ক্ষত দেখেছি আমি। মাথার পেছনে কিছু একটা দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। আমাদের লোকেরা ধারণা করছে, খুব সম্ভবত পিতলের পেপারওয়েটটা ব্যবহার করেছে আততায়ী। ওটাও হিদাকার পাশে মেঝেতে পড়ে ছিল।"

"তার মানে প্রথমে মাথায় আঘাত করে অচেতন করা হয় ওকে...এরপর টেলিফোনের তার গলায় পেঁচিয়ে খুন করে?"

"এটাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখা," নিচু কণ্ঠে কথাটা বলল কাগা। "দয়া করে কারো সাথে এই বিষয়ে আলাপ করবেন না, ঠিক আছে?"

"অবশ্যই।"

আমার অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের সামনে পৌছে গেছে গাড়িটা।

"লিফটের জন্যে ধন্যবাদ। এই অবস্থায় ট্রেনে করে আসতে ইচ্ছে করছিল না একদমই।"

"কোন সমস্যা নেই। আপনার সাথে কথা বলে আমিও অনেক কিছু জানতে পেরেছি।"

গাড়ি থেকে বের হতে যাবো এসময় কাঁধে হাত রেখে আমাকে থামালো কাগা। "পত্রিকাটার নাম বলুন তো আমাকে।"

"সোমেই। ওরাই ধারাবাহিকভাবে প্রতি মাসে ছাপাচ্ছিল উপন্যাসটা।"

মাথা ঝাঁকালো কাগা। "আরে, আপনার লেখা যেখানে ছাপানো হয়, সেটার কথা বলেছি।"

বোকার মত একটা হাসি ফুটলো আমার মুখে। নামটা বললে নোটবুকে সেটা টুকে নিল কাগা। শুভরাত্রি জানিয়ে যার যার পথ ধরলাম আমরা।

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে চুপচাপ সোফায় বসে থাকলাম কিছুক্ষণ। সারাদিনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নিয়ে ভাবছি, কিন্তু কোনটাই বাস্তব মনে হচ্ছে না। মানুষের জীবনে এরকম দিন কমই আসে। এমনকি, অনেকের পুরো জীবন কেটে যায় নিস্তরঙ্গভাবে; যেখানে পরিচিত কারো মৃতদেহ আবিষ্কার করতে হয় না তাদের।

ঘটনাটা মর্মান্তিক, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এরকম একটা দিনের শেষে ঘুমোনোটা সমীচীন হবে না মোটেও। অবশ্য বিছানায় শোয়ার পর ঘুম আসবে বলে মনে হয় না, বিশেষ করে আজকে। তখনই মাথায় আসে, আমার বন্ধু কিভাবে মারা গেল, সেটা লিখে রাখা উচিত।

এখন যা লিখছি, সেটা মূলত এই কারণেই।

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি হিদাকার কেসটা সমাধান না হওয়া অবধি সবকিছু টুকে রাখবো।

***

পরদিন হিদাকার মৃত্যুসংবাদ বড় করে ছাপা হয় পত্রিকায়। রাতের বেলা টিভি দেখিনি, কিন্তু ধারণা করছি এগারোটার সংবাদেই প্রথম সম্প্রচারিত হয় খবরটা।

পেপারের প্রথম পাতায় মূল শিরোনামের নিচে লেখা প্রতিবেদনটি খুব বেশি বড় না হলেও ভেতরের পাতায় বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছ সবকিছু। হিদাকার বাড়ির বিশাল একটা ছবিও ছাপানো হয়েছে। ইনসেটে হিদাকার ছবি। খুব সম্ভবত কোন পত্রিকায় ছাপানোর জন্য তোলা হয়েছিল ছবিটা।

প্রতিবেদনটায় একটা তথ্য বাদে অন্যান্য সবকিছু মোটামুটি ঠিকঠাকই

উল্লেখ করা হয়েছে। কেবল হিদাকার মরদেহ আবিষ্কারের ঘটনার বিষয়ে প্রতিবেদক লিখেছে, 'বাড়ির সব বাতি লম্বা সময় ধরে নেভানো দেখে তার স্ত্রী রাই'কে ফোন করে জানায় একজন। তখন বাড়ি ফিরে অফিস রুমে হিদাকার মৃতদেহ খুঁজে পান রাই।' লেখাটা পড়ে সবাই ভাববে, রাই একাই ছিল ওখানে। আমার নাম কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।

প্রতিবেদনটার মতে, তদন্ত কর্মকর্তাগণ দুটো সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। প্রথমটা হচ্ছে, পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে হিদাকাকে। আর দ্বিতীয়টা, মুহূর্তের উত্তেজনায় তাকে হত্যা করেছে আততায়ী। সামনের দরজাটা ভেতর থেকে আটকানো ছিল। তাই সাংবাদিক ধরেই নিয়েছে, অফিসের জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল খুনি, সেই পথেই বেরিয়ে গেছে।

পত্রিকাটা নামিয়ে রেখে নাস্তা বানানো শুরু করবো, এমন সময় ডোরবেল বেজে উঠল। দেয়ালঘড়ি অনুযায়ী এখন সময় আটটা দশ। সাধারণত এত সকালে কেউ আসে না।

ইন্টারকমটা খুব একটা ব্যবহার করি না আমি। সরাসরি দরজা খুলে দেই। কিন্তু আজকে ইন্টারকমের রিসিভারটা তুলে নিলাম।

"কে?"

"মি. নোনোগুচি?" একটা নারীকণ্ঠ ভেসে এলো স্পিকারে। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে সে, যেন দৌড়ে এসেছে কোথাও থেকে।

"জি, বলছি। আপনি কে?"

"এত সকালে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। আমি চ্যানেল এইট নিউজ থেকে এসেছি। গত রাতের ঘটনার বিষয়ে আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।"

অবাক হলাম বললেও কম হবে। কোন খবরের কাগজে আমার নাম ছাপা হয়নি কিন্তু টিভি চ্যানেলের লোকেরা দেখি ঠিকই খোঁজ পেয়ে গেছে কোন একভাবে।

"ইয়ে, মানে..." কী বলবো বুঝে উঠতে পারছি না। অসাবধানতাবশত এমন কিছু বলে ফেলতে চাই না যার কারণে পরে পস্তাতে হবে। "ঠিক কী জানতে চাইছেন আপনি?"

"বিখ্যাত লেখক কুনিহিকো হিদাকা গত রাতে নিজ বাসগৃহে খুন হন। আমরা শুনেছি তার স্ত্রী যখন মরদেহটা খুঁজে পায় তখন আপনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এটা কি সত্যি, মি. নোনোগুচি?"

চ্যানেল এইট নিউজ শো'টার কাজই হচ্ছে বিভিন্ন রকমের খবর ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করা। মহিলা এমনভাবে কথা বলছে যেন সবকিছু ইতোমধ্যে তার জানাই আছে, কেবল আমার স্বীকার করার অপেক্ষা। তবে মিথ্যে বলাটা উচিত হবে না।

"হ্যাঁ, এটা সত্যি।"

ইন্টারকমেও বুঝতে পারলাম, উৎসাহের পারদ বেশ চড়ে গেছে অপর পাশে।

"আপনি মি. হিদাকার বাড়িতে গিয়েছিলেন কেন?"

"সরি, এই বিষয়ে আপনাদের সাথে কোন আলাপ করতে পারবো না। যা বলার পুলিশকে বলেছি।"

"মি. হিদাকার স্ত্রী'র সাথে নাকি আপনিই যোগাযোগ করেছিলেন প্রথমে? কী দেখে প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল আপনার?"

"দয়া করে পুলিশের লোকদের সাথে কথা বলুন," বলে ইন্টারকমটা নামিয়ে রাখলাম।

টিভি নিউজ শো'তে যারা চাকরি করে তারা একটু অভদ্র কিসিমের হয় বলেই শুনেছি। কিন্তু আজ প্রথমবারের মতন নিজের অভিজ্ঞতা হলো। ওদের কি বিবেক বলতে কিছু নেই? বন্ধু মারা যাবা পরদিন কী করে কারো সাথে এসব বিষয়ে কথা বলবে কেউ?

ঠিক করলাম, বাইরে বের হবো না, নতুবা অন্য কোন সাংবাদিক এসে জেরা শুরু করতে পারে। ভেবেছিলাম রাইয়ের সাথে একবার দেখা করবো বা অন্তত হিদাকার বাড়িটা থেকে ঘুরে আসবো কিন্তু আজকে আর ওদিকে যাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

মাইক্রোওয়েভে দুধ গরম করছি, এ সময় আবারো বেজে উঠল ডোরবেল। এবারেও ইন্টারকমটা কানে ঠেকালাম।

"হ্যালো, আমি চ্যানেল ফোর নিউজ থেকে বলছি। কিছুক্ষণ সময় হবে

আপনার?" এবার একটা পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এলো স্পিকারে। "মি. নোনোগুচি, পুরো দেশের মানুষ উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে গতকালের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে।"

অন্য কোন সময় হলে এরকম অতি নাটুকে কথা শুনে হাসি পেত আমার।

"দেখুন, আমি আসলে কেবল হিদাকার মরদেহটা খুঁজে পাই...এর বেশি কিছু জানি না।"

"কিন্তু আপনি তো মি. হিদাকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তাই না?"

"হ্যাঁ। কিন্তু গত রাতের কোন বিষয়ে আপনাকে কিছু জানাতে পারবো না আমি।"

"আপনি যদি আমাদের কেবল মি. হিদাকার বিষয়ে কিছু বলেন, তবুও চলবে," লোকটা হাল ছাড়ার পাত্র নয়।

লম্বা একটা শ্বাস ছাড়লাম। এভাবে নিউজ শো'র লোকজন যদি তাদের ক্রুসমেত আমার বাড়ির সামনে আস্তানা গাড়ে তাহলে প্রতিবেশীরা স্বাভাবিকভাবেই খুব বিরক্ত হবে।

রিসিভার নামিয়ে রেখে দরজা খুলে দিলাম। চকিতে এক ঝাঁক মাইক্রোফোন উদয় হলো আমার সামনে।

***

বাকিটা সকাল সাক্ষাৎকার দিতে দিতেই কেটে গেল। ঠিকভাবে নাস্তা করার সময়টুকুও পেলাম না। অবশেষে, দুপুর নাগাদ ফিরে এলাম অ্যাপার্টমেন্টে। উদোন খেতে খেতে টিভি দেখছি, এ সময় নিজের চেহারা ভেসে উঠতে দেখলাম টিভিতে। আরেকটু হলেই গলায় নুডলস আটকে যাচ্ছিল। মাত্র দু'ঘন্টা আগে রেকর্ড করা ফুটেজটা এখনই সম্প্রচার করছে ওরা।

"আপনারা তো বাল্যবন্ধু ছিলেন, তাই না? মানুষ হিসেবে মি. হিদাকাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্নটা করলো সেই নারী রিপোর্টার।

স্ক্রিনে আমাকে প্রশ্নটা নিয়ে বেশ লম্বা সময় ধরে ভাবতে দেখা যাচ্ছে।

একটা পর্যায়ে আমি বুঝতে পারি, একটু বেশিই সময় নিয়ে ফেলছি। তখনকার অস্বস্তি ভাবটাও স্পষ্ট ফুটে উঠেছে ক্যামেরার সামনে। এই অংশটুকু চাইলে কেটে বাদ দিতে পারতো ওরা, কিন্তু সময় নষ্ট করেনি। আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা রিপোর্টারেরাও অধৈর্য হয়ে ওঠে।

"দারুণ ব্যক্তিত্ব ছিল ওর," স্ক্রিনের আমি বললাম অবশেষে। "যা করবে বলে মনস্থির করতো, সেটার জন্যে জানপ্রাণ দিয়ে দিত। ওর সাথে যারা মিশেছে তাদের অনেকে হয়তো বলবে, ওর মতন মানুষই হয় না, আবার অনেকে এটাও বলতে পারে যে, ক্ষেত্রবিশেষে ওর আচরণ একটু শীতল। আসলে, আমরা সবাই এ রকম।"

"শীতল আচরণ বলতে কী বোঝাচ্ছেন?"

"মানে..." বলতে গিয়েও কিছু একটা ভেবে চুপ করে গেলাম। "নাহ্, এই মুহূর্তে এরকম প্রশ্নের জবাব দেয়া সম্ভব না আমার পক্ষে।"

হিদাকা যে তার প্রতিবেশীর বিড়ালটাকে মেরে ফেলেছে, এই চিন্তাটাই তখন ঘুরপাক খাচ্ছিল মাথায়। কিন্তু ক্যামেরার সামনে তো আর এসব বলা যায় না।

আরো কিছু দুর্বিনীত প্রশ্নের পর নারী রিপোর্টারটা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "হিদাকার খুনির উদ্দেশ্যে আপনি কি কিছু বলতে চান?"

জানতাম, এরকম কিছু জিজ্ঞেস করা হবে। গোটা প্রশ্নটাই একটা ফাঁদ। উল্টোপাল্টা কিছু বললেই সেটার খেসারত দিতে হবে সারাজীবন।

"নাহ, এই মুহূর্তে কিছু বলার নেই," জবাব দিলাম। মহিলার চেহারাতেই স্পষ্ট যে উত্তরটা বিশেষ পছন্দ হয়নি।

এরপর আবার সংবাদ পাঠকের চেহারা ভেসে উঠল পর্দায়। পরবর্তি রিপোর্টটা হিদাকার উপন্যাসগুলো নিয়ে। লম্বা সময় ধরে সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় ওর পদচারণার বিষয়ে বিস্তারিত বলা হলো। এক পর্যায়ে রিপোর্টার মন্তব্য করলো যে হিদাকার বিচিত্র ধরনের গল্পগুলো অনেকাংশেই তার নিজের জীবন থেকে অনুপ্রাণীত। এই কথাটা যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, তা বোঝার জন্যে সংবাদবোদ্ধা হতে হবে না। ওরা বোঝাতে চাইছে, লেখার মাঝে ব্যক্তিগত জীবনকে টানার প্রায়শ্চিত্তই করতে হয়েছে হিদাকাকে।

'নিষিদ্ধ প্রান্তর' উপন্যাসটা প্রকাশিত হবার পর সৃষ্ট বিতর্ক নিয়েও বিস্তর আলোচনা করলো এক রিপোর্টার। বলা হলো, উপন্যাসটা যার জীবনের উপরে ভিত্তি করে লেখা হয়েছে, তার পরিবার বিষয়টাকে 'ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ' বলে আখ্যায়িত করেছে। মিয়াকো ফুজিও যে গতকাল হিদাকার বাসায় গিয়েছিল, এই তথ্যটা এখনও পায়নি সংবাদকর্মীরা।

এরপর খ্যাতিমান বিভিন্ন ব্যক্তি হিদাকার মৃত্যু নিয়ে আলোচনা শুরু করলে টিভিটা বন্ধ করে দিলাম। খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে গেছে আমার।

জাপানের পাবলিক ব্রডক্যাস্টিং কর্পোরেশন, অর্থাৎ এনএইচকে ঘটনাটা নিয়ে কোন প্রতিবেদন সম্প্রচার করলে সবচেয়ে ভালো হতো। এ রকম কেসের ব্যাপারে ওরা কখনো মনগড়া কিছু প্রচার করে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, হিদাকার মৃত্যু নিয়ে বিশেষ কোন প্রোগ্রাম তৈরি করার মত ফান্ড ওদের নেই।

ফোনটা বেজে উঠল এই সময়। আজকে সকাল থেকে খানিক পরপর রিং বেজেই যাচ্ছে, তবুও দরকারি কাজে কেউ ফোন করতে পারে ভেবে রিসিভারটা তুলে নিলাম।

"হ্যালো, নোনোগুচি বলছি," কিছুটা রুক্ষই শোনালো আমার কণ্ঠ।

"হ্যালো, আমি," কণ্ঠস্বরটা যে রাইয়ের, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

"ওহ, কী খবর? গতকাল কি হলো?" জানি যে প্রশ্নটা অদ্ভুত, কিন্তু অন্য কিছু মাথায় এলো না।

"মা-বাবার বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সবাইকে ফোন করে জানাবো, কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি।"

"আমি বুঝতে পারছি। এখন কোথায় তুমি?"

"বাসায়। পুলিশের ওরা ফোন দিয়েছিল সকালবেলা। বলল ক্রাইম সিনটা আরেকবার তদারকি করে দেখবে আর আমার সাথেও নাকি আলাপ আছে।"

"কথা শেষ তাদের সাথে?"

"হ্যাঁ। কয়েকজন ডিটেক্টিভ অবশ্য এখনও আছে এখানে।"

"আর মিডিয়ার লোকজন? তারা জ্বালাতন করছে তোমাকে?"

"সে আর বলতে! কিন্তু হিদাকার প্রকাশকের বেশ জানাশোনা আছে এই লাইনে। তারাই এখানে এসে সবকিছু সামলাচ্ছে। এখন আর তেমন অসুবিধে হচ্ছে না আমার।"

"আচ্ছা।" 'ভালো' বলা থেকে নিজেকে আটকালাম একদম শেষ মুহূর্তে। সদ্য স্বামী হারানো একজন নারীকে এই কথাটা বলা মানানসই হবে না।

"তোমার কি অবস্থা, নোনোগুচি? তোমাকেও নিশ্চয়ই বিরক্ত করছে ওরা। একজনের কাছে শুনলাম টিভিতে নাকি তোমাকে দেখিয়েছে। দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, তাই ফোন দিলাম।"

"আমাকে নিয়ে একদমই চিন্তা করো না। এখন আর কেউ নেই এখানে।"

"তোমাকে এ রকম ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে দেখে আমি দুঃখিত," গলার স্বর শুনেই বোঝা যাচ্ছে, একদম মন থেকে কথাটা বলেছে রাই। ওর মানসিকতা আসলেও প্রশংসার দাবিদার। এই মুহূর্তে সে গোটা পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী মানুষদের একজন, অথচ নিজের এই অবস্থাতেও আমাকে নিয়ে চিন্তা করছে। হিদাকা যে ভুল বলেনি তার প্রমাণ পাচ্ছি পদে পদে।

"যদি কোন দরকার হয়, তবে সাথে সাথে আমাকে জানাবে," বললাম তাকে।

"ঠিক আছে। কিন্তু আপাতত কিছু লাগবে না। হিদাকার পরিবারের অনেকে এসেছে। আমার মা-ও আছে এখানে।"

"আচ্ছা," হিদাকার ভাইয়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ওর চেয়ে দুই বছরের বড় সে, বিবাহিত। হিদাকার মা তার সাথেই থাকেন। "তবুও...কিছু লাগলে ফোন দিও।"

"অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, নোনোগুচি। পরে কথা হবে।"

"খোঁজ নেয়ার জন্যে তোমাকেও ধন্যবাদ।"

নামিয়ে রাখলাম রিসিভারটা, তবুও রাইয়ের চিন্তা দূর হলো না মাথা থেকে। সে এখন কী করবে, কোথায় থাকবে–এসব নিয়ে ভাবছি। বয়স খুব

একটা বেশি না ওর, পরিবারও যথেষ্ট বিত্তবান। সুতরাং, কোন প্রকার ঝামেলায় পড়ার কথা না। তবে হিদাকাকে হারানোর কষ্টটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। হাজার হলেও, মাত্র একমাস ধরে বিয়ে হয়েছিল ওদের।

হিদাকার সাথে সামনাসামনি দেখা হবার অনেক আগে থেকেই তার লেখার সাথে পরিচিত ছিল রাই। বিশাল ভক্ত বললেও কম বলা হবে। কাজের খাতিরে পরিচয় হবার কিছুদিনের মধ্যেই প্রণয়ে রূপ নেয় ওদের সম্পর্কটা। অর্থাৎ, গতকাল রাতে নিজের স্বামী এবং প্রিয় লেখকে নতুন উপন্যাস–এই দুটো জিনিসই হারায় সে।

এসব নিয়ে ভাবনার মাঝেই আবারো বেজে উঠল ফোনটা। একটা খবরের অনুষ্ঠানে আমার সাক্ষাৎকার নিতে চায় চ্যানেল এইট। মুখের ওপর মানা করে দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

***

সন্ধ্যা ছয়টার কিছুক্ষণ পর আমার বাড়িতে হাজির হলো ডিটেক্টিভ কাগা। চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি ফুটিয়ে দরজা খুলে দেখি বাইরে ও দাঁড়িয়ে আছে। তবে একা আসেনি সে, মাকিমুরা নামের কম বয়সি আরেকজন ডিটেক্টিভও আছে সাথে।

"আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। আমার আরো কিছু প্রশ্ন ছিল।"

"হ্যাঁ, ভাবছিলাম যে কখন যোগাযোগ করবেন। আসুন, ভেতরে আসুন।"

কিন্তু দরজার বাইরে থেকে নড়লো না ডিটেক্টিভ কাগা। "আপনি কি খাচ্ছিলেন নাকি?"

"না, এখনও খাইনি। তবে খাবো ভাবছিলাম।"

"তাহলে আমরা বাইরে কোথাও বসি? সত্যি বলতে আজকে এত কাজ ছিল যে দুপুরে ঠিকমতো খেতেও পারিনি আমরা। তাই না?" মাকিমুরার দিকে তাকিয়ে বলল কাগা। জবাবে বোকা বোকা একটা হাসি মুখে সায় জানালো সে।

"ঠিক আছে। কোথায় যেতে চান? কাছেই একটা ভালো পর্ক কাটলেট রেস্তোরাঁ আছে।"

"যে কোন এক জায়গায় গেলেই হলো," বলে কি যেন একটা ভাবলো কাগা। "আচ্ছা, কাছেই একটা ফ্যামিলি রেস্তোরাঁ আছে না? আপনি আর আপনার সম্পাদক, মি. ওশিমা গিয়েছিলে যেখানে?"

"আছে তো। যাবেন ওখানে?"

"হ্যাঁ, সময় কম লাগবে আর যতবার ইচ্ছে কফিও নেয়া যাবে।"

"কফি পেলে মন্দ হতো না," পাশ থেকে মাকিমুরা বলল।

"আচ্ছা দাঁড়ান, আমি জ্যাকেট পরে আসছি," বললাম।

ওদের দরজার ওখানটায় দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে এসে কাপড় বদলে নিলাম। কাগা ওই রেস্তোরাঁটায় যেতে চাচ্ছে কেন কে জানে। কোন বিশেষ কারণ কি আছে? নাকি বিনামূল্যে কফি খাওয়ার লোভে?

কোন যুতসই জবাব মাথায় এলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরে বেরিয়ে এলাম তিনজন।

রেস্তোরাঁয় পৌঁছে আমি অর্ডার করলাম শ্রিম্প ডোরিয়া আর দুই ডিটেক্টিভ নিল ল্যাম্ব স্টেক এবং মিট লোফ।

"আচ্ছা, উপন্যাসটার নাম যেন কী? তুষার দ্বার?" ওয়েট্রেস অর্ডার নিয়ে চলে যাবার পর বলল কাগা। "মি. হিদাকার কম্পিউটার স্ক্রিনে খোলা ছিল যেটা।"

"হ্যাঁ। আপনি তো কালকে ভাবছিলেন যে ওই লেখাগুলো পূর্ব প্রকাশিত কি না। সেটা জানতে পেরেছেন?"

"জেনেছি। ওগুলো নতুন, কালকেই লেখা হয়েছে। মাসিক সোমেই পত্রিকার সম্পাদকের সাথে কথা বলেছি আমরা। তার মতে উপন্যাসের আগের অংশের সাথে মিলে গেছে ওটুকু।"

"তাহলে লেখার মাঝে খুন করা হয় ওকে?"

"একটা বিষয় একটু অদ্ভুত লেগেছে আমার এক্ষেত্রে," হালকা সামনে ঝুঁকে ডান হাতটা টেবিলে রেখে বলল ডিটেক্টিভ কাগা।

"অদ্ভুত?"

"পৃষ্ঠা সংখ্যা। ডকুমেন্ট ফাইলটা প্রিন্ট করার পর সাতাশ পৃষ্ঠা হয়েছে। তিনি যদি মিস ফুজিও চলে যাবার পরপরই লিখতে বসেন, তবুও তো এত লেখা সম্ভব না। আর আপনি কালকে যেমনটা বললেন, ঘন্টা বড়জোর ছয় পৃষ্ঠা লিখতেন মি. হিদাকা।"

"সাতাশ পৃষ্ঠা! এ তো অনেক বেশি।"

আমি হিদাকাদের বাড়িতে যাই আটটার দিকে। যদি ধরে নেই তখনও জীবিত ছিল সে, তবুও ঘন্টায় নয় পৃষ্ঠা করে লিখতে হবে তাকে।

"তাহলে," বললাম। "হয়তো মিথ্যে বলেছিল ও?"

"মানে?"

"দুপুরে আমার সাথে যখন দেখা হয় ততক্ষণে নিশ্চয়ই দশ বারো পৃষ্ঠা লেখা হয়ে গিয়েছিল ওর। কিন্তু আমাকে বুঝতে দিতে চায়নি। বড় লেখকেরা নিজেদের অতিরিক্ত ব্যস্ত প্রমাণের জন্যে এমন করে প্রায়ই।"

"পত্রিকার সম্পাদকও একই কথা বলেছেন।"

"তারাও জানে এসব।"

"হিদাকা রাইকে বলেছিলেন হোটেলে ফিরতে দেরি হবে কিন্তু আটটার আগেই তার সাতাশ পৃষ্ঠা লেখা হয়ে গিয়েছিল। প্রতি মাসে 'তুষার দ্বার' উপন্যাসটির ত্রিশ পৃষ্ঠার মতন করে প্রকাশিত হতো পত্রিকায়। সেই হিসেবে বলা যায়, কাজ প্রায় গুছিয়ে এনেছিলেন হিদাকা। আমি তো জানতাম যে লেখা জমা দিতে বেশিরভাগ সময়ই দেরি হয়ে যায় লেখকদের। কিন্তু কেউ কি আগেভাগে শেষ করে?"

"করতেই পারে। লেখালেখি তো আর ধরাবাঁধা নিয়ম-কানুন মেনে হয় না। কখনো কখনো ঘন্টার পর ঘন্টা কম্পিউটারের সামনে বসে থাকলেও এক পাতা লেখা বেরোয় না। আবার লেখা আসতে শুরু করলে থামানোই যায় না মাঝে মাঝে।"

"মি. হিদাকাও কি ওরকম লেখক ছিলেন?"

"হ্যাঁ। সত্যি বলতে কী, সব লেখকেরাই এমন।"

"আচ্ছা। এই বিষয়ে ধারণা ছিল না আমার," আবারো সিটে হেলান দিয়ে বসে বলল কাগা।

"মারা যাবার আগে কতদূর লিখেছিল হিদাকা, এটা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি না," বললাম। "মূলকথা হচ্ছে, রাই যখন হোটেলে যায়, তখনও গল্পটা লেখা শেষ হয়নি হিদাকার। কিন্তু ওর মরদেহ উদ্ধারের সময় দেখা যায় যে লেখাটা প্রায় গুছিয়ে এনেছিল। অর্থাৎ, মৃত্যুর আগেই কাজটুকু করে সে। তাই তো?"

"সেরকমই মনে হচ্ছে," মাথা নাড়লো ডিটেক্টিভ কাগা, তবে অসন্তুষ্ট ভাবটা দূর হয়নি চেহারা থেকে।

আমার প্রাক্তন সহকর্মী সামান্য তথ্যের গড়মিলও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে এখন। এটা নিশ্চয়ই তার কাজেরই অংশ। এই সময় ওয়েট্রেস আমাদের খাবার নিয়ে এলে কথাবার্তা বন্ধ থাকলো কিছুক্ষণ।

"একটা বিষয় জানতে চাইছিলাম," কিছুক্ষণ পরে বললাম আমি। "হিদাকার মরদেহের কি হবে? আজকে ময়নাতদন্তের কথা বলেছিলেন না আপনি?"

"হ্যাঁ, ময়নাতদন্ত শেষ ইতিমধ্যে," মাকিমুরার দিকে তাকিয়ে বলল কাগা। "তুমি ছিলে না ওখানে?"

"না, আমি না। থাকলে এখন এখানে এসব খেতে পারতাম?" ভ্রু কুঁচকে মিট লোফ মুখে দিতে দিতে বলল মাকিমুরা।

"তা ঠিক," একটা শুকনো হাসি ফুটলো কাগার মুখে। "ময়নাতদন্তের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন আছে আপনার?" এবারে আমাকে জিজ্ঞেস করলো সে।

"কখন মারা গেছে ও, সেটা জানতে পেরেছেন?"

"রিপোর্টটা আমি নিজে পড়িনি, তবে শুনেছি ঠিকঠাকই আন্দাজ করেছে ওরা।"

"তারা একদম নিশ্চিত?"

"সেটা নির্ভর করছে কিসের ভিত্তিতে আন্দাজ করেছে, তার উপরে। যেমন–" বলতে গিয়েও থেমে গেল কাগা। "নাহ্, এখন কথাটা বলা উচিত হবে না।"

"কেন?"

"আপনার খাওয়ার রুচি থাকবে না," আমার প্লেটের দিকে ইঙ্গিত করলো ও।

"ওহ," বলে মাথা নাড়লাম। "তাহলে পরেই শোনা ভালো।"

সায় দিলো ডিটেক্টিভ কাগা। ঠিক কথাটাই বলেছি আমি।

বাকি সময় খুনের ব্যাপারে কোন আলোচনা হলো না। বরং আমি বাচ্চাদের যে বইগুলো লিখছি, সেগুলোর বিষয়ে জানতে চাইলো ও। এখনকার বাচ্চারা কেমন লেখা পছন্দ করে, কোন ধারায় লিখলে বেশি জনপ্রিয়তা পাওয়া যায়, বই পড়ুয়ার সংখ্যা কমে যাওয়াটা আমি কিভাবে দেখি–এসব।

জবাবে বললাম, যে বইগুলো শিক্ষা মন্ত্রনালয় থেকে সুপারিশকৃত, সেসব বইয়ের বিক্রিই তুলনামূলক বেশি। আর বাচ্চাদের বই পড়ার অভ্যাস কমে যাওয়ার জন্যে দায়ী তাদের বাবা-মায়েরা।

"এখন তো বড়রা তেমন বই পড়ে না, কিন্তু তারাই আবার বাচ্চাদের জোর করে হলেও বই পড়াতে চায়। ফলে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনাই বেশি। পড়ার অভ্যাসের মধ্যে না থাকলে কোন বইটা ভালো, এটাও বোঝা যায় না। আর তার শিক্ষা মন্ত্রনালয় থেকে যে বইগুলো সুপারিশ করা হয়, সেগুলোর চাহিদা এত বেশি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে ওই বইগুলোয় অতিরিক্ত মাত্রায় একঘেয়ে। ফলে বাচ্চারা কোন আগ্রহবোধই করে না। একটা দুষ্ট চক্র বলতে পারো গোটা ব্যাপারটাকে, যে চক্র ছিন্ন করে বেরিয়ে আসাটা আশু দরকার।"

খেতে খেতে মনোযোগ আমার কথাগুলো শুনলো দুই ডিটেক্টিভ। তবে এসব বিষয়ে আদৌ তাদের কোন আগ্রহ আছে কি না সন্দেহ।

খাবার শেষে কফি দিয়ে গেল ওয়েট্রেস। আমি আমার জন্যে এক গ্লাস দুধের অর্ডার দিলাম।

"আপনি তো সিগারেট খান?" টেবিলে রাখা অ্যাশট্রে দেখিয়ে বলল ডিটেক্টিভ কাগা।

"না।"

"ছেড়ে দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ, দুই বছর হতে চলল প্রায়। ডাক্তারের নির্দেশ। আমার পাকস্থলির বারোটা বেজে যাচ্ছিল।"

"ওহ্। সরি, তাহলে আমাদের স্মোকিং জোনে বসাটা উচিত হয়নি। লেখকদের কথা মাথায় এলেই মনে হয় যে তারা নিয়মিত ধূমপান করে। মি. হিদাকা তো চেইন স্মোকার ছিলেন, তাই না?"

"হ্যাঁ। মাঝে মাঝে ওর অফিসে গেলে মনে হতো মশা তারানোর জন্যে ধূপ জ্বালিয়েছে।"

"গত রাতে এরকম কিছু চোখে পড়েছিল? আপনারা যখন ওনার মরদেহটা খুঁজে পান, তখন?"

"গতকাল...আসলে তখন এসব খেয়াল করার মত মানসিক অবস্থা ছিল না, বুঝতেই পারছেন ," বলে দুধের গ্লাসে একবার চুমুক দিলাম। "তবে আপনি বলায় এখন মনে পড়ছে, ধোঁয়ার গন্ধ পেয়েছি।"

"আচ্ছা।" কফির কাপটা ঠোঁটে ছোঁয়ালো ডিটেক্টিভ কাগা, এরপর ধীরে সুস্থে পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করলো। "আসলে আরেকটা বিষয়ে আপনার সাথে একটু আলাপ ছিল। আপনি তো আটটার দিকে মি. হিদাকার বাড়িতে গিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ।"

"আপনি বলেছেন, ইন্টারকমে কেউ জবাব না দেয়ায় রাইকে কল করেছিলেন বুথ থেকে। বাড়ির সব আলো নেভানো ছিল তখন।"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, সব বাতি কি আসলেও নেভানো ছিল? আপনই নিশ্চিত?"

"কোন সন্দেহ নেই আমার এই ব্যাপারে," উত্তর দিতে দেরি করলাম না।

"কিন্তু সামনের গেট থেকে অফিস রুম দেখা যায় না। আপনি কি বাগানের ওদিকটায় গিয়েছিলেন?"

"না, যাইনি। দেখা না গেলেও গেটের ওখানে দাঁড়িয়ে বোঝা যায় ভেতরে আলো জ্বলছে কি না।"

"তাই নাকি? কিভাবে?" ডিটেক্টিভ কাগা জানতে চাইলো।

"অফিসের জানালার পাশেই বড় একটা চেরি গাছ আছে। যদি ওখানকার আলো জ্বলে তাহলে গাছটা পরিষ্কার দেখা যায়।"

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো দুই ডিটেক্টিভ। "বুঝেছি।"

"কেন, কোন সমস্যা?"

"নাহ, এগুলো আসলে রুটিন প্রশ্ন। খুঁটিনাটি সব তথ্য না জানলে আমাদের বস আবার রাগ করেন।"

"বেশ কঠোর বস মনে হচ্ছে।"

"কোন চাকরিতে বসরা বন্ধুর মত হয়, বলুন?" কাগার মুখের হাসিটা আমার শিক্ষকতা জীবনের কথা মনে করিয়ে দিলো।

"তদন্ত কেমন চলছে? কোন সূত্র পেলেন?" দুই ডিটেক্টিভের দিকে তাকিয়ে বললাম।

"সবে তো শুরু হয়েছে," কাগার কথার সুরে স্পষ্ট যে এই বিষয়ে বেশি কিছু বলতে চাইছে না।

"টিভিতে বলাবলি করছিল, এটা নাকি অনিচ্ছাকৃত খুনও হতে পারে। মানে মুহূর্তের উত্তেজনায় ভাবনা চিন্তা না করেই কাজটা করেছে খুনি," বললাম আমি।

"এই সম্ভাবনাটাও উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না এই মুহূর্তে," ডিটেক্টিভ কাগা বলল।

তবে ওরা যে এমন কিছু ভাবছে না, তা দুই ডিটেক্টিভের অভিব্যক্তিই বলে দিচ্ছে।

"কিন্তু আপনার ধারণা এমনটা না ঘটার সম্ভাবনাই বেশি।"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"নির্জন বাড়িতে চুরি করতে গেলে সাধারণত সামনের দরজা দিয়েই ভেতরে ঢোকে আততায়ী। কারো চোখে পড়ে গেলে এটা সেটা বুঝিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, সেটাও সামনের দরজা দিয়েই। আর আপনি তো জানেনই, মি. হিদাকার বাড়ির সামনের দরজাটা বন্ধ ছিল।"

"চোরেরা বাড়ির দরজা বন্ধ করে যেতে পারে না?"

"আপনার বন্ধুর বাড়ির দরজার ডেড বোল্টটা ভেতরের দিকে, সুতরাং বাইরে থেকে বন্ধ করার জন্যে চাবির প্রয়োজন। হিদাকাদের দরজার চাবি

মোট তিনটা। এর মধ্যে দুটো ছিল রাইয়ের কাছে, আরেকটা মি. হিদাকার ট্রাউজারের পকেটে।"

"কিন্তু কিছু চোর তো জানালা দিয়েও ভেতরে ঢোকে, তাই না?"

"তা ঠিক। কিন্তু জানালা দিয়ে যারা ভেতরে ঢোকে, তারা লম্বা সময় ধরে পরিকল্পনা করে নেয় আগে। ভেতরের বাসিন্দারা কে কোথায় আছে, সেই বিষয়েও তথ্য থাকে তাদের কাছে। ফলে ধরা পড়ার ঝুঁকিটা কমে যায়।"

"এক্ষেত্রে ও রকম কিছু হয়নি?"

"আসলে..." হাসি ফুটলো কাগার মুখে। "ভেতরে তো চুরি করার মত খুব বেশি কিছু নেই। ঝুঁকি নেয়াটা পোষানোর কথা না।"

কাগার ভাবনার গভীরতা দেখে মুখ হা হয়ে গেল আমার।

"আসলে..." ওকে দেখে মনে হচ্ছে পরের কথাটা বলা ঠিক হবে কি না ভাবছে। "আমার ধারণা খুনি মি. হিদাকার পরিচিত কেউ।"

"এই ভাবনাটা একটু কেমন যেন।"

"কাউকে কিন্তু কিছু বলবেন না এই বিষয়ে," ঠোঁটের সামনে আঙুল নিয়ে আমাকে সাবধান করলো সে।

"নিশ্চয়ই," ওকে আশ্বস্ত করলাম।

একবার ডিটেক্টিভ মাকিমুরার দিকে তাকালো কাগা। সাথে সাথে বিলের কাগজটা হাতে নিয়ে ক্যাশ রেজিস্টারের দিকে রওনা হয়ে গেল জুনিয়র ডিটেক্টিভ।

"আরে, আমি বিল দেই।"

"দরকার নেই," হাত উঁচিয়ে বলল ডিটেক্টিভ কাগা। "আমরাই তো আপনাকে বাইরে নিয়ে এসেছি।"

"কিন্তু ডিপার্টমেন্ট থেকে তো আপনাদের খাওয়ার খরচ দেয় না।"

"নাহ, ডিনার আমাদের নিজেদের পয়সাতেই করতে হয়।"

"তাহলে তো ঝামেলা হয়ে গেল।"

"আরে, ব্যাপার না।"

ক্যাশ রেজিস্টারের দিকে তাকালাম আমি। মানিব্যাগ বের করেছে

ডিটেক্টিভ মাকিমুরা। তবে টাকাটা কাউন্টারের মহিলার হাতে না দিয়ে কিছু একটা জিজ্ঞেস করলো সে। পরক্ষণেই আমার দিকে আড়চোখে তাকালো মহিলা, এরপর মাকিমুরার উদ্দেশ্যে কী যেন বলল।

"সরি," কাগার দৃষ্টি আমার দিকে। চেহারার অভিব্যক্তির কোন পরিবর্তন আসেনি ওর। "আপনার অ্যালিবাই ঠিক আছে কি না সেই বিষয়ে খোঁজ নিতে এসেছি আমরা।"

"অ্যালিবাই?"

"হ্যাঁ," বলে মাথা নাড়লো সে। "আপনার সম্পাদক, মি. ওশিমার সাথে কথা বলেছি আমরা কিন্তু আরেকবার যাচাই করে নেয়াটা জরুরি। এটা আমাদের কাজ, কিছু মনে করবেন না।"

"এজন্যেই কি এখানে আসার কথা বলেছিলেন?"

"হ্যাঁ," কাগার কর্মপরিকল্পনায় অভিভূত না হয়ে পারলাম না।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো ডিটেক্টিভ মাকিমুরা। তার দিকে চেয়ে একবার মাথা নাড়লো কাগা। "কি? অতিরিক্ত বিল রেখেছে নাকি এবারও?"

"নাহ্।"

"যাক, বাঁচা গেল," বলে আমার দিকে তাকালো কাগা। মুখের হাসিটা এখন চোখেও বিস্তৃত হয়েছে।

যখন বললাম গত দুই দিন ধরে কি ঘটছে সব লিখে রাখছি, আগ্রহ ফুটলো আমার প্রাক্তন সহকর্মীর চেহারায়। রেস্তোরাঁ থেকে বের হয়ে বাড়ির পথে হাঁটছি আমরা তিনজন এখন। আমি যদি কিছু না বলতাম, তাহলে বিদায় নিয়ে নিজেদের রাস্তা মাপতো ডিটেক্টিভ দু'জন।

"আসলে এরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হইনি তো কখনো আগে, তাই লিখে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর জন্যে আমার লেখকসত্ত্বাকে দায়ী ধরে নিতে পারেন।"

কথাটা শুনে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো ডিটেক্টিভ, এরপর বলল, "যদি কিছু না মনে করেন, আপনার লেখাটা আমি পড়তে চাই।"

"কি?! আপনি পড়বেন? ইয়ে মানে...আসলে অন্য কেউ লেখাটা পড়বে, এসব ভেবে কিছু লিখিনি।"

"প্লিজ," বলেই আমার সামনে এসে মাথা ঝোঁকালো কাগা। তার দেখাদেখি ডিটেক্টিভ মাকিমুরাও একই কাজ করলো।

"আরে আরে করছেন কি আপনারা! রাস্তার পাশে দুইজন পুলিশ অফিসারকে আমার সামনে এভাবে বাউ করতে দেখলে লোকে কী বলবে? আপনাদের তো সব কিছু বলেছি আমি।"

"তবুও দেখতে চাই।"

"আচ্ছা, এত করে যখন বলছেন," মাথা চুলকে বললাম। "অ্যাপার্টমেন্টে আসতে পারবেন? আমার ওয়ার্ড প্রসেসরে আছে ফাইলটা। প্রিন্ট করে দিতে হবে।"

"কোন সমস্যা নেই," কাগা বলল।

আমার সাথে সাথে অ্যাপার্টমেন্টে উঠে এলো দুই ডিটেক্টিভ। লেখাটা প্রিন্ট করছি এ সময় আমার পিছে এসে দাঁড়ালো কাগা। "ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করেন নাকি আপনি?"

"হ্যাঁ।"

"মি. হিদাকা দেখলাম কম্পিউটার ব্যবহার করতেন।"

"লেখালেখি ছাড়াও আরো অনেক কাজে ওটা ব্যবহার করতো ও। ইমেইল পাঠানো, গেইম খেলা–এসব।"

"আপনি কম্পিউটার ব্যবহার করেন না কেন, নোনোগুচি?"

"ওয়ার্ড প্রসেসরই আমার জন্যে যথেষ্ট।"

"তাহলে পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের অফিসে পাঠান কিভাবে? কেউ এসে নিয়ে যায়?"

"না, সাধারণত ফ্যাক্স করে দেই। ওই দেখুন," আমার রুমের একপাশে রাখা ফ্যাক্স মেশিনটার দিকে ইঙ্গিত করলাম। একটা ফোনের লাইন আমার বাসায়। তাই কর্ডলেসটা ফ্যাক্স মেশিনের সাথেই লাগানো।

"কিন্তু কালকে তো খসড়া পাণ্ডুলিপিটা নেয়ার জন্যে আপনার সম্পাদক এসেছিল বাড়িতে," আমার চোখে চোখ রেখে বলল কাগা। ক্ষণিকের জন্যে মনে হলো ওর দৃষ্টিতে সন্দেহ খেলা করছে। এটা অবশ্য আমার মনের ভুলও হতে পারে। কিন্তু একটু আগে কাগা বলেছে, ওর ধারণা খুনি হিদাকার পরিচিত।

"আসলে এবারের লেখাটা নিয়ে কিছু আলাপ ছিল আমার, সেজন্যেই তাকে ফোন করে আসতে বলেছিলাম।"

নীরবে আমার কথাটা শুনলো কাগা, তবে জবাবে কিছু বলল না।

প্রিন্টআউট দেয়া শেষ হলে ওর হাতে লেখাগুলো তুলে দিলাম। "আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি।"

"তাই?" ডিটেক্টিভ কাগাকে দেখে মনে হলো না যে অবাক হয়েছে।

"হ্যাঁ। এই লেখাগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন। তবে এটাও মাথায় রাখবেন যে যখন এসব লিখছিলাম, তখন ভাবিনি আমি বাদে অন্য কেউ আমার বয়ানটুকু পড়বে। ইচ্ছেকৃতভাবে কাউকে সন্দেহভাজন হিসেবে উপস্থাপন করার ইচ্ছেও আমার নেই।"

হিদাকা এবং ওই বিড়ালটার প্রসঙ্গে কথাগুলো বললাম।

"বেশ। চিন্তার কিছু নেই, আমি ওরকম কিছু ভাববো না।" আমাকে বেশ কয়েকবার ধন্যবাদ জানালো ডিটেক্টিভ কাগা। এরপর অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে গেল দুই ডিটেক্টিভ।

কাগা এবং তার সহকারী বেরিয়ে যাওয়ার পর আজকের ঘটনাবলি লিখতে বসেছিলাম। ও হয়তো আমার নতুন লেখাগুলোও পড়তে চাইবে। কিন্তু লেখার সময় সেই কথা মাথায় আনা যাবে না। নতুবা লেখাগুলো নিরপেক্ষতা হারাবে, তাই না?

***

আজ হিদাকার মৃত্যুর তৃতীয় দিন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করা হয়েছিল ওর বাড়ি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে একটা বৌদ্ধ মন্দিরে। প্রকাশনা জগতের অনেক রথী-মহারথী উপস্থিত হয়েছিল সেখানে। সেই সাথে ভক্ত পাঠকদের ভিড় ছিল দেখার মতন।

টিভি চ্যানেলের লোকেরা আগেভাগেই চলে গিয়েছিল মন্দিরে। গম্ভীর মুখে মাইক্রোফোন হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল রিপোর্টারেরা। উপস্থিত কারো চোখে পানি দেখলেই ক্যামেরা ঘুরে যাচ্ছিল সেদিকে।

বেদিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন শেষে ছাউনির নিচে গিয়ে দাঁড়াই আমি। বেশ কয়েকজন সেলেব্রেটিকে চোখে পড়ে। হিদাকার গল্প থেকে বানানো সিনেমায় যারা বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছে, তারাও এসেছে।

মন্ত্রপাঠ এবং কিছুক্ষণ কথা বলার পর সবাইকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের সুযোগ করে দেন প্রধান পুরোহিত। রাইয়ের পরনে একটা কালো ড্রেস, হাতে পুতির জপমালা। পুরোহিতের কথা শেষ হলে সামনে গিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানায় সে, এরপর হিদাকার স্মৃতি রোমন্থন করে কিছুক্ষণ। অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে বেশ কয়েকজনের কান্নার শব্দ এলো কানে।

রাই তার বক্তব্যে খুনির বিষয়ে কোন কিছু বলল না। সচরাচর এসব ক্ষেত্রে দেশবাসীর সামনে খুনির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করে ভিক্টিমের আত্মীয় স্বজনেরা। মানুষ হিসেবে সে যে অন্য ধাঁচের, তার প্রমাণ বারবার পাচ্ছি।

শববাহকেরা কফিন নিয়ে রওনা হয়ে গেলে ভিড় কমে আসতে শুরু করলো। এসময় একজনকে চোখে পড়ায় থমকে গেলাম। অবশ্য, মনে মনে জানতাম যে সে আসবে।

"মিস ফুজিও?" মন্দির থেকে বের হওয়ার পথে ডাক দিলাম তাকে।

নিজের নাম শুনে থেমে পেছনে তাকালো মিয়াকো ফুজিও। "আপনি?"

"হিদাকার অফিসে দেখা হয়েছিল আমাদের।"

"ওহ্, হ্যাঁ।"

"আমার নাম নোনোগুচি, আমি হিদাকার বন্ধু। আপনার ভাইও আমাদের সাথে একই ক্লাসে পড়তো।"

"জি, শুনেছি। হিদাকা সেদিন বলেছিল আমাকে।"

"যদি আপনার সমস্যা না হয়, তাহলে কিছুক্ষণ কথা বলতে চাইছিলাম। সময় হবে কি?"

একবার ঘড়ির দিকে তাকালো মিয়াকো। "আসলে, একজন অপেক্ষা করছে আমার জন্যে," বলে দূরের পার্কিং লটের দিকে তাকালো সে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও তাকালাম সেদিকে। পার্কিং লটের রাস্তার পাশেই একটা সবুজ ভ্যান রাখা। ড্রাইভিং সিটে বসে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে এক যুবক।

"আপনার স্বামী?"

"নাহ্..."

তাহলে প্রেমিক হবে।

"আমরা এখানেই কথা বলতে পারি। খুব বেশি সময় লাগবে না।"

"কী নিয়ে কথা বলতে চাইছেন?"

"সেদিন আপনার সাথে হিদাকার কোন বিষয়ে কথা হয়েছিল?"

"যে বিষয়ে সবসময় কথা হয়। বইগুলো যত দ্রুত সম্ভব মার্কেট থেকে তুলে নেয়া, আনুষ্ঠানিক বক্তব্যের মাধ্যমে নিজের ভুল স্বীকার করা এবং পুরো বইয়ের পুনর্লিখন, যেখানে আমার ভাইয়ের ব্যাপারে কিছু থাকবে না। আমি জানতে পারি, কানাডায় চলে যাচ্ছেন তিনি, তাই কিভাবে এসব করবেন সেটা জানার আগ্রহ থেকেই গিয়েছিলাম।"

"হিদাকা কি বলেছে আপনাকে?"

"বলেন যে তিনি ভুল কিছু করেননি।"

"অর্থাৎ আপনার দাবিগুলো মেনে নেয়ার ইচ্ছে ছিল না ওর?"

"তার মতে শিল্পগুণ রক্ষার খাতিরে আমার ভাইয়ের ব্যক্তিগত কিছু বিষয় তুলে ধরাটা প্রয়োজন ছিল। কোন প্রকার খারাপ উদ্দেশ্য থেকে কাজটা করেননি তিনি।"

"কিন্তু আপনি তার সাথে একমত নন।"

"অবশ্যই একমত নই।" আগের তুলনায় কিছুটা কোমল হল মিয়াকোর চাহনি।

"তাহলে আপনার সেদিন ওখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যটা সফল হয়নি।"

"হিদাকা বলেছিলেন কানাডায় গিয়ে সবকিছু গুছিয়ে নেয়া মাত্র আবারো আলোচনা শুরু করবেন। কথাও দিয়েছিলেন এই ব্যাপারে। আমি বুঝতে পারি যে কানাডায় পাড়ি জমানোটা তার জন্যে জরুরি, এ জন্যে আর বাড়াবাড়ি কিছু করিনি, বিদায় নিয়ে চলে আসি।"

হিদাকার জায়গায় আমি থাকলেও একই কথাই বলতাম নিশ্চয়ই।

"ওখান থেকে সরাসরি বাসায় যান আপনি?"

"আমি?...হ্যাঁ।"

"পথে কোথাও থামেননি?"

"না," বলে মাথা ঝাঁকালো সে। এরপর হঠাৎই চোখ বড় করে আমার দিকে তাকালো মিয়াকো ফুজিও। "আপনি কি আমার অ্যালিবাইয়ের বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছেন?"

"না, না," চোখ নামিয়ে বললাম। আসলে তো তার অ্যালিবাইয়ের খোঁজ নিচ্ছিলাম আমি!

লম্বা একটা শ্বাস ছাড়লো মিয়াকো। "কিছুদিন আগে একজন ডিটেক্টিভ এসেছিলেন আমার বাসায়, তিনিও ঠিক এই প্রশ্নগুলোই করেছিলেন। তবে আপনার মত পেঁচিয়ে বলেননি ভদ্রলোক, সরাসরিই জানতে চেয়েছেন, মি. হিদাকার প্রতি কোন ক্ষোভ পুষে রেখেছি কি না।"

"ওহ আচ্ছা," তার দিকে তাকালাম আবারো। "আপনি কী বললেন?"

"বললাম, ক্ষোভ পুষে রাখার প্রশ্নই আসে না। আমি শুধু চাইছিলাম, আমার মৃত ভাইয়ের ভাবমূর্তি কোন কারণে নষ্ট না হোক।"

"তাহলে আমি ধরে নিতে পারি 'নিষিদ্ধ প্রান্তর' উপন্যাসটি আপনার পছন্দ হয়নি?"

"দেখুন, মি. নোনোগুচি...প্রত্যেকের জীবনেই নিগূঢ় কিছু বিষয় থাকে। যা তাদের একান্ত গোপনীয়। আমাদের উচিত সেই গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।"

"কিন্তু সেই বিষয়গুলো যদি কারো আবেগের অংশ হয়? সেই আবেগটুকু কি সবার সাথে ভাগাভাগি করে নেয়ার অধিকার নেই কারো?"

"আবেগ?" মিয়াকোর চোখে এখন খেলা করছে কৌতূহল। "মিডল-স্কুল পড়ুয়া একটা মেয়েকে ধর্ষণের মধ্যে আবেগ কোথায় খুঁজে পাচ্ছেন আপনি?"

"গল্প লেখার সময় পাঠকের মনে আবেগের উদ্রেক ঘটানোর লক্ষ্যে এরকম সত্য ঘটনা প্রায়শই ব্যবহার করে লেখকেরা।"

আবারো দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো মিয়াকো। "আপনিও একজন লেখক, তাই না?"

"হ্যাঁ, তবে আমি বাচ্চাদের জন্যে লিখি।"

"যেহেতু আপনি একজন লেখক, তাই হিদাকার পক্ষ টানছেন?"

"হয়তো," কিছুক্ষণ ভেবে জবাব দিলাম।

"দারুণ একটা পেশা!" ওর কণ্ঠের শ্লেষটুকু ধরতে অসুবিধে হলো না। "মাফ করবেন, আমাকে এখন যেতে হবে," জবাবের অপেক্ষা না করেই ভ্যানের দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

***

অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ফিরে আমার মেইলবক্সে একটা কাগজ দেখতে পেলাম।

"আগের দিন আমরা যেখানে খেয়েছিলাম, সেই রেস্তোরাঁয় অপেক্ষা করছি আমি। ফোন করবেন। কাগা।"

কাগজের নিচের দিকে লেখা নম্বরটা নিশ্চয়ই ওই রেস্তোরাঁর।

শেষকৃত্যানুষ্ঠানের পোশাক পাল্টে একটা প্যান্ট আর জ্যাকেট গায়ে চাপিয়ে সোজাসুজি রেস্তোরাঁটায় চলে এলাম। ইচ্ছে করেই ফোন দেইনি। একটা জানালার পাশে বসে বই পড়ছিল ও। বইটার নাম দেখা যাচ্ছে না।

আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো কাগা। হাত নেড়ে ওকে বসতে ইশারা করলাম। "আরে, দাঁড়ানোর দরকার নেই।"

"এভাবে হঠাৎ ডেকে পাঠানোর জন্যে দুঃখিত," একবার বাউ করে বলল ডিটেক্টিভ। ও জানে যে আজকে হিদাকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ছিল।

ওয়েট্রেসকে এক গ্লাস দুধ দিতে বলে সিট টেনে নিয়ে বসে পড়লাম।

"জানি কেন এসেছেন আজকে। এগুলো নেয়ার জন্যে নিশ্চয়ই?" জ্যাকেটের পকেট থেকে কাগজগুলো বের করে ওর সামনে রাখলাম। গত কয়েকদিনে যা যা ঘটেছে, সব লেখা আছে ওখানে। এখানে আসার আগে প্রিন্ট করে এনেছি।

"অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে," বলে কাগজগুলো তুলে নিল কাগা।

"এখানে না পড়লে হয় না? আগের লেখাগুলো তো পড়েছেন নিশ্চয়ই? জানেন যে আপনার বিষয়েও লিখেছি আমি। এখন যদি আমার সামনেই আমার লেখা পড়েন, তাহলে ব্যাপারটা একটু কেমন যেন হয়ে যায়।"

হাসি ফুটলো ওর মুখে। "তা বটে। তাহলে এগুলো এখন আপনার কাছ থেক দূরে রাখাই উত্তম," কাগজগুলো ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বলল কাগা।

"তাহলে," পানির গ্লাসে চুমুক দিলাম। "আমার নোটগুলো কাজে আসছে?"

"হ্যাঁ, ভীষণ," সাথে সাথে জবাব দিলো কাগা। "কেবল দেখে বা শুনে অনেক সময় সবকিছু বোঝা যায় না। লেখার অক্ষরে দারুণভাবে গুছিয়ে আনা যায় সবকিছু, পাঠকেরও বুঝতে সুবিধে হয়। অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীরাও যদি এরকম লিখিত বয়ান দিত, খারাপ হতো না।"

"লেখাগুলো আপনার কাজে এসেছে জেনে খুশি হলাম।"

আমার অর্ডার করা দুধের গ্লাসটা দিয়ে গেল ওয়েট্রেস। উপরের ফেনাটুকু খাওয়ার জন্যে একটা চামচও দিয়েছে সাথে।

"বিড়ালটার ব্যাপারে আপনার মতামত কি?" জানতে চাইলাম।

"অবাক হয়েছিলাম ভীষণ। বিড়ালদের জ্বালাতনের অনেক নজির আছে, কিন্তু তাই বলে মেরে ফেলা..."

"বিড়ালটার মালিক সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছেন?"

"আমার বসের কাছে রিপোর্ট করেছি। অন্য কাউকে হয়তো কাজটা দিয়েছেন তিনি।"

"আচ্ছা," বলে দুধের গ্লাসে চুমুক দিলাম। এভাবে কারো ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়াটা আমার নিজের কাছেই ভালো লাগছে না। "ওই একটা ঘটনা বাদে সবকিছু অবশ্য আপনাকে আগেই বলেছিলাম।"

"তা বলেছিলেন," মাথা নেড়ে বলল হিদাকা। "কিন্তু খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আমার কাজে এসেছে বেশি।"

"খুঁটিনাটি বিষয় বলতে?"

"এই যেমন মি. হিদাকার অফিসে তার সাথে আপনার কথোপকথনের বিষয়টা। লিখেছেন যে কথা বলতে বলতে একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন তিনি। যদি আপনার নোটগুলো না পড়তাম, তাহলে এই তথ্যটা কখনো পেতাম না।"

"হ্যাঁ...তবে ও আসলে একটাই সিগারেট খেয়েছিল কি না, এই ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত নই আমি। দুইটাও খেতে পারে। শুধু এটুকু মনে ছিল যে ওর হাতে সিগারেট দেখেছিলাম।"

"না, একটা সিগারেটই খেয়েছিলেন তিনি," বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল কাগা। "আপনার ভুল হয়নি।"

"আচ্ছা।"

সিগারেট খাওয়া না খাওয়ার সাথে খুনের তদন্তের কী সম্পর্ক, তা বুঝতে পারলাম না। হয়তো ডিটেক্টিভেরা এভাবেই তাদের কাজ করে। সবকিছু আমলে নিতে হয় কাজের অংশ হিসেবে।

মিয়াকো ফুজিও'র সাথে যে আমার কথা হয়েছে আজকে, সেটাও বললাম কাগাকে। এটা শোনার পর কৌতূহলী হয়ে উঠল আমার প্রাক্তন সহকর্মী।

"সে অবশ্য বেফাঁস কিছু বলেনি আমাকে," বললাম। "কিন্তু ওর কি আসলেও অ্যালিবাই আছে?"

"আমাদের একজন লোক খোঁজ নিচ্ছে এই বিষয়ে। তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে আছে।"

"বেশ। তার বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে খুব বেশি লাভ হবে না তাহলে।"

"আপনি কি তাকে সন্দেহ করেন?"

"বিষয়টা সন্দেহ নাকি জানি না, তবে তার কিন্তু মোটিভ আছে।"

"মানে তার ভাইয়ের ব্যক্তিগত জীবন পুরো পৃথিবীর সামনে উন্মোচিত করে দিয়েছে হিদাকা, সেটার ক্ষোভ পুষে রেখেছে বলছো? কিন্তু তাকে হত্যা করার মাধ্যমে তো কোন সমাধান হবে না।"

"এমনটাও তো হতে পারে, সে বুঝতে পেরেছিল হিদাকা মন থেকে অনুতপ্ত নয়, এজন্যে মেজাজ হারিয়ে আক্রমন করে বসে অকস্মাৎ।"

"কিন্তু তিনি যখন ওখান থেকে বেরিয়ে যান, মি. হিদাকা বহাল তবিয়তেই ছিলেন।"

"পরে হয়তো ফিরে এসেছিল।"

"খুন করার উদ্দেশ্য?"

"হ্যাঁ," মাথা নেড়ে বললাম। "হতেই পারে।"

"কিন্তু রাই তো তখনও বাড়িতে ছিলেন।"

"তাহলে তার চলে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করেছে মিয়াকো, এরপর চুপিসারে ভেতরে ঢুকেছে।"

"অর্থাৎ মিয়াকো ফুজিও আগে থেকে জানতো রাই তার স্বামীকে বাসায় একা রেখে হোটেলে চলে যাবেন।"

"আলাপের এক পর্যায়ে হয়তো জানতে পেরেছিল।"

"হয়তো শব্দটা একটু বেশিই ব্যবহার করছেন আপনি," আমার দিকে তাকিয়ে বলল ডিটেক্টিভ কাগা। একমনে টেবিলে আঙুল বাজিয়ে চলেছে সে। দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি মাথার কলকব্জাগুলো ভন ভন করে ঘুরছে তার। "মিস ফুজিও কি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিলেন?"

"জানালা দিয়েও ঢুকতে পারে।"

"তাহলে আপনার ভাষ্যমতে, স্যুট পরিহিত এক যুবতী জানালা দিয়ে ভেতরে ঢোকে," হেসে বলল কাগা। "আর গোটা সময় রুমে বসে দৃশ্যটা দেখেন মি. হিদাকা?"

"ওর বাথরুমে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করেছিল বাইরে। এরপর ভেতরে প্রবেশ করে দরজার পেছনে গিয়ে লুকায়।"

"পেপারওয়েটটা তুলে নিয়েছিল টেবিল থেকে," একবার বল ছোড়ার ভঙ্গিতে হাত নাচিয়ে বলে ডিটেক্টিভ।

"সেরকমই হবার কথা," ডান হাতে মুঠো পাকিয়ে বলি। "এরপর সুযোগ বুঝে ওটা বসিয়ে দেয় হিদাকার মাথার পেছনে।"

"আচ্ছা। এরপর?"

হিদাকার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কাগা আমাকে সেদিন যা বলেছি, তা মনে করার চেষ্টা করলাম। "টেলিফোনের তার গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর পালিয়ে যায়?"

"ক্রাইম সিন থেকে কিভাবে পালায় সে?"

"জানালা দিয়ে। সামনের দরজা দিয়ে যদি বের হতো তাহলে আমরা ভেতরে ঢোকার সময় পাল্লাটা খোলাই পেতাম।"

"এটা ঠিক," বলে কফির কাপটার দিকে হাত বাড়ালো কিন্তু কাপটা খালি। "তবে সামনের দরজা ব্যবহার করলো না কেন?"

"তা জানি না। হয়তো কেউ দেখে ফেলবে এই ভয় পাচ্ছিল। তবে আসল কথা হচ্ছে তার পোক্ত অ্যালিবাই আছে। সুতরাং এসব উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা বৈ কিছু নয়।"

"হ্যাঁ, আসলেও তার অ্যালিবাইটা বেশ পোক্ত। অর্থাৎ এসব আসলেও উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা।"

এমনভাবে আমার কথার পুনরাবৃত্তি করলো কাগা, একটু অদ্ভুতই ঠেকলো বিষয়টা। "তাহলে ভুলে যান আমি এসব কিছু বলেছি।"

"নাহ, এরকম চিন্তা মাথায় আসতেই পারে। হাজার হলেও হিদাকা আপনার বাল্যবন্ধু। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় আমাকে ভেবে বলতে পারবেন?"

"আসলে, আমি এসবে দক্ষ নই। তবুও বলুন দেখি..."

"রুম থেকে বেরিয়ে যাবার সময় লাইট নিভিয়ে গেল কেন খুনি?"

"এটা তো সহজ," কিছুক্ষণ ভাবার পর বললাম। "লাইট নেভানো থাকলে বাইরে থেকে মনে হবে বাড়িতে কেউ নেই। ফলে হিদাকার মরদেহ খুঁজে পেতেও সময় লাগবে বেশি। বাস্তবেও কিন্তু এমনটাই হয়েছে।"

"তাহলে খুনি ইচ্ছেকৃতভাবে দেরি করিয়ে দিতে চাইছিল?"

"সব খুনিই কি সেটা করে না?"

"হয়তো," বলল কাগা। "তাহলে কম্পিউটারটা চালু করে রেখে গেল কেন?"

"কম্পিউটার?"

"হ্যাঁ। আপনারা যখন রুমে ঢোকেন, কম্পিউটারের স্ক্রিনটা চালু দেখতে পান। আপনিই বলেছেন এটা ।"

"তা ঠিক। হয়তো কম্পিউটারের বিষয়ে কোন মাথা ব্যথা ছিল খুনির।"

"সেদিন আপনারা চলে আসার পর একটা এক্সপেরিমেন্ট করি আমি। রুমের সব লাইট নিভিয়ে দিয়ে কেবল কম্পিউটারের মনিটরটা চালু করে রাখি। বেশ উজ্জ্বল আলো হয় কিন্তু...পর্দা টানা থাকলেও বাইরে থেকে

হালকা আলোর আভা দেখা যায়। খুনি যদি আসলেও চাইতো সবাই ভাবুক বাড়িতে কেউ নেই, তাহলে কম্পিউটারটাও বন্ধ করে যেত সে।"

"হয়তো সুইচ খুঁজে পায়নি। যারা কম্পিউটার সম্পর্কে বেশি কিছু জানে না, তারা এসব বিষয়ে ঝামেলায় পড়ে যায়।"

"অন্তত মনিটরটা তো বন্ধ করাই যেত, নাকি? ওটার সুইচ তো সামনেই...আর এটাও যদি না বোঝে সে, তাহলে প্লাগটা সকেট থেকে খুলে ফেললেই ঝামেলা মিটে যেত।"

"হয়তো ভুলে গেছিল।"

কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো ডিটেক্টিভ কাগা। "এটাই। হয়তো ভুলে গেছিল।"

বলার মত আর কিছু খুঁজে পেলাম না।

উঠে দাঁড়ালো কাগা। সময় দেয়ার জন্যে আমাকে ধন্যবাদ জানালো আরেকবার। "আজকের সবকিছুও কি লিখে রাখবেন?"

"হ্যাঁ, লেখার ইচ্ছে আছে।"

"আমি পড়তে পারবো?"

"আপনার ইচ্ছা, আমার কোন সমস্যা নেই।"

ক্যাশ রেজিস্টারের দিকে রওনা হতে গিয়েও থেমে গেল সে। "আপনার কি আসলেও মনে হয়েছিল, শিক্ষকতা পেশায় বেশিদিন টিকতে পারবো না আমি?"

আমার বয়ানে ওরকমই কিছু লিখেছিলাম বোধহয়। "এটা আসলে একান্তই আমার ব্যক্তিগত মতামত।"

নিচের দিকে তাকিয়ে একবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চলে গেল কাগা।

ওর মাথায় কী ঘুরছে কে জানে। কেসটার বিষয়ে কিছু একটা যদি ইতিমধ্যে জেনেই থাকে, তাহলে আমাকে বলল না কেন?

অধ্যায় ২

সন্দেহ
কিয়োচিরো কাগা'র আলোচনা

মার্ডার উইপেন হিসেবে পেপারওয়েটের ব্যবহারটা বেশ ভাবিয়েছে আমাকে। ওটা যে মি. হিদাকার ডেস্কে আগে থেকেই রাখা ছিল, সেটা কেউ বলার আগেই ধরতে পেরেছিলাম। এখান থেকে বোঝা যায় খুনি কুনিহিকো হিদাকাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ওখানে যায়নি সেদিন।

খুনটা যদি পূর্ব পরিকল্পিত হতো, তাহলে অবশ্যই পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আসতো খুনি। তবে এমনটাও হতে পারে, শেষ মুহূর্তে বদলে যায় তার পরিকল্পনা, কিংবা বদলাতে বাধ্য হয় সে। তাই হাতের কাছে যা পেয়েছে, সেটা দিয়েই আক্রমন করেছে মি. হিদাকাকে। তবে এমনটা হবার সম্ভাবনা একদমই কম।

খুব সম্ভবত মুহূর্তের উত্তেজনায় আবেগতাড়িত হয়ে কাজটা করেছে সে। এখান থেকেই মূলত বন্ধ দরজাগুলোর ব্যাপারে ভাবতে শুরু করি। মিসেস হিদাকা এবং নোনোগুচির মতে বাড়ির সামনের দরজা এবং অফিসরুমের দরজা–দুটোই বন্ধ ছিল।

রাই হিদাকার ভাষ্যমতে–'বিকেল পাঁচটার দিকে বাড়ি থেকে বের হই আমি। হিদাকা তখন লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত ছিল বিধায় চাবি দিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করে যাই। নতুবা কেউ ভেতরে ঢুকে পড়লে বুঝতেও পারতো না ও। তবে এরকমটা যে আসলেও ঘটবে, তা কস্মিনকালেও মাথায় আসেনি আমার।'

ফরেনসিক টেকনিশিয়ানদের মতে, সামনের দিকের দরজার হাতলে কেবল হিদাকা দম্পতির হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। গ্লোভস পরে কেউ

হাতলটা ধরেনি কিংবা হাতের ছাপ মুছে দেয়ার চেষ্টাও করেনি। সুতরাং রাই হিদাকার কথা মেনে নেয়াই যায়।

তবে এটা খুবই সম্ভব যে, অফিসরুমের দরজাটা খুনিই ভেতর থেকে আটকে দিয়েছে। তাছাড়া, ভেতরের হাতলে হাতের ছাপ যে কিছু একটা দিয়ে মুছে দেয়া হয়েছে, তার প্রমাণ পেয়েছি আমরা।

সেজন্যেই আমার জোর বিশ্বাস, অফিসের জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল খুনি। কিন্তু এখানে অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারে, খুনটা যদি পূর্বপরিকল্পিত না-ই হয়ে থাকে, তাহলে ওখান দিয়ে কেন ভেতরে ঢুকবে কেউ? আততায়ী যে চুরি করার উদ্দেশ্যে হিদাকাদের বাড়িতে ঢুকেছিল, এটা অতি কল্পনা হয়ে যায়। একমাত্র গর্দভ শ্রেণীর কেউ বাদে ওরকম খালি বাসায় চুরি করতে ঢুকবে না।

তবে এই প্রশ্নটারও একটা সম্ভাব্য উত্তর আছে।

এমন কি হতে পারে না, একই দিনে দু'বার হিদাকাদের বাড়িতে গিয়েছিল খুনি? প্রথমবার অতিথি হিসেবে সামনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকে সে। এরপর বিদায় নিয়ে (কিংবা বিদায় নেয়ার অভিনয় করে) আবারো জানালা দিয়ে প্রবেশ করে বাড়ির ভেতরে। এবারে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল তার মনে আর সেই উদ্দেশ্যটা হচ্ছে কুনিহিকো হিদাকাকে খুন করা। হয়তো প্রথমবার যখন বাড়িটায় এসেছিল সে, তখন এমন কিছু ঘটেছিল, যার কারণে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নেয়।

এখন আমাদের ভাবতে হবে, খুনের দিন কে কে গিয়েছিল হিদাকাদের বাসায়। বর্তমানে কেবল দু'জন ব্যক্তির নাম জানি আমরা। মিয়াকো ফুজিও এবং ওসামু নোনোগুচি।

তদন্ত শুরুর সময় এই দু'জনই ছিল আমাদের প্রধান সন্দেহভাজন। কিন্তু যখন জানতে পারি, দু'জনেরই পোক্ত অ্যালিবাই আছে, একদম ধন্দে পড়ে যাই সবাই।

ঘটনার দিন সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে যান মিয়াকো ফুজিও। দু'জন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় তার এই দাবির পক্ষে। তাদাও নাকাজুকা, মিস ফুজিওর বাগদত্তা এবং কিকুও উয়েদা, বিয়েতে তাদের প্রধান সহযোগী। আগামী

মাসে তাদের আসন্ন বিবাহোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের বিষয়ে আলাপ করার জন্যে দেখা করে তিনজন। উয়েদা হচ্ছে নাকাজুকার অফিসের বস। মিয়াকো ফুজিও'র সাথে কোন ধরণের আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই তার। সুতরাং অধীনস্থ এক কর্মীর হবু স্ত্রী'কে বাঁচানোর জন্যে মিথ্যে বলাটা তাকে মানায় না। তাছাড়া রাই হিদাকার কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি, পাঁচটার কিছুক্ষণ পর তাদের বাড়ি থেকে বের হন মাসায়া ফুজিওর বোন। রাস্তার অবস্থা এবং দূরত্ব বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যাবে যে ছ'টার দিকেই বাসায় ফেরার কথা মিয়াকোর।

বাকি থাকে ওসামু নোনোগুচি।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে আমার। আগে আমি যে স্কুলে শিক্ষকতা করতাম, সেখানে সামাজিক বিজ্ঞান আর ইংরেজি কম্পোজিশন পড়াতো নোনোগুচি। সত্যি বলতে, আমার অতীতের এই অংশটুকু ভুলতেই বসেছিলাম।

যদি আমি দেখি আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে কেসের সুষ্ঠু তদন্ত কোনভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই নিজেকে সরিয়ে নেব। তবে, সেরকম কিছু হবে না বলেই আশা করছি। তাছাড়া আমার ধারণা, নোনোগুচির সাথে পূর্ব পরিচয়ের বিষয়টা আমাদের সাহায্যই করবে।

তবে নোনোগুচিরও একটা পোক্ত অ্যালিবাই আছে।

সাড়ে চারটার দিকে মিয়াকো ফুজিও'র হিদাকাদের বাড়িতে আগমনের কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসে সে। ওখান থেকে সরাসরি বাসায় গিয়ে ছ'টা অবধি ব্যস্ত থাকে কাজ নিয়ে। এসময় পান্ডুলিপি নিয়ে আলোচনার জন্যে ইউকিও ওশিমা নামের এক ভদ্রলোক উপস্থিত হন তার বাড়িতে। তার ঠিক কিছুক্ষণ পর কুনিহিকো হিদাকা ফোন দিয়ে জানান, নোনোগুচির সাথে আটটার দিকে দেখা করতে চান তিনি।

একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে একসাথে খাওয়া দাওয়া করে নোনোগুচি এবং ওশিমা। এরপর আটটার দিকে হিদাকাদের ওখানে গিয়ে দেখে ভেতরে কেউ নেই। বাড়ির সবগুলো বাতি নেভানো ছিল তখন। তবে কিছু একটা সন্দেহ হওয়ায় নিকটবর্তি বুথ থেকে রাই হিদাকাকে ফোন দেয় নোনোগুচি। তারপর

আটটা পঁয়ত্রিশ অবধি ল্যাম্প নামের একটা ক্যাফেতে গিয়ে অপেক্ষা করে। আটটা চল্লিশের সময় আবারো হিদাকাদের বাড়িতে আসে সে। ওখানে রাইয়ের সাথে দেখা হয় তার। এরপর দু'জনে মিলে ভেতরে ঢুকে হিদাকার মরদেহ দেখতে পায় অফিস রুমের মেঝেতে।

এটুকু বিবেচনা করে মনে হচ্ছে ওসামু নোনোগুচির অ্যালিবাইয়ে কোন ফাঁক প্রায় নেই বললেই চলে। দোজিশা পাবলিশিংয়ের মি. ওশিমা এবং ল্যাম্পের মালিক প্রত্যেকেই ওসামুর কথার সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

তবে পুরোপুরি পোক্ত বলা যাবে না। বক্তব্য সত্য হলেও রাইয়ের সাথে সাক্ষাতের পূর্বে কুনিহিকো হিদাকাকে হত্যার একটা না একটা সুযোগ ওসামু পাওয়ারই কথা। খুব সম্ভবত মি. ওশিমার সাথে ডিনার শেষ করে সরাসরি হিদাকাদের বাড়িতে গিয়ে হত্যা করে মি. হিদাকাকে। এরপর সব প্রমাণ লোপাটের পর ঠান্ডা মাথায় ফোন দেয় ভিক্টিমের সহধর্মিণীকে। তার কণ্ঠ শুনে নিশ্চয়ই বোঝার উপায় ছিল না যে কিছুক্ষণ আগে কি ঘটে গেছে।

তবে সুরতহালের রিপোর্ট বিবেচনা করলে এই আন্দাজ ধোপে টিকবে না। সেদিন স্ত্রী'র সাথে শপিংয়ে বেরিয়ে একটা দোকান থেকে বার্গার খান কুনিহিকো হিদাকা। পরিপাকের অবস্থা বিবেচনায় এটা স্পষ্ট যে তার মৃত্যু হয়েছে বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যবর্তি কোন এক সময়ে। অন্তত সাতটার পরে কোনভাবেই নয়।

ওসামু নোনোগুচির অ্যালিবাই টিকে যায় তাহলে।

তবে আমার সন্দেহ সে-ই খুনি। খুনের রাতে তার বলা একটা কথা থেকেই এমনটা মনে হয়। ওই মুহূর্তে কথাটা শোনার পর থেকেই আমার মনে হতে থাকে যে ওসামুই খুনটা করেছে। তবে এরকম নিছক অনুমানকে প্রশ্রয় দিয়ে সুষ্ঠু তদন্ত করা সম্ভব না, তাই আপাতত ভাবনার লাগামটা টেনে ধরতে হবে।

ওসামু নোনোগুচি যে সবকিছু লিখে রেখেছে, এটা শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম। একজন খুনি যাবতীয় ঘটনাবলি টুকে রাখবে, এটা অবাক করার মত বিষয়ই বটে। তবে লেখাটা পড়ার পর বুঝতে পারি, উল্টোটা বরং সত্যি। নিজেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই কাজটা করেছে সে।

খুবই গোছানো একটা লেখা। আর এই গোছানো ভাবটাই পাঠকের মনকে প্রভাবিত করবে। পড়ার সময় মনে হবে ওখানে যা কিছু লেখা, সেভাবেই সব ঘটেছে। কিন্তু তেমনটা তো না-ও হতে পারে, তাই না? এখানেই নোনোগুচির নিপুণতা। সম্পূর্ণ কাল্পনিক এক লিখিত জবানবন্দির মাধ্যমে নিজের দিক থেকে সন্দেহের তীর দূরে ঠেলে দেয়া।

তাকে যে সন্দেহ করা সময়ের ব্যাপার মাত্র, এটা নিশ্চয়ই আগে থেকেই বুঝে যায় সে। আমি যে তার সাথে আগে একই স্কুলে চাকরি করতাম, এই বিষয়টাও নিজের সুবিধার্থে কাজে লাগাতে চেয়েছে নোনোগুচি। আমাকে তার পরিকল্পনার অংশ করে লেখাটা পড়তে দিয়েছে। নিশ্চয়ই ভেবেছিল আমি যেহেতু শিক্ষক হিসেবে ভালো করতে পারিনি, গোয়েন্দা হিসেবেও সুবিধে করে উঠতে পারবো না, তার পাতা ফাঁদে সহজেই পা দেব।

আবার এমনটাও হতে পারে, আমি একটু বেশি বেশিই ভাবছি। ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলো কেসটা থেকে দূরে রাখতে গিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি সত্যের থেকে। তবুও, লেখাটা পড়তে গিয়ে বারবার মনে হচ্ছিল খুব সাবধানে কিছু ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছে পাঠকদের জন্যে। এরপর এমন একটা আলামত খুঁজে পেলাম যাতে আর কোন সন্দেহ রইল না যে নোনোগুচিই আসল খুনি।

আবারো নিজের অনুমানের প্রতি ভরসা ফিরে পেলাম। বেশ লম্বা সময় ভাবনাচিন্তার পর সন্তুষ্ট হয়ে চূড়ান্ত রিপোর্টটাও তৈরি করলাম সেই মোতাবেক। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এসব ব্যাপারে বেশ সাবধানী। তিনিও আমার যুক্তির সাথে একমত প্রকাশ করলেন। বলে রাখা ভালো, ওসামু নোনোগুচিকে আগেই সন্দেহ হয়েছিল তার। নোনোগুচির লিখিত বক্তব্যে কোথাও উল্লেখ নেই, কিন্তু ঘটনার রাতে বেশ উচ্ছ্বসিত মনে হচ্ছিল তাকে। স্বভাববিরুদ্ধভাবে কথাও বেশি বলছিল। আমি এবং আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, দু'জনেই খুব ভালো করে জানি, অপরাধবোধ থেকেই এরকমটা করে থাকে মানুষ।

"কিন্তু সমস্যা হচ্ছে," বস বললেন, "কোন প্রমাণ নেই।"

এই কথাটার সাথে একমত না হয়ে পারলাম না। আমি জানি, অনুমানটায় কোন ভুল নেই কিন্তু সেটার স্বপক্ষে প্রমাণও হাজির করা চাই। আদালতে আমার যুক্তিটা ধোপে টিকবে না। শক্ত প্রমাণ দরকার।

আরেকটা সমস্যা আছে। মোটিভ। কুনিহিকো হিদাকা আর ওসামু নোনোগুচির বিষয়ে অনেক তথ্য জোগাড় করেছি আমি, অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। কিন্তু এমন কোন কারণ খুঁজে পাইনি, যে কারণে হিদাকার প্রতি নোনোগুচির আক্রোশ জন্মাবে। বরং নোনোগুচির তো হিদাকার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। লেখালেখিতে তার পড়তি ক্যারিয়ারকে নিজ হাতে টেনে তুলেছে হিদাকা।

নোনোগুচির সাথে একসাথে শিক্ষকতার করার সময়টা নিয়ে লম্বা সময় ধরে ভেবেছি। মিডল স্কুলের একজন রচনা শিক্ষক তুলনায় বরাবরই ঠান্ডা মাথার মনে হত তাকে। কাজে খুব একটা ভুল করতো না কখনোই। এমনকি কোন ছাত্র বা ছাত্রিকে নিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলেও ঘাবড়ে যেত না। বরং পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ধীরে-সুস্থে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতো। ঝামেলা কাটিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বরাবরই পটু ছিল সে। বাড়িয়ে বলছি না, কিন্তু নোনোগুচি কখনোই এমন কোন কাজ করতো না যাতে মনে হয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা সে নিয়েছে। বরং বিদ্যালয়ের হ্যান্ডবুকে লেখা নির্দেশনার সাথে মিলে যেত তার কর্মপদ্ধতি। একজন প্রাক্তন সহকর্মীর মতে :

"মি. নোনোগুচি কখনোই শিক্ষকতার পেশায় আসতে চাননি। ঝামেলা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে কারণ ছাত্রছাত্রিদের নিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করতে রাজি নয় সে। এজন্যেই কখনো কোন কিছুতে জড়ায় না।"

ভদ্রমহিলা ধরেই নিয়েছিলেন, লেখালেখিকে ফুল-টাইম পেশা হিসেবে বেছে নেয়ার পরপরই শিক্ষকতা ছেড়ে দিবে নোনোগুচি। কখনো শিক্ষকদের গেট-টুগেদার বা কোন অনুষ্ঠানে অংশ নিত না সে। বরং সেই সময়ে বাসায় বসে লেখালেখি করতো।

এক সময় ঠিকই শিক্ষকতা ছেড়ে লেখালেখিতে মনোনিবেশ করে সে;

তবে শিক্ষকতার ব্যাপারে তার প্রকৃত মনোভাব কিরকম ছিল, এটা এখনও অপরিষ্কার।

আমাকে একবার নিজের মুখেই একটা কথা বলেছিল নোনোগুচি, সেখান থেকে কিছুটা ধারণা করা যায় অবশ্য :

"শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে সম্পর্কের ভিতটাই হচ্ছে একটা ভ্রম। শিক্ষকের মনে হয় তিনি ছাত্রকে কিছু শেখাচ্ছেন, ছাত্রের মনে হয় সে কিছু শিখছে। এই ভ্রমের কারণে ছাত্র-শিক্ষক দু'জনেই খুশি। তেতো সত্যের মুখোমুখি হয়ে তো কিছু অর্জন করা যাবে না। আমরা তাই এই শিক্ষাব্যবস্থা নামক খেলায় মেতে আছি।"

এ রকমটা একটা ধারণা কেন তার মাথায় এলো, তা আসলেও রহস্য।

অধ্যায় ৩

সংকল্প

ওসামু নোনোগুচির বক্তব্য

এই ঘর ছেড়ে বেরুবার আগে আমাকে লিখিত বক্তব্যটুকু শেষ করার বিশেষ অনুমতি দিয়েছেন ডিটেক্টিভ কাগা। অবশ্য আমি কেন লেখা চালিয়ে যেতে চেয়েছি, তা নিশ্চয়ই বোধগম্য হয়নি ওনার কাছে। বললেও অবশ্য বুঝতেন বলে মনে হয় না। লেখকমাত্রই যে কোন অসম্পূর্ণ লেখা শেষ করার একটা তাগিদ থেকে যায়। হোক সেটা উদ্দেশ্যপূর্ণ কোন লেখা।

গত এক-দেড় ঘন্টায় যা ঘটলো, তা লিখে রাখা দরকার বলেই আমার বিশ্বাস। আর এর জন্যে আমার লেখক সত্তাকেই দায়ী করবো। তবে এখন যা লেখবো, তা ভবিষ্যতে আমার জন্যে কাল হয়ে দাঁড়াবে, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

***

আজ (২১শে এপ্রিল), ঠিক সকাল দশটায় আমার বাসায় এলেন ডিটেক্টিভ কাগা। বেলের শব্দ শুনেই আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল দরজা খুলে হয়তো তাকেই দেখবো। পিপহোলে উঁকি দেয়া মাত্র অনুমানটা বাস্তবে রূপ নেয়। তবুও চেষ্টা করেছি নিজের অস্থিরতাটুকু যথাসম্ভব চেপে রাখার।

"না বলে হুট করে চলে আসার জন্যে দুঃখিত," স্বভাবসুলভ শান্তস্বরে বলল সে। "আসলে, কিছু বিষয়ে আপনার সাথে কথা বলা দরকার।"

"কী?" দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

ডিটেক্টিভ সোফায় এসে বসলে চা বানাবো কি না জানতে চাইলাম। সে

মানা করলেও অবশ্য আপত্তিটুকু কানে তুললাম না। ঝটপট বানিয়ে ফেললাম।

"তো, কী যেন বলবেন বলছিলেন?" চায়ের কাপটা তার সামনে নামিয়ে রাখি আমি। হাতটা মৃদু কাঁপছে, চোখ তুলে দেখি সেদিকেই তাকিয়ে আছেন ডিটেক্টিভ কাগা।

চায়ের দিকে হাত বাড়ালো না সে। "আসলে," আমার চোখে চোখ রেখে বলল, "আমার কথাগুলো শুনতে হয়তো আপনার ভালো লাগবে না।"

"জি?" প্রাণপণে চেষ্টা করলাম একদম স্বাভাবিক থাকার কিন্তু বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়িপেটা করছে। বারবার মনে হচ্ছে, এই বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাব।

"আপনার অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি চালাতে চাই আমি।"

বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম চেহারায়। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টাও করলাম। জানি না, কতটা সফল হলাম। কাগার কাছে নিশ্চয়ই সবকিছু তেতো লাগছে।

"কী বলছেন এসব? এখানে তল্লাশি চালানোর কি কোন দরকার আছে? কিছু তো পাওয়া যাবে না।"

"অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাজটা করতে হবে আমাকে, মাফ করবেন।"

"দাঁড়ান! আপনি কি ভাবছেন আমি খুন করেছি হিদাকাকে? এখানে আলামত খুঁজতে এসেছেন?"

"একভাবে বললে, হ্যাঁ," আলতো মাথা নেড়ে বলল ডিটেক্টিভ কাগা।

"অবাক হচ্ছি বললেও কম হবে," মিথ্যাটুকু বলতে গলা কাঁপলো না আমার। অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালাম। আমার অভিনয় ক্ষমতা বলতে এটুকুই। "আসলে আমি বুঝে উঠতে পারছি না কী বলবো, আপনি ঠাট্টা করছেন না তো?"

"না, ঠাট্টা নয়। এখন প্রাক্তন সহকর্মীকে কথাটা বলতে আমার নিজেরও খারাপ লাগছে। কিন্তু সত্য উদঘাটনের জন্যে যা যা করা দরকার, আমি করবো।"

"আপনার চাকরি নিয়ে ধারণা আছে আমার। যদি কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র

সন্দেহও থেকে থাকে, তবে সেটা খুঁটিয়ে দেখা জরুরি। ঘটনার সাথে তদন্তকারীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছ, এমন কেউ জড়িত থাকলেও পিছপা হওয়া যাবে না। তবে সত্যি বলতে, আমি যতটা না অবাক হয়েছি, তার চেয়ে বেশ চমকে গেছি। আসলে হুট করেই চলে এসেছেন তো।"

"ওয়ারেন্ট আছে আমার সাথে।"

"সার্চ ওয়ারেন্ট? তা তো থাকবেই। কিন্তু তল্লাশি শুরুর আগে আমাকে কি দয়া করে বলবেন কেন এমনটা করছেন? মানে আমাকে–"

"সন্দেহ করছি কেন?"

"হ্যাঁ, এটাই। নাকি কোন প্রকার ব্যাখা ছাড়াই যে কারো বাসায় ঢুকে হুটহাট তল্লাশি শুরু করে দেন?"

"দরকার পড়লে," টেবিলের দিকে তাকিয়ে অবশেষে চায়ের কাপটা তুলে নিল কাগা। এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু আপনাকে জানাতে কোন অসুবিধে নেই।"

"শুনে খুশি হলাম। তবে আপনার সাথে একমত হবো কি না, সেই বিষয়ে নিশ্চয়তা দিতে পারছি না।"

জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করে আনলো কাগা। "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে ভিক্টিমের মৃত্যুর সময়টা। প্রাথমিক ধারণা মোতাবেক, পাঁচটা থেকে সাতটার মধ্যবর্তি কোন এক সময়ে মারা গেছেন ভদ্রলোক। কিন্তু করোনারের ভাষ্যমতে, সময়টা ছয়টার আগে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মৃত ব্যক্তির পাকস্থলী পরীক্ষা করে মৃত্যুর সম্ভাব্য সময় আন্দাজ করা একটা সর্বজনবিদিত পদ্ধতি। আর এ রকম কেসের ক্ষেত্রে সময়কালটা যথাসম্ভব নিখুঁত হলে সুবিধে হয় তদন্তে। খাবার কতটা পরিপাক হয়েছে, তা বিবেচনার মাধ্যমে এই ব্যপ্তিটুকু দুই ঘন্টারও কমে নামিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু একজন সাক্ষীর ভাষ্যমতে সন্ধ্যা ছ'টার পরেও বেঁচে ছিলেন হিদাকা।"

"কথাটা তো সত্যি। ভুল কিছু বলিনি আমি। জানি, আপনি হয়তো আমার সাথে একমত হবেন না কিন্তু স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ডাক্তার

সাহেবের ভুল হতেও পারে। বিশ-ত্রিশ মিনিট এদিক ওদিক হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না।"

"অবশ্যই না, কিন্তু আমার খটকা অন্য জায়গায়। মি. হিদাকা যে ছ'টার পরেও বেঁচে ছিলেন, এটা আপনি দাবি করছেন স্রেফ একটা ফোনকলের ওপরে ভিত্তি করে। অপর প্রান্তে যে আসলেও মি. হিদাকাই ছিলেন, সেটা নিশ্চিত করার কোন উপায় নেই আমাদের।"

"হিদাকাই ছিল, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই আমার।"

"বুঝলাম, কিন্তু প্রমাণ তো করতে পারবেন না। আপনি বাদে আর কেউ তখন লাইনে ছিল না।"

"আমার মুখের কথাই আপাতত মেনে নিতে হবে আপনাদের।"

"আমার কোন আপত্তি নেই–মেনে নিতামও কিন্তু কোর্ট আপনার কথা মানবে না।"

"একটা ব্যাপার ভুলে যাবেন না, ফোনটা আমি করিনি। বরং আমার নম্বরেই কল এসেছিল। তখন কিন্তু একজন অতিথিও ছিল আমার বাসায়...মি. ওশিমার সাথে বোধহয় এই বিষয়ে আলাপ হয়েছে আপনার, নাকি?"

"হয়েছে। তিনি নিশ্চিত করেছেন ছ'টার কিছুক্ষণ পরে একটা ফোন আসে আপনার।"

"আমাদের কথা বলতে শোনেনি সে?"

"আপনাদের নয়, কেবল আপনাকে কথা বলতে শুনেছিল সে। তার কাছে মনে হয় কারো সাথে দেখা করার পরিকল্পনা করছিলেন তখন। এরপরেই আপনি তাকে জানান যে কুনিহিকো হিদাকা ফোন দিয়েছিল।"

"তাহলে, এটুকুই কি প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট নয়? নাকি আপনি ভাবছেন, অন্য কেউ ফোন দিয়েছিল আমাকে আর সেটাকেই হিদাকার নামে চালিয়ে দিয়েছি?"

ভ্রু কুঁচকে নিচের ঠোঁটে কিছুক্ষণ চিমটি কাটলো কাগা। "সেই সম্ভাবনাও পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়া যায় না।"

"কারো মুখের কথায় আপনার বোধহয় ইদানীং আর বিশ্বাস-টিশ্বাস করেন না," ভাব দেখালাম যেন তার কথাটা শুনে ভীষণ মর্মাহত হয়েছি।

"কিন্তু মৃত্যুর সময় নিয়ে এত টানা-হেঁচড়া করছেন কেন, বলুন তো? মানলাম ময়নাতদন্তে উল্লেখিত সময়ের সাথে একটু নাহয় হেরফের হচ্ছে, কিন্তু সেটুকু তো আর খুব বেশি না। আপনার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে, কয়েক মিনিট এদিক সেদিক হলেই গোটা বিষয়টা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন। যেন গোটা ব্যাপারটাই আমার বানোয়াট। আশা করি আমাকে সন্দেহ করার পেছনে এর চেয়েও ভালো কোন কারণ আছে আপনার। আর যদি না থাকে, তাহলে, বিষয়টা আমার জন্যে অপমানজনক।"

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ আমার দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকলো কাগা। "ভালো কারণ আছে।"

"বলুন, শুনি।"

"সিগারেট।"

"বুঝলাম না?"

"আপনি আমাকে বলেছেন মি. হিদাকা মাত্রাতিরিক্ত ধূমপান করতেন। এতটাই বেশি যে মাঝে মাঝে আপনার মনে হতো কেউ বুঝি মশার ঔষধ দিয়েছে তার অফিসে।"

"হ্যাঁ, বলেছি, তো?" হঠাৎই অদ্ভুত এক আশঙ্কায় ছেঁয়ে উঠল মন। যেন কালো ধোঁয়ার দল জাপটে ধরছে আমার ফুসফুসটাকে।

"অ্যাশট্রেতে কেবল একটা সিগারেটের উচ্ছিষ্ট ছিল।"

অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে গেল আমার মুখ দিয়ে।

"একটা সিগারেটের উচ্ছিষ্ট, তাও দোমড়ানো। মিয়াকো ফুজিও বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর সে যদি আসলেই কাজ করতো তাহলে কিন্তু আরো অনেকগুলো সিগারেটের মাথা থাকার কথা ছিল ওখানে। আর ওই সিগারেটটাও তিনি আপনার সাথে কথা বলার সময়েই খেয়েছিলেন, মি. নোনোগুচি। কাজ করার সময় নয়। আপনি নিজেই সেটা উল্লেখ করেছিলেন।"

হঠাৎই আমার মনে পড়ে, কাগা হিদাকার সিগারেট খাওয়া নিয়ে প্রশ্ন করেছিল সেদিন। তাহলে সে কি শুরু থেকেই আমাকে সন্দেহ করে আসছে?

"অর্থাৎ," আমার প্রাক্তন সহকর্মী বলে, "মিয়ায়কো ফুজিও বাসা ছেড়ে

বেরুনোর পর থেকে খুন হওয়া অবধি কোন সিগারেট ধরাননি তিনি। ওনার স্ত্রী'র সাথে কথা হয়েছে আমার। তার ভাষ্যমতে, মি. হিদাকা যদি আধঘন্টাও কাজ করতেন, তাহলে কম করে হলেও দুটো বাড়তি সিগারেটের উচ্ছিষ্ট দেখা যেত অ্যাশট্রেতে। বরং নতুন কোন ধারাবাহিক নিয়ে কাজ করার সময় গতানুগতিকের চাইতে আরো বেশি সিগারেট দরকার হতো মি. হিদাকার। কিন্তু সেই রাতে একটা সিগারেটও জ্বালাননি ভদ্রলোক। এর কারণ কী হতে পারে?"

মনে মনে নিজেকে ভর্ৎসনা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমার। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নজর এড়িয়ে গেল! আমি নিজে ধূমপায়ী নই বলেই এমনটা হয়েছে।

"হয়তো সিগারেট ছিল না ওর কাছে," জানি যে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই, তবুও বললাম। "কিংবা, পরবর্তিতে খাওয়ার জন্যে হয়তো বাঁচিয়ে রাখছিল?"

"সেদিন লাঞ্চের সময়েই চার প্যাকেট সিগারেট কেনেন হিদাকা। তার ডেস্কের প্যাকেটটায় চোদ্দটা সিগারেট পেয়েছি আমরা, অক্ষত। ড্রয়ারে না খোলা তিনটা প্যাকেট।"

কাগা কথাগুলো শান্তস্বরে বললেও শব্দগুলোর অন্তরালে ক্রমশ অগ্রসরমান অভিযোগের তীর ঠিকই অনুভব করতে পারছি। ধীরে ধীরে হালে পানি পাচ্ছে। কেন্দো খেলায় বরাবরই ভালো ছিল সে। একটা শীতল স্রোত নেমে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ।

"তাই নাকি?" বললাম আমি। "তাহলে তো অ্যাশট্রেতে একটা সিগারেটের উপস্থিতি আসলেও সন্দেহের উদ্রেক ঘটাবে। তবে প্রশ্নটার উত্তর জানতে হলে হিদাকাকেই জিজ্ঞেস করতে হবে আপনাকে, ডিটেক্টিভ। হয়তো গলা খুসখুস করছিল বেচারার কিংবা, অন্য কিছুও তো হতে পারে, তাই না?" শেষ চেষ্টা করলাম।

"তেমনটা হলে আপনার সামনে সিগারেট ধরালেন কেন? সব কিছু বিবেচনায় সহজ ব্যাখাটা মেনে নেয়াই শ্রেয়।"

"অর্থাৎ, আরো আগেই মৃত্যু হয়েছে তার?"

"হ্যাঁ, বেশ আগে। সিগারেটের এই বিষয়টা থেকে আমরা আন্দাজ করতে পারি, মিস ফুজিও বেরুনোর পর অফিসে ফিরে যান তিনি, ডেস্কে বসার কিছুক্ষণের মধ্যেই খুন হন।"

"আপনাকে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে এই বিষয়ে।"

"আরেকটা বিষয়, মিস ফুজিওর সাথে কথা বলার সময়েও কোন সিগারেট ধরাননি মি. হিদাকা। তার স্ত্রী'র ভাষ্যমতে, সিগারেটের ধোঁয়া পছন্দ নয় মিস ফুজিওর। তাই তার কথা ভেবেই সিগারেট বের করেননি হিদাকা। ভেবেছিলেন এতে হয়তো মিস ফুজিও আলোচনায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন।"

"তা নিশ্চয়ই ভেবেছিল।" হিদাকা বরাবরই মানুষকে পড়তে ওস্তাদ। প্রতিটা কাজের পেছনেই কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে।

"কিন্তু মিস ফুজিওর সাথে তার যে বিষয়ে আলাপ হয়েছে, তা যে কোন মানুষের মনে চাপ ফেলতে বাধ্য। তাই ভদ্রমহিলা বিদায় নেয়ার পর, স্ত্রীর সাথে কথা শেষ করে বুভুক্ষের মত সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়াটাই স্বাভাবিক ছিল মি. হিদাকার জন্যে। কিন্তু তেমনটা হয়নি। তিনি কি ধূমপান করেননি? নাকি ধূমপানের সুযোগ পাননি? আমাকে জিজ্ঞেস করলে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটার পক্ষেই বাজি ধরবো।"

"কারণ ততক্ষণে খুন হয়ে যায় ও।"

"হ্যাঁ," মাথা নেড়ে বলে কাগা।

"কিন্তু আমি তো অনেক আগেই ওখান থেকে চলে এসেছি।"

"জানি আমি। সামনের দরজা দিয়েই বের হয়েছিলেন আপনি। এরপর বাগান ঘুরে আবারো হিদাকার জানালার কাছে ফিরে যান।"

"আপনি মনে হয় পাশে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিলেন?"

"আসলে, আপনার কথা থেকেই ধারণাটা প্রথম মাথায় উঁকি দেয় আমার। মনে আছে, আপনি বলেছিলেন যে মিয়াকো ফুজিওই সম্ভাব্য খুনি? বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নাম করে বাগান ঘুরে আবারো হিদাকার অফিসে উপস্থিত হয় সে, তাই না? এমনটাই তো ধারণা আপনার? এখন তো আমার মনে হচ্ছে, নিজে যা করেছিলেন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মিস ফুজিও'র নাম করে সেটাই আমাকে শোনাচ্ছিলেন আপনি।"

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালাম আমি। "আপনাকে সাহায্য করতে গিয়ে দেখি ফেঁসে গেলাম! আপনি যদি আমার কথা আমার বিরুদ্ধেই এভাবে ব্যবহার করবেন জানতাম, তাহলে টুঁ শব্দও করতাম না।"

নোটবুকের দিকে তাকালো কাগা। "আপনার লিখিত বক্তব্যে হিদাকাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা বর্ণনা করেছেন এভাবে–'বাই,' বলে আমি দৃষ্টির আড়াল হওয়া অবধি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলো রাই।' "

"তো? তাতে কী?"

"আপনার বর্ণনা মতে, বিদায় জানানোর জন্যে সামনের গেট পর্যন্ত হেঁটে আসেন রাই হিদাকা। কিন্তু আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করি, তখন তিনি বলেন, বাড়ির দরজা অবধি এসেছিলেন। দু'রকম কথা হয়ে গেল না তাহলে?"

"দু'রকম কথা! বড়জোর এটা বলতে পারেন যে আমরা দুইভাবে মনে রেখেছি ঘটনাটা।"

"তাই কি? আমার তো মনে হয় আপনি ইচ্ছে করে মিথ্যে বিবরণ দিয়েছেন। লেখাটা যে পড়বে সে ধরেই নেবে, বাড়ির সীমানা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। অথচ মূল ঘটনা ভিন্ন।"

"ফালতু কথা," ভ্রুঁ কুঁচকে বলি। "আপনি জোর করে আমাকে এসবে জড়াতে চাচ্ছেন। আসলে, আমরা যদি গল্পের শেষটা নিজের মনমত গড়ে নেই, তখন ভাবি সবকিছু সেই মোতাবেকই ঘটেছে।"

"ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা, আমি ঠিক পথেই এগোচ্ছি।"

ওর চোখের দৃষ্টি দেখে চমকে উঠলাম। আমার মাথায় অবশ্য তখন অন্য সব চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। যেমন, এই লোকটা 'ব্যক্তিগতভাবে' শব্দটা এত বেশি বলে কেন?

"আচ্ছা, যাইহোক, আপনি কি আন্দাজ করবেন সেটা নিতান্তই আপনার ব্যাপার। তবে আমাকে দয়া করে পুরো বিষয়টা খুলে বলুন। যেভাবে আপনি ভাবছেন আরকি। এরপর কি হলো? জানালার নিচে ঘাপটি মেরেছিলাম, তারপর? জানালা গলে ভেতরে ঢুকে হিদাকাকে আঘাত করি?"

"করেছিলেন নাকি?" সোজাসুজি আমার দিকে চেয়ে বলল ডিটেক্টিভ কাগা।

"আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আমি।"

একবার মাথা ঝাঁকালো কাগা। "অপরাধটা যে করেছে, একমাত্র সে-ই জানবে উত্তরটা।"

"কী? আপনি কি আমাকে দোষ স্বীকার করে নেয়ার কথা বলছেন? খুশিমনেই করতাম, কিন্তু হয়েছে কী, আমি খুনটা করিনি। আপনার পরিকল্পনায় পানি ঢেলে দেয়ার জন্যে দুঃখিত। ফোন কলটার বিষয়েই নাহয় কথা বলি আমরা? আপনার মতে ও খুন হওয়ার পরে আমার ফোনটা বেজেছিল। আচ্ছা, ধরলাম আপনার কথাই সত্য। এবারে আমাকে বলুন, হিদাকা ফোন না দিলে কার সাথে কথা বলি আমি? টিভিতে কিন্তু ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে আমার বক্তব্য। অন্য কেউ যদি ফোন করেই থাকতো, এতক্ষণে আপনাদের জানাতো নিশ্চয়ই।" যেন সদ্যই কিছু মাথায় এসেছে এমন ভঙ্গিতে আঙুল তুলি আমি। "নাকি আপনার ধারণা, এই ষড়যন্ত্রে কোন সঙ্গী আছে আমার! যে ইচ্ছে করে আমাকে ওই সময়ে ফোন দেয়।"

জবাব না দিয়ে চারপাশে চোখ বুলায় কাগা। ডাইনিং রুমের টেবিলে রাখা কর্ডলেস ফোনটা দৃষ্টিগোচর হয় তার। উঠে গিয়ে সেটা নিয়ে এসে আবারো সোফায় বসে।

"কোন সঙ্গীর দরকার ছিল না আপনার। এই ফোনটা বাজলেই হতো।"

"কিন্তু কেউ ফোন না দিলে রিং বাজবে কী করে?" বলেই একবার তালি বাজালাম। "আচ্ছা! আপনার মাথায় কী ঘুরছে বুঝতে পারছি। আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন পকেটে আরেকটা মোবাইল ফোন ছিল আমার। ওশিমা একটু অন্যমনস্ক হলে সেটা থেকেই আমার বাসার নম্বরে ফোন করি। তাই তো?"

"চাইলে এভাবেও করা যায় কাজটা।"

"কিন্তু সেটা অসম্ভব। আমার কোন মোবাইল ফোন নেই। আমার পরিচিত এমন কেউও নেই, যার কাছ থেকে ধার নেব একদিনের জন্যে।

তাছাড়া আপনারা চাইলে ফোন রেকর্ড খতিয়ে দেখতে পারেন। টেলিফোন কোম্পানির ওরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে আমি নিজের নম্বরে ফোন করেছিলাম কি না।"

"আসলে রিভার্স ট্রেস করে কোন নম্বর থেকে ফোন এসেছিল সেটা বের করা বেশ কঠিন।"

"রিভার্স ট্রেস বলে তাহলে এটাকে?"

"যাইহোক, সেটার দরকার নেই। সচরাচর যাকে ফোন করা হয়, সে-ই বলে দিতে পারে কে ফোন করেছিল। এইক্ষেত্রে আমাদের কেবল দেখতে হতো যে মি. হিদাকা সেদিন ফোনটা করেছিলেন কি না।"

"দেখেছেন?"

"হ্যাঁ," বলে মাথা নাড়ে কাগা।

"জবাবটা জানাই আছে আমার, তবুও জিজ্ঞেস করছি। কী দেখলেন?"

"তার বাসা থেকে আপনার অ্যাপার্টমেন্টে ছ'টা তেরোয় একটা ফোন করা হয়েছিল।"

"এমনটাই তো হবার কথা। কারণ ও ফোন করেছিল, আর আমরা কথাও বলি," কণ্ঠে যথাসম্ভব আত্মবিশ্বাস ফুটিয়ে বলার চেষ্টা করি। তবে সত্যি বলতে, ভেতরে ভেতরে আশঙ্কা চেপে বসছে মনে। ফোন কোম্পানির রেকর্ড ঘেটেও যদি কাগা সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে আমার চালটা প্রায় ধরে ফেলেছে সে।

উঠে দাঁড়িয়ে ফোনটা জায়গামত রাখলো কাগা। তবে এবারে আর সোফায় ফিরলো না। "লেখা শেষ করে পান্ডুলিপিটা সম্পাদকের কাছে ফ্যাক্স করার কথা ছিল হিদাকার কিন্তু তার অফিসে কোন ফ্যাক্স মেশিন নেই। কেন নেই, সেটা নিশ্চয়ই জানা আছে আপনার।"

প্রায় বলেই ফেলেছিলাম যে জানি না, কিন্তু সামলালাম নিজেকে।

"কারণ সেটা তো চাইলে সরাসরি তার কম্পিউটার থেকেই পাঠানো যেত, তাই না?" কাগা জিজ্ঞেস করলো।

"সেটাও করা যায় শুনেছি।"

"যাদের এখনও ফ্যাক্স করতে হয়, তাদের জন্যে এটা দারুণ একটা

সুবিধা, হাতের কাছে কোন কাগজ রাখতে হয় না। তাছাড়া কানাডায় চলে গেলে সেখান থেকে নিশ্চয়ই ইমেইলের মাধ্যমেই লেখা জমা দিতেন হিদাকা। সম্পাদকের সাথে এই বিষয়ে আগেই কথাবার্তা বলে রেখেছিলেন তিনি।"

"এই ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। কম্পিউটার খুব একটা ব্যবহার করিনি। শুধু এটুকু মনে আছে, হিদাকা একবার কম্পিউটার থেকে সরাসরি ফ্যাক্স করার কথা উল্লেখ করেছিল।"

"ব্যাপারটা কঠিন কিছু না, যে কেউ চাইলে করতে পারে। সফটওয়্যারটার দারুণ কিছু ফিচারও আছে। দরকার পড়লে একসাথে কয়েকটা নম্বরে ফ্যাক্স করা যায়। দরকারি নম্বরগুলোর তালিকা সেইভ করে রাখতে পারবে ইউজার। এছাড়া–" থেমে আমার দিকে তাকালো কাগা। "সময় ঠিক করে দিলে, স্বয়ংক্রিয়ভাবেও ফ্যাক্স পাঠানো যায়।"

নিচের দিক থেকে চোখ ওঠালাম না। "আপনার ধারণা আমি সেটাই করেছি?"

প্রশ্নের জবাব দিলো না কাগা। দেয়ার দরকারও নেই আসলে।

"লাইটের ব্যাপারটা প্রথম থেকেই খোঁচাচ্ছিল আমাকে," বলল কাগা। "আপনার ভাষ্যমতে, হিদাকাদের ওখানে পৌঁছে দেখেন সব লাইট বন্ধ। খুনি নিশ্চয়ই সবাইকে বোঝাতে চাইছিল, হিদাকারা কেউ বাসায় নেই। তবে কম্পিউটারটা কেন বন্ধ করেনি, এটা বুঝতে পারেননি আপনি, তাই তো? আমি বোধহয় এখন কারণটা জানি। ফ্যাক্সের কৌশলটা কাজে লাগানোর জন্যে ওটা চালু রাখতেই হতো। হিদাকাকে হত্যার পর নিজের জন্যে যে করেই হোক একটা অ্যালিবাই তৈরি করা দরকার ছিল আপনার, নয়তো ফেঁসে যেতেন। সেজন্যেই, কম্পিউটার খুলে কিছু ডকুমেন্ট আপনার কাছে ঠিক সন্ধ্যা ৬:১৩-এর সময় ফ্যাক্স করার ব্যবস্থা করে ফেলেন। এরপর বাড়ির সব লাইট বন্ধ করে দেন, এই ধাপটাও জরুরি ছিল আপনার গল্পের জন্যে। কারণ আটটার সময় হিদাকাদের বাড়ির সামনে থেকে ঘুরে গিয়ে হোটেলে ফোন করে 'কেউ বাসায় নেই' বলার জন্যে বাতি নেভানো থাকাটাই দরকার ছিল। শুধু ওই একটা ঘরেও যদি বাতি জ্বালানো থাকতো, তাহলে

ঘুরে গিয়ে ওখানে উঁকি দেয়াটাই স্বাভাবিক ছিল যে কারো জন্যে। কিন্তু আপনি বিশেষ করে চাইছিলেন যাতে মৃতদেহটা আবিষ্কারের সময় রাই হিদাকা আপনার সাথেই থাকে।"

এটুকু বলে চুপ করলো কাগা। বোধহয় আমার কাছে কোন অজুহাত আশা করছে আবারো। মুখ বন্ধই রাখলাম আমি।

"আমার ধারণা কম্পিউটার মনিটরটা বন্ধ করবেন কি না, এই বিষয়ে বেশ ভাবনা-চিন্তা করেছেন আপনি," কিছুক্ষণ পর বলল কাগা। "যেমনটা আগেও বলেছি, মনিটরটা চালু থাকলে বেশ ভালো আলো ছড়ায় চারপাশে। কিন্তু যে করেই হোক পিসিটা চালু রাখতে হতো। আপনি চাইলে কেবল মনিটরটা বন্ধ করে রাখতে পারতেন কিন্তু সেটা বিপজ্জনক হতে পারত আপনার জন্যে। মৃতদেহটা খুঁজে পাওয়ার সময় রাই আপনার সাথেই ছিল। সে যদি টের পেয়ে যেত পিসি চলছে কিন্তু মনিটরটা বন্ধ, তাহলে তখনই হয়তো পুলিশের সন্দেহের আওতায় চলে আসতেন আপনি।"

ঢোক গেলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার মুখের ভেতরটা পুরোপুরি শুকনো। বুঝতে পারছি এই মুহূর্তে কাগার চোখে চোখ রাখা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমার দূর্বল অজুহাতগুলো ধোপেই টেকেনি ওর সামনে। ঠিক আমার মাথায় যে আশঙ্কাগুলো ঘুরছিল, সেসব নিয়েই কথা বলছে এখন।

"হিদাকাদের ওখান থেকে খুব সম্ভবত সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে যান আপনি। অ্যাপার্টমেন্টে ফেরার পথে দোজিশা পাবলিশিংয়ের মি. ওশিমাকে ফোন দিয়ে বলেন যেন পান্ডুলিপিটা তখনই নিয়ে যায় সে। মি. ওশিমা ভেবেছিল আপনি বোধহয় পান্ডুলিপিটা ফ্যাক্স করবেন। তাই আপনি দেখা করে নেয়ার কথা বললে কিছুটা অবাক হন ভদ্রলোক। আপনার ভাগ্য ভালো, ওনার অফিস থেকে আপনার অ্যাপার্টমেন্টে ট্রেনে করে আসতে ত্রিশ মিনিটের বেশি লাগে না। আমি খেয়াল করেছি, আপনার লিখিত বক্তব্যে এই বিষয়গুলোর কোন উল্লেখ নেই। বরং আপনি এমনভাবে কথাগুলো বলেছেন যেন মি. ওশিমার আগে থেকেই আসার কথা ছিল।"

এই কথাটাও ভুল বলেনি কাগা। কিন্তু এবারেও মুখ না খুলে আরেকটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম আমি।

"মি. ওশিমাকে কেন নিজের বাসায় ডেকে পাঠিয়েছেন, সেটা ব্যাখ্যা করার দরকার নেই বোধহয়। আপনি চাইছিলেন নিজের অ্যালিবাইটা পোক্ত করতে। হিদাকার কম্পিউটার থেকে আপনার বাসায় ফোনটা আসে ঠিক ছ'টা তের মিনিটে। ঠিক যেমনটা চাইছিলেন আপনি। ব্যস, রিসিভার তুলে একদম পাকা অভিনেতাদের মতন অভিনয় করতে শুরু করে দেন। হিদাকার ফ্যাক্স প্রোগ্রামটা আপনার ফোনের সাথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা চালাচ্ছিল তখন। কিন্তু আপনি এমন আচরণ করেন, যেন ওপাশ থেকে কেউ কথা বলছে। অভিনয় শেষে রিসিভার নামিয়ে রাখেন। হিদাকার কম্পিউটারে এটা একটা ডায়ালিং এরর হিসেবে নথিভুক্ত হয়, কল কেটে যায়। মি. ওশিমা ঘুনাক্ষরেও কিছু সন্দেহ করতে পারেন না। এরপর আর খুব বেশি কাজ বাদ থাকে না আপনার। রাই হিদাকাকে পাশে নিয়ে মৃতদেহটা আবিষ্কার করতে হবে, এটুকুই। আর পুলিশ আসার আগে, তার বেখেয়ালে কম্পিউটারট থেকে কলের রেকর্ড মুছে ফেলতে হবে।"

খেয়াল করলাম কথা বলার মধ্যে একটা পর্যায়ে কিছুক্ষণ পরপর মাথা নিচু করা থামিয়ে দিয়েছে কাগা। স্কুলে নতুন শিক্ষক হিসেবে যোগ দেয়ায় সিনিয়রদের সাথে ওভাবে কথা বলতে বলতে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল ওর। অবশ্য কাগার আচরণের এই পরিবর্তনে বিরক্ত হলাম না। আমাদের এখনকার সম্পর্কের প্রেক্ষিতে এমনটাই বরং স্বাভাবিক।

"কৌশলটার তারিফ করতেই হয়। পুরো পরিকল্পনা করতে খুব বেশি সময়ও নিশ্চয়ই পাননি আপনি। তবে একটা ভুল করে ফেলেছেন।"

মনে হচ্ছে ভুলটার কথা সে নিজেই বলবে।

"হিদাকাদের বাসার আসল ফোনটার কথা মাথায় ছিল না আপনার। মি. হিদাকা যদি আসলেই আপনাকে ফোন করতো তাহলে রিডায়াল বাটনে চাপ দিলেই হয়ে যেত কিন্তু।"

ভেতরে ভেতরে গুমরে উঠলাম।

"কিন্তু সেরকম কিছু হয়নি। বরং রিডায়ালে চাপ দেয়ার পর ভ্যাঙ্কুভারে একটা নম্বরে ফোন চলে যায়। মিসেস হিদাকা আমাদের জানিয়েছেন, সেদিন ভোর ছ'টার দিকে কানাডার একটা নম্বরে ফোন করেন মি. হিদাকা। অবশ্য

এমনটাও ধরে নেয়া যায় আপনার অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করার পরেও কানাডার নম্বরটায় ফোন করেন তিনি। কিন্তু রিং বাজার আগেই কেটে দেন। কিন্তু কানাডা আর জাপানের সময়ের পার্থক্য বিবেচনায় নিলে সেটা আর বাস্তবসম্মত মনে হয় না। যে ব্যক্তি ফোন করার জন্যে ভোরে উঠতে পারেন, তার এরকম ভুল করার কথা নয়। কারণ কানাডায় তখন মধ্যরাত।"

কথা থামিয়ে আমার দিকে তাকালো কাগা। "এটুকুই বলার ছিল।"

কয়েক মুহূর্ত কোন কথা হলো না আমাদের মধ্যে। আমার চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কাগাকে। আমার মাথা একদম ফাঁকা এখন।

"কিছু বলার নেই আপনার?" একটু অবাকই মনে হলো ওকে।

অবশেষে মাথা তুললাম। চোখাচোখি হলো আমাদের। ওর অভিব্যক্তি একদম শান্ত, কোন প্রকার উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। ডিটেক্টিভরা সন্দেহভাজনদের সাথে সচরাচর এভাবে কথা বলে না। কেন জানি না, ব্যাপারটা বেশ স্বস্তিদায়ক ঠেকল আমার কাছে।

"পান্ডুলিপিটার ব্যাপারে তো কিছু বললেন না," আমি বললাম। "তুষার দ্বার উপন্যাসের যে পর্বটা হিদাকার কম্পিউটারে ছিল, সেটা? ধরে নিলাম আপনার থিওরিটা নির্ভুল, সেক্ষেত্রে ওটা কখন লেখা হলো?"

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সিলিংয়ের দিকে তাকালো কাগা। আমার মনে হচ্ছে ও জানে, কী বলতে হবে, কিভাবে বলবে সেটা ভাবছে।

অবশেষে মুখ খুলল কাগা। "দুটো সম্ভাবনার কথা মাথায় আসছে এই মুহূর্তে। প্রথমটা হচ্ছে, মি. হিদাকা ওটুকু লিখেই রেখেছিলেন, বিষয়টা খেয়াল করার পর আপনি ওটাকে নিজের পরিকল্পনার অংশ করে নেন।"

"আরেকটা সম্ভাবনা?"

"অন্যটা হচ্ছে–" আবারো আমার চোখের দিকে তাকালো ও। "–আপনি নিজেই ওটুকু লিখেছেন। হয়তো কোন ডিস্কে করে লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন, নিজের অ্যালিবাই তৈরি করার জন্যে। এরপর দ্রুত কপি করে ফেলেছেন হিদাকার কম্পিউটারে।"

"আপনার বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়!" কিছুটা শ্লেষাত্মক সুরে কথাটা

বলার চেষ্টা করলাম কিন্তু লাভ হলো না। চেহারা যেন একদম জমে গেছে আমার।

"মাসিক সোমেই পত্রিকার মি. ইয়ামাবেকে পান্ডুলিপির ফাইলটা দেখিয়েছি আমি। তিনি মোটামুটি নিশ্চিত, ওটা হিদাকা লেখেননি। শব্দগুলো অন্যরকম তো বটেই, যতিচিহ্নের ব্যবহারেও গড়মিল খেয়াল করেছেন ভদ্রলোক।"

"তাই...ইয়ে, আপনি..." কথা জড়িয়ে এলো আমার। কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলাম। "আপনি ধরেই নিয়েছেন ওকে হত্যা করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পান্ডুলিপিটুকু লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম আমি।"

"না, এরকমটা ভাবছি না আমি। এটা যদি আগে থেকেই আপনার পরিকল্পনার অংশ হতো, তাহলে আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন হিদাকার মত করে লেখার। ওনার সম্পাদকের মতে সেটা এমন কঠিন কিছু হতো না, বিশেষ করে যেহেতু উপন্যাসটার বেশ খানিকটা অংশ আগেই প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকায়। তাছাড়া, একটা পেপারওয়েট দিয়ে হত্যা করা হয়েছে হিদাকাকে আর মি. ওশিমাকে একদম শেষ মুহূর্তে ডেকে পাঠানো হয়েছে আপনার অ্যালিবাইয়ের অংশ হবার জন্যে। আমার ধারণা খুনটা পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না।"

"তাহলে পান্ডুলিপিটা আগেই তৈরি করা হল কেন?"

"এটাই তো মূল প্রশ্ন, তাই না? 'তুষার দ্বার' উপন্যাসটার পরবর্তি অধ্যায় আপনার কাছে কেন? আর সেটা জিজ্ঞেস করার আগে আপনাকে জিজ্ঞেস করা উচিত যে আপনিই বা ওটা লিখতে গেলেন কেন। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভীষণ কৌতূহলী। এই প্রশ্নের উত্তরেই হয়তো মি. হিদাকাকে হত্যার মোটিভটা লুকিয়ে আছে।"

চোখ বুজলাম যেন আতঙ্কটুকু গোপন করতে পারি। "পুরোটাই আপনার কল্পনা। কোন প্রমাণ নেই আপনার কাছে।"

"ঠিক। সেজন্যেই আজ আমি এসেছি আপনার অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি চালাতে। আমি নিশ্চিত, আপনি এতক্ষণে বুঝে গেছেন কী খুঁজছি আমি।"

জবাব দিলাম না।

"আমি একটা ডিস্ক খুঁজছি যেটায় পান্ডুলিপিটা আছে। অথবা আপনার ওই ওয়ার্ড প্রসেসরটার হার্ড ড্রাইভে হয়তো ওটা খুঁজে পাব আমি। হয়তো না...আমি নিশ্চিত, পাব। পান্ডুলিপিটা যদি আপনার পরিকল্পনার অংশ বিশেষ হতো, তাহলে এতক্ষণে সব প্রমাণ লোপাট করে দিতেন। কিন্তু আমার সেটা মনে হয় না। ওটা এখানেই কোথাও আছে।"

চোখ খুলে দেখলাম একদম আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে কাগা। তবে এবারে চোখ নামিয়ে নিলাম না। নিজেকে পুরোপুরি সামলে নেয়ার জন্যে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকাই যথেষ্ট ছিল।

"যা খুঁজছেন, সেটা যদি পেয়ে যান তাহলে আমাকে গ্রেফতার করবেন?"

"জি।"

"আমি যদি এখন আত্মসমর্পণ করি?"

বিস্ময় ভর করলো কাগার চোখের তারায়। একবার মাথা ঝাঁকাল ও। "দুর্ভাগ্যবশত, আত্মসমর্পণের সুযোগ এই মুহূর্তে নেই আপনার। আমি আশা করবো গ্রেফতারের সময় কোন প্রকার বাঁধা দেবেন না।"

"বেশ।" কাঁধজোড়া ঝুঁকে গেল আমার। হতাশ লাগছে তবে স্বস্তিও অনুভব করছি। আর কোন প্রকার অভিনয় করতে হবে না। "আমাকে প্রথম কখন সন্দেহ হলো আপনার?"

"প্রথম রাতে।"

"আসলেই? ভুল কিছু করেছিলাম কি?"

"হ্যাঁ," মাথা নেড়ে সায় দিলো ও। "হিদাকার মৃত্যুর সম্ভাব্য সময় জানতে চেয়েছিলেন।"

"এটা কি অবাক হবার মত কিছু?"

"হ্যাঁ। আপনি যদি আসলেই ছয়টার সময় মি. হিদাকার সাথে কথা বলে থাকেন, তাহলে আপনার জানার কথা যে আটটার মধ্যে মারা গেছেন তিনি। কারণ মিসেস হিদাকাকে সাথে নিয়ে তখনই তার লাশটা খুঁজে পান আপনি। সেক্ষেত্রে কেন আগ বাড়িয়ে জানতে চাইলেন মৃত্যুর সম্ভাব্য সময়?"

"ওহ্।"

"তাছাড়া পরদিন রেস্তোরাঁতেও আমার কাছ একই কথা জানতে চান

আপনি। তখনই বুঝতে পারি, আমার সন্দেহটা অমূলক নয়। আপনি এটা জানতে চাননি যে খুনটা কখন হয়েছে। আপনি জানতে চান পুলিশের ভাষ্যমতে খুনটা কখন হয়েছে।"

ভুল বলেনি কাগা। আমি বোঝার চেষ্টা করছিলাম, পরিকল্পনাটা কাজে লেগেছে কি না।

"বাহ, চমৎকার। আপনি যে দারুণ একজন গোয়েন্দা, সেই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।"

"ধন্যবাদ," নাটুকে ভঙ্গিতে বাউ করে বলল কাগা। "আপনি এখান থেকে বের হবার প্রস্তুতি নেয়া শুরু করতে পারেন। অবশ্য আপনাকে চোখে চোখে রাখতে হবে আমার। অনেক কেসেই দেখা গিয়েছে, সন্দেহভাজনরা একাকী থাকলে তার পরিণতি বিশেষ সুখকর হয় না।"

"চিন্তা করবেন না, আমার পক্ষে আত্মহত্যা করা সম্ভব নয়," হেসে উঠে বললাম। কথাটা আপনা আপনিই বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে, আমি নিজেও অবাক হলাম একটু।

"না হলেই ভালো," পাল্টা হেসে বলল কাগা।

অধ্যায় ৪

অনুসন্ধান
কিয়োইচিরো কাগা'র দিনলিপি

ওসামু নোনোগুচিকে গ্রেফতার করেছি চার দিন হতে চলল। নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিলেও খুনের মোটিভ নিয়ে কিছু বলেনি এখনও। মুখে কুলুপ এঁটে আছে। ছোটবেলার বন্ধু, যার কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য পেত, তাকে কেন খুন করলো সে? চিফ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, মোটিভ জানা ব্যাতীত আসামীকে আদালতে হাজিরই করা যাবে না। নিজের বক্তব্য বদলে ফেলতে পারে নোনোগুচি, তার আইনজীবিও হাজারটা ফোকর খুঁজে বের করে সন্দেহের উদ্রেক ঘটাতে পারে সবার মনে। আদালতে তখন অনর্থক অপদস্থ হতে হবে আমাদের।

তবুও বারবার প্রশ্ন করা সত্ত্বেও তার একটাই উত্তর–"হুট করে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। ক্ষণিকের উত্তেজনায় কাজটা করে ফেলি, ব্যস।"

মাটিভ হিসেবে এটুকু কোনমতেই গ্রাহ্য হবে না কোথাও। তবে, আসল মোটিভ কি হতে পারে, সেটা খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি। সেক্ষেত্রে প্রথম সূত্র ছিল 'তুষার দ্বার' বইটা।

এখানে আমার বলে রাখা উচিত মি. নোনোগুচির ওয়ার্ড প্রসেসরের হার্ড ড্রাইভে আমরা পান্ডুলিপিটা খুঁজে পাই, যেমনটা আমি ধারণা করেছিলাম পাব। তাছাড়া সেদিন হিদাকাদের বাসায় সে যে ডিস্কে করে নতুন অধ্যায়টা নিয়ে গিয়েছিল, সেটাও পাওয়া যায় ডেস্কের ড্রয়ারে। কুনিহিকো হিদাকার কম্পিউটারের লেখার সাথে পুরোপুরি মিলে গেছে ওটুকু।

তবুও আমার বিশ্বাস হয় না, এই খুনটা পূর্বপরিকল্পিত। অফিসের বাকি সবাই আমার সাথে এই ব্যাপারে মোটামুটি একমত। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে একটা

প্রশ্ন থেকেই যায়। মি. নোনোগুচি পকেটে করে 'তুষার দ্বার' উপন্যাসের পরবর্তি অধ্যায়টা নিয়ে গেছিল কেন। হিদাকার উপন্যাসের পান্ডুলিপি তার কাছে গেলই বা কী করে?

অবশ্য তাকে গ্রেফতার করার আগেই এই প্রশ্নটার একটা সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করে রেখেছিলাম। আমি মোটামুটি নিশ্চিত, এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেলে খুনের মোটিভটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

মি. নোনোগুচি সব স্বীকার করে নিলেই ল্যাঠা চুকে যেত কিন্তু সে যেন পণ করেছে আমাদের কোন প্রকার সহযোগিতা না করার। তুষার দ্বারের পান্ডুলিপিটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে বলে যে, "খেয়ালের বশে লিখে ফেলেছিলাম। ইচ্ছে ছিল ওকে চমকে দেয়ার। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি লেখা শেষ করতে না পারে তাহলে আমারটাই ছাপিয়ে দিতে পারে চাইলে। কিন্তু ও ব্যাপারটা কৌতুক হিসেবেই নেয়, যেমনটা আমি চেয়েছিলাম।"

আমার বোধহয় আলাদা করে বলে দেয়ার দরকার নেই যে নোনোগুচির কথা কতটা অযৌক্তিক শোনাচ্ছে। কিন্তু চেপে ধরলেই বলছিল যে বিশ্বাস-অবিশ্বাস আমাদের ব্যাপার।

আমার লোকজন আবারো তল্লাশি চালাত মি. নোনোগুচির অ্যাপার্টমেন্টে। প্রথমবার কেবল তার ডেস্ক আর ওয়ার্ড প্রসেসিং ইউনিটের হার্ড ড্রাইভটা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল।

দ্বিতীয়বারের তল্লাশিতে আমরা আঠারোটার মতন আলামত সংগ্রহ করি। এর মধ্যে আটটা স্পাইরাল বাইন্ডিং করা পুরু নোটবুক, আটটা ডাবল ডেনসিটি ফ্লপি ডিস্ক আর দুটো ফাইল ফোল্ডার, যার ভেতরে হাতে লেখা পান্ডুলিপি রাখা ছিল। আমরা নিশ্চিত হই যে স্পাইরাল বাইন্ডিং করা নোটবুকগুলোর হাতের লেখা এবং পান্ডুলিপিগুলোর হাতের লেখা মি. নোনোগুচির। এগুলো সবই বিভিন্ন ঘরানার ছোট গল্প এবং উপন্যাস।

লেখাগুলো দেখে চমকাতে বাধ্য হবে যে কেউ। একটা ফ্লপিতে তো 'তুষার দ্বার' উপন্যাসটার গোটা পান্ডুলিপি খুঁজে পাই আমরা। অবশ্য এটা যে পাওয়া যাবে তা আমার থিওরি অনুযায়ী অনুমিতই ছিল। পান্ডুলিপিগুলো মাসিক সোমেইয়ের সম্পাদক মি. ইয়ামাবেকে দেখাই আমি। তিনি বলেন :

"এটা যে 'তুষার দ্বার' উপন্যাসটার পান্ডুলিপি সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে গল্পটা হুবহু একই হলেও মি. হিদাকার কাছ থেকে আমি যে পান্ডুলিপি পেতাম সেটায় কিছুটা এদিক সেদিক আছে। কিছু জিনিস যোগ করা হয়েছে, আবার কিছু বাদ পড়েছে। তাছাড়া বাক্য আর শব্দের ব্যবহারও ভিন্ন।"

অর্থাৎ, নোনোগুচি তার অ্যালিবাই হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে যে পান্ডুলিপিটা নিয়ে গিয়েছিল, সেটার সাথে প্রসেসরের হার্ড ড্রাইভে পাওয়া পান্ডুলিপিটার লেখার ধরণ মিলে গেছে|

তদন্ত দলটা কুনিহিকো হিদাকার প্রকাশিত সমস্ত কাজ সংগ্রহ করে এবং পড়ে ফেলে। (দলের মধ্যে বেশ কয়েকজন অবশ্য বলে যে দীর্ঘ সময় ধরে কিছু না পড়ায় বই পড়ার অভ্যাস চলে গেছিল তাদের। কিন্তু আরো অনুযোগ কানে তুলিনি আমরা)।

আমরা আবিষ্কার করি, ওসামু নোনোগুচির অ্যাপার্টমেন্টে প্রাপ্ত হাতে লেখা পাঁচটা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের সাথে কুনিহিকো হিদাকার প্রকাশিত উপন্যাসের মিল আছে। অধ্যায়ের শিরোনাম, চরিত্রের নাম, ঘটনার এলাকা–এসবে পার্থক্য থাকলেও মূল গল্পটা একই।

ফ্লপি ডিস্কে আরো তিনটা উপন্যাস আর বিশটার মত ছোটগল্পের সন্ধান মেলে। এর মধ্যে সবগুলো উপন্যস আর সতেরোটা ছোটগল্পের সাথে মি. হিদাকার প্রকাশিত কাজের মিল রয়েছে। যে তিনটা ছোট গল্পের সাথে মিল পাওয়া যায়নি, সেই তিনটা ছোটগল্প বাচ্চাদের গল্প হিসেবে মি. নোনোগুচির নামে প্রকাশিত হয়েছে।

দুটো হাতে লেখা ছোটগল্পের সাথে মি. হিদাকার কোন কাজের মিল পাওয়া যায়নি। হলদে হয়ে আসা কাগজ দেখে অবশ্য বোঝাই যাচ্ছিল এগুলো অনেক আগের লেখা। আরো বিস্তারিত তদন্ত করলে হয়তো কিছু জানা যেতে পারে।

কারো বাসা থেকে ভিন্ন একজন লেখকের প্রকাশিত এতগুলো কাজের পান্ডুলিপি পাওয়ার বিষয়টা কিন্তু আসলেই বড্ড অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার। তার উপরে, হাতে লেখা পান্ডুলিপি আর প্রকাশিত কাজগুলোর মধ্যে

ছোটখাটো কিছু পার্থক্যও আছে। স্পাইরাল বাইন্ডিং করা নোটবুকে লেখা উপন্যাসগুলোতে মার্জিনে বিভিন্ন মন্তব্য আর কাটাছেঁড়া চোখে পড়েছে। দেখে মনে হচ্ছিল কাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি।

আমার থিওরি মতে, ওসামু নোনোগুচি কুনিহিকো হিদাকার গোস্ট রাইটার হিসেবে কাজ করতো। কিন্তু তাদের এই বোঝাপড়ার মধ্যে কোন একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়, যে কারণে খুন হন মি. হিদাকা।

জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে আমি আমার থিওরিটা মি. নোনোগুচিকে খুলে বলি।

কিন্তু মাথা ঝাঁকিয়ে আমাকে স্রেফ মানা করে দেয় সে। "আপনার ধারণা ভুল।"

স্পাইরাল নোটবুক আর ফ্লপি ডিস্কের গল্পগুলোর ব্যাপারে জানতে চাইলে আবারো কুলুপ আটে মুখে। জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে আমার সাথে যে সহকারী অফিসার ছিল, সে-ও চেষ্টা করে তার মুখ খোলানোর, কিন্তু লাভ হয়নি।

দিনের পর দিন, ঘন্টার পর ঘন্টা একইভাবে প্রশ্ন করে গিয়েও আর বেশি কিছু জানতে পারিনি আমরা। কিন্তু আজকে জিজ্ঞাসাবাদের মাঝামাঝি অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটে।

হঠাৎই পেটে হাত রেখে মি. নোনোগুচি জানায় যে ভীষণ ব্যথা করছে তার। ব্যথার আকস্মিকতা এবং তীব্রতা দেখে আমার সন্দেহ হয়, কোন একভাবে হয়তো বিষ জোগাড় করেছে সে।

সাথে সাথে পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করা হয় তাকে। কিছুক্ষণ পরে চিফ নিজে ফোন করে আমাকে বিস্ময়কর তথ্যটা জানায়। ওসামু নোনোগুচি ক্যান্সারে ভুগছে।

***

জিজ্ঞাসাবাস কক্ষে পড়ে যাওয়ার পরদিন তার সাথে হাসপাতালে দেখা করতে যাই আমি। প্রথমে অবশ্য কর্তব্যরত ডাক্তারের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলি।

তার বক্তব্য অনুযায়ী, নোনোগুচির আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোতে ক্যান্সার

ছড়িয়ে পড়েছে। অবস্থা বেশ নাজুক। তাকে বাঁচাতে চাইলে যত দ্রুত সম্ভব সার্জারি করতে হবে।

ক্যান্সারের বিষয়টা নতুন নাকি আগে থেকেই এই অসুখে ভুগছে নোনোগুচি, এই কথা জানতে চাইলে ডাক্তার বলেন, খুব সম্ভবত ক্যান্সার ফিরে এসেছে নোনোগুচির শরীরে।

কথাটা শুনে অবাক হইনি কারণ তদন্ত করতে গিয়ে আমরা জানতে পারি, বছর দুয়েক আগে ক্যান্সারের কারণে পাকস্থলির কিছুটা অংশ কেটে বাদ দিতে হয়েছে নোনোগুচির। যার কারণে বেশ লম্বা একটা সময় স্কুল থেকে ছুটিতে কাটাতে হয় তাকে।

এরপর আর হাসপাতালমুখী হয়নি নোনোগুচি। যদিও ডাক্তারের ধারণা বেশ কয়েকদিন ধরেই সে বুঝতে পারছিল, ক্যান্সার ফিরে এসেছে তার শরীরে।

এরপর ডাক্তারের কাছে আমি জানতে চাই, সার্জারি করলে নোনোগুচির জীবন বাঁচবে কি না। প্রশ্নটা শুনে কিছুক্ষণ ভাবেন ডাক্তার। এরপর বলেন "ফিফটি-ফিফটি চান্স।"

আর যা-ই হোক, এই উত্তরটা শুনতে চাইনি আমি।

ডাক্তারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওসামু নোনোগুচির সাথে দেখা করতে যাই আমি।

একটা প্রাইভেট রুমে রাখা হয়েছে তাকে। "জেলের ভাত খাওয়ানোর বদলে আমাকে এরকম আরাম আয়েশে রেখেছেন আপনারা, ভাবতেই খারাপ লাগছে," দূর্বল হেসে বিছানায় শুয়ে থেকে বলে নোনোগুচি। আমি বুঝতে পারি যে তার এরকম বুড়িয়ে যাওয়ার কারণ শুধু বয়স বাড়াই নয়।

"কেমন লাগছে এখন আপনার?"

"ভালো না। কিন্তু আমার যা হয়েছে, সেই তুলনায় ভালোই আছি বলতে হবে।"

চুপচাপ তার বিছানার পাশে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। বেশ খানিকক্ষণ পর আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, "বিচার শুরু হবে কবে? খুব বেশি সময় লাগলে আমাকে না-ও পেতে পারেন কিন্তু।"

নোনোগুচি কৌতুক করছে কি না সেটা বুঝতে পারছি না। কিন্তু নিজের আসন্ন মৃত্যুর বিষয়টা যে সে মেনে নিয়েছে তা পরিস্কার।

"বিচার শুরু হতে সময় লাগবে। আমাদের হাতে এখনও পর্যাপ্ত সূত্রাদি নেই।"

"নেই মানে? আমি তো দোষ স্বীকার করে নিয়েছি। প্রমাণও খুঁজে পেয়েছেন আপনারা। বিচারে আমাকে দোষী বলেই রায় দেয়া হবে। এটাই কি যথেষ্ট না? আমি আমার বক্তব্য বদলাবো না, কথা দিচ্ছি।"

"আসলে, আমি চাই আপনি বক্তব্যটা বদলান। এই মুহূর্তে খুনের মোটিভটা স্পষ্ট না।"

"আবারো সেই কথা?"

"আপনি যদি একবার আমাকে বলে দেন তাহলেই আর জিজ্ঞেস করবো না।"

"যেমনটা আপনাকে আগেও বলেছি, মোটিভ বলতে আসলে ওরকম কিছু নেই। মাথা গরম করে কাজটা করে ফেলেছি। এর পেছনে কোন কারণ বা যুক্তি খোঁজাটা অনর্থক সময় নষ্ট বৈ কিছু নয়।"

"কোন কারণ ছাড়া মাথা গরম হয় না কারো।"

"কারণ যেটাই হোক না কেন, সেটা জরুরি নয়। সত্যি বলতে আমি নিজেও মনে করতে পারছি না, সেদিন কেন ওরকম রেগে গিয়েছিলাম। এজন্যেই বোধহয় এটাকে 'হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলা' বলে। আমি চাইলেও আপনাকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলতে পারবো না।"

"আপনার কি আসলেই ধারণা যে আমি এই জবাবটা মেনে নেব?"

"এছাড়া আপনার কাছে আর কোন উপায় আছে বলে মনে হয় না।"

আবারো চোখাচোখি হলো আমাদের। তার দৃষ্টিতে আত্মবিশ্বাসের কোন কমতি নেই।

"আপনার অ্যাপার্টমেন্টে খুঁজে পাওয়া পান্ডুলিপিগুলোর ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।"

চেহারায় হতাশা ভর করলো তার। "ওসবের সাথে আপনার কেসের কোন সম্পর্ক নেই। এভাবে সবকিছু একসাথে জোড়া দেওয়ার কোন দরকার দেখছি না আসলেই।"

"তাহলে আমাকে সত্যটা খুলে বলুন। সবকিছু ঠিকমতো সাজাতে সাহায্য করুন। ওগুলো আসলে কি? কেন লেখা হয়েছিল?"

"কিছু না। শুধু খাতা আর ডিস্ক।"

"যে খাতা আর ডিস্কে অন্য একজন লেখকের লেখা আছে। ঠিকমত বললে, যে নোটবুক আর ডিস্কের লেখার সাথে কুনিহিকো হিদাকার প্রকাশিত উপন্যাসগুলো প্রায় হুবহু মিলে যায়।"

নাক দিয়ে শব্দ করল নোনোগুচি। "আপনার কি ধারনা? আমি একজন গোস্ট রাইটার? তাও আবার ওর? একটু বেশি ভেবে ফেলছেন না?"

"এছাড়া তো যৌক্তিক আর কিছু মাথায় আসছে না।"

"আপনাকে বরং যৌক্তিক জবাবটাই দেই। ওগুলো আসলে আমার হোমওয়ার্ক। যারা লেখক হতে চায় তাদের পরিশ্রম করতে হয, জানেন তো? এটাও অনুশীলনের বিষয়। হিদাকার লেখাগুলো নিজের মতো করে লিখে অনুশীলন করেছি আমি। চেষ্টা করেছি লেখার অলিগলি এবং বাঁকগুলো শিখতে। কিভাবে অনুভূতিগুলোকে ছাপার অক্ষরে নিয়ে আসতে হয় তা শেখার চেষ্টা করেছি। অনেক উঠতি লেখকই এমনটা করে থাকেন।"

আমার আগেই ধারণা হয়েছিল সে এই ধরণের কিছু বলবে। কুনিহিকো হিদাকার সম্পাদকের সাথে যখন কথা বলেছিলাম, তিনিও এই ধারণাই ব্যক্ত করেছিলেন। তবে সম্পাদক সাহেবের মতে, এমন কিছু ঘটলেও তিনটা প্রশ্নের জবাব অজানা রয়ে যায়। প্রথমটা হচ্ছে, আমরা যেসব পান্ডুলিপি খুঁজে পেয়েছি, সেগুলোর লেখা কুনিহিকো হিদাকার লেখার ধাঁচের চেয়ে কিছুটা অন্যরকম। দ্বিতীয়টা হচ্ছে, এমনটা ঘটতেই পারে কেউ হয়তো পুরো উপন্যাস নকল করেছে অনুসরণের জন্য। কিন্তু সেটা যে কেবলমাত্র একজন মাত্র লেখকের এই বিষয়টা একটু সন্দেহজনক। তৃতীয় বিষয়, কুনিহিকো হিদাকা একজন বেস্টসেলিং লেখক, কিন্তু তাই বলে তার লেখা এমন নয় যে সেটা অন্ধ অনুকরণ করতে হবে।

ওসামু নোনোগুচিকে ঠিক এই কথাগুলোই বললাম।

তার অভিব্যক্তিতে কোন পরিবর্তন এলো না। বিন্দুমাত্র না ঘাবড়ে আমাকে বলল, "এর পেছনেও যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। শুরুতে আমি হিদাকার

লেখা হুবহু নকল করতাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এতে আমার বিরক্তি ধরে যায়। একসময় কিছু কিছু জায়গায় বাচণভঙ্গি বদলে দেই। কিছু ঘটনাও আগে পরে করি। বুঝতে পারছেন আমার কথা? হিদাকার লেখাগুলো দিয়ে শুরু করি আমি, এটা ঠিক। কিন্তু সেই সাথে চেষ্টা করতে থাকি নিজের লেখার উন্নতি করার। গোটা অনুশীলনের মূল কারণ এটাই। এরকম দেখে দেখে লেখা উপন্যাসের সংখ্যা এত বেশি কারণ অনেকদিন ধরেই কাজটা করছি আমি। বিয়ে-শাদী করিনি কারো সাথে কোন সম্পর্কও নেই, তাই বাসায় ফিরে অফুরন্ত সময়। আর আপনার শেষ কথাটার প্রেক্ষিতে বলবো–হ্যাঁ, হিদাকার লেখা হয়তো একদম আদর্শ নয়, কিন্তু ওর লেখায় সহজাত এবং ঠাস বুনোট একটা ভাব আছে। যে কেউ পড়ে সহজেই বুঝতে পারবে। ওর লেখা যে এত বেশি সংখ্যক মানুষ পড়ে, সেটাই কিন্তু এর প্রমাণ।"

ওসামু নোনোগুচির ব্যাখা একদম ফেলনা নয়। কিন্তু এখান থেকে আরেকটা প্রশ্নের উদ্রেক ঘটে। যদি এসব সত্যি হয়েই থাকে, তাহলে আগে কেন কিছু বলল না সে? বরং, অ্যাপার্টমেন্টে লেখাগুলো খুঁজে পাওয়ার পর থেকে জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে জ্ঞান হারানো অবধি মুখে কুলুপ এঁটে ছিল। এমনটাও হতে পারে যে হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে নতুন এই ফন্দি এঁটেছে। এটা যদি সত্যি হয়েও থাকে, তাহলে প্রমাণ করা হবে অত্যন্ত কঠিন।

এই পর্যায়ে কৌশল বদলানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। আরেকটা সূত্র হাতে এসেছে আমাদের, এবারে সেটা ব্যবহারের সময়। ওসামু'র ডেস্ক ড্রয়ারে আমরা বেশ কয়েকটা মেমো পেয়েছি। সেখানে একটা গল্পের খসড়া করা হয়েছে। চরিত্রগুলোর নাম থেকে এটা নিশ্চিত যে খসড়াটা 'তুষার দ্বার' উপন্যাসের অপ্রকাশিত অংশের। এখনও লেখা হয়নি ওটুকু।

এটার ব্যাখায় সে বলেছে–"এটাও অনুশীলনের অংশ মাত্র। পাঠকেরাও কিন্তু অনুমানের চেষ্টা করে যে গল্প কোনদিকে এগোচ্ছে। আমি সেটাই লিখে বোঝার চেষ্টা করছিলাম আরকি।"

"কিন্তু আপনি তো শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি লেখায় মনোনিবেশ করেছেন, তাই না? তাহলে এখনো অন্য একজন লেখকের লেখা

অনুকরণ করছেন কেন? চাইলেই তো আপনি নিজের গল্প লিখতে পারেন, ভুল বললাম?"

"বোকার মত কথা বলবেন না। এখনো শেখার অনেক কিছু বাকি আছে আমার। প্রতিষ্ঠিত লেখক হতে হলে পাড়ি দিতে হবে অনেকটা পথ। হাতে যেহেতু সেরকম কোন কাজ ছিল না, প্রচুর সময় পেয়েছি।"

তার এই ব্যাখ্যাও পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারেনি আমাকে।

আমার চেহারা দেখে নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পারে ওসামু। "আমি জানি আপনি আমাকে হিদাকার গোস্টরাইটার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। সেক্ষেত্রে আমি বলবো আমার মেধাকে বেশি মূল্য দিয়ে ফেলছেন। আমার ওরকম প্রতিভা নেই। তাছাড়া আপনার থিওরি সত্য হলে আমি নিজেই ঢোল পেটাতাম 'ওগুলো আমার লেখা উপন্যাস। আমিই আসল লেখক।' আমি উপন্যাসগুলো লিখিনি, বিশ্বাস করুন। লিখলে নিজের নামে প্রকাশ করতাম। ওর নাম কেন ব্যবহার করতে যাব? আপনার মনে কখনো এই প্রশ্নটা আসেনি?"

"এসেছে। এজন্যই গোটা বিষয়টা এত অদ্ভুত লাগছে।"

"অদ্ভুতের কিছু নেই। আপনি আসলে শুরুতেই ভুল একটা অনুমান করে নিয়েছেন। আর সেই কারণেই ঠিকভাবে দেখতে পারছেন না কোন কিছু। একটু বেশিই ভেবে ফেলছেন গোটা ব্যাপারটা নিয়ে।"

"আমার তা মনে হয় না।"

"মনে হলেই ভালো হতো। এই বিষয়ে আমার আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। আদালতের কাজ শুরু করে দেয়া যায় না? মোটিভ দিয়ে কি আসে যায়? আপনারা নিজের মত একটা বিবৃতি লিখে নিন, আমি সেটার নিচে সই করে দিব।"

তার কণ্ঠস্বরেই স্পষ্ট যে এসব নিয়ে তার আসলেই আর কোন প্রকার মাথা ব্যথা নেই।

***

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আমাদের মধ্যকার কথোপকথন নিয়ে লম্বা একটা সময় চিন্তা করলাম। যেভাবেই ব্যাখা দেয়া হোক না কেন, কিছু কিছু বিষয়ে ধোঁয়াশা একদমই কাটছে না। তাছাড়া আমার থিওরিও পুরোপুরি নির্ভুল নয়। কোথাও একটা গলদ থেকেই যাচ্ছে।

সে যদি আসলেই কুনিহিকো হিদাকার গোস্ট রাইটার হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে কারণটা সম্পর্কে জানতেই হবে। তার কি ধারণা ছিল যে মি. হিদাকার নামে প্রকাশিত হলে বইগুলো বেশি চলবে? কিন্তু এমনটা ভাবার তো কোন কারণ নেই। যে বইটা দিয়ে মি. হিদাকা প্রথমে সবার নজর কাড়েন, খুব সম্ভবত সেটাও ওসামু নোনোগুচির লেখা। সুতরাং, সেই সময় তার অন্য কারো নামে বই প্রকাশ করার কোন দরকারই ছিল না। নিজের প্রথম বই হিসেবে প্রকাশ করলে কি সমস্যা হতো?

হয়তো তখনও শিক্ষকতার পেশার সাথে সম্পৃক্ত ছিল বলে নিজের নাম আড়ালে রাখে সে? কিন্তু এই যুক্তিটাও কেমন যেন ঠুনকো শোনাচ্ছে। আমি কখনো শুনিনি যে লেখালেখির সাথে সম্পৃক্ততার কারণে কোন শিক্ষকের চাকরি চলে গেছে। তাহলে আসল কারণট কি? আর তাকে যদি বাধ্য করা হতো দুটো পেশার মধ্যে একটা বেছে নিতে, তাহলে আমি নিশ্চিত লেখকের পেশাই বেছে নিত সে।

তাছাড়া মি. নোনোগুচি হাসপাতালে যেটা বলল, কুনিহিকো হিদাকার গোস্টরাইটার হলে সেটা অস্বীকার করার তো কোন কারণ নেই। একজন বেস্টসেলিং লেখকের গোস্টরাইটার হিসেবে পরিচয় দিতে পারলে তো তারই লাভ।

তাহলে আসলেই হয়তো গোস্টরাইটার নয় সে। অ্যাপার্টমেন্টে প্রাপ্ত নোটবুক আর ডিস্কগুলো নিয়েও মিথ্যে কথা বলেনি।

কিন্তু এমনটা ঘটা অসম্ভব।

আমি যে ওসামু নোনোগুচিকে চিনি, সে নিজের কার্যকলাপের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী আর দাম্ভিক। এরকম একজন মানুষ কারো লেখা অনুকরণ করবে, তা বিশ্বাস করা কষ্ট। হোক সেটা অনুশীলনের জন্যে।

স্টেশনে ফিরে মি. নোনোগুচিকে নিয়ে চিফের সাথে আলাপ করলাম। মুখ ব্যাজার করে আমার রিপোর্ট শুনলেন ডিটেক্টিভ সাকোদা।

আমার কথা শেষ হলে বললেন, "হিদাকাকে হত্যার মোটিভ কেন গোপন করতে চাইবে নোনোগুচি?"

"তা জানি না। কাউকে সে খুন করেছে, এর চেয়ে গোপন খারাপ কিছু কি হতে পারে?"

"তোমার কি ধারণা? এর সাথে হিদাকার উপন্যাসগুলোর কোন সম্পর্ক আছে?"

"হ্যাঁ।"

"ওসামু নোনোগুচিই উপন্যাসগুলোর প্রকৃত লেখক? যদিও বিষয়টা অস্বীকার করছে সে?"

প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত সময় এই কেসের পেছনে নষ্ট করতে চায় না ডিপার্টমেন্ট, এটা স্পষ্ট। গণমাধ্যমের লোকজন ইতিমধ্যে গোস্টরাইটার থিওরিটার ব্যাপারে প্রশ্ন করা শুরু করে দিয়েছে। তারা এই বিষয়ে কিভাবে জানলো, তা বুঝতে পারছি না। আমরা তো এই ব্যাপারে কারো সাথে কথা বলিনি, কিন্তু পেপারগুলো আগামীকাল থেকেই এই ব্যাপারে প্রতিবেদন ছাপানো শুরু করবে খুব সম্ভবত। অর্থাৎ, একের পর এক ফোন আসতে শুরু করবে স্টেশনে।

"তাহলে তার মতে মাথা গরম করে হিদাকাকে খুন করে ফেলেছে সে?" মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন সাকোদা। "ওসামু নোনোগুচি যদি সামনের দরজা দিয়ে বের হয়ে আবার বাগান ঘুরে পেছনের জানালা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে এটা স্পষ্ট যে হিদাকাকে খুন করার ইচ্ছা আগে থেকেই ছিল তার। খুব সম্ভবত সেদিন প্রথমবার দেখা হওয়ার পরেই হিদাকাকে খুন করার পরিকল্পনা আঁটে সে।"

"তাহলে, এখন প্রশ্নটা হচ্ছে, কোন বিষয়ে কথা হয়েছিল তাদের?"

"নোনোগুচির বক্তব্য থেকে এই ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি। আমার ধারণা হিদাকা কানাডায় চলে যাওয়ার পরে কিভাবে তাদের মধ্যে কাজ চলবে সেই ব্যাপারে আলাপ করে দু'জনে। হয়তো তখন হিদাকা এমন কিছু বলে বসে যেটা নোনোগুচির পছন্দ হয়নি।"

"হতে পারে।"

আমরা ইতিমধ্যে ওসামু নোনোগুচির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছি। কিন্তু সেখানে কুনিহিকো হিদাকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে কোন প্রকার লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে নগদ লেনদেনের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

"এই দু'জনের অতীত সম্পর্কে আরো খোঁজ খবর নিতে হবে বলে মনে হচ্ছে," চিফ বললেন।

তার কথায় সায় দিলাম আমি।

***

সিদ্ধান্ত নিলাম আমার দুইজন সহকর্মীকে নিয়ে রাই হিদাকার সাথে কথা বলে আসবো। মি. হিদাকা যে বাড়িটায় খুন হয়েছে, সেটা ছেড়ে এখন নিজের বাবা-মা'র বাসায় ফিরে গেছে সে। টোকিও'র পশ্চিমে মিতাকা শহরতলীতে সেই ঠিকানা। মফস্বলই নলা চলে। ওসামু নোনোগুচি গ্রেফতার হবার পর এই প্রথম তার সাথে দেখা হচ্ছে আমার। চিফ অবশ্য আগেই ফোন করে তাকে বলে দিয়েছেন আমাদের যাওয়ার কথা। তবে আমার গোস্টরাইটার থিওরির বিষয়ে কিছু জানাননি। তবে সাংবাদিকদের কল্যাণে কিছু না কিছু অবশ্যই শুনেছে রাই হিদাকা। তাদের যেরকম ছোঁক ছোঁক করা স্বভাব, নিশ্চয়ই কয়েক হাজার বার ফোনও দিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যে। আমরা তাকে কিছু প্রশ্ন করবো তো বটেই, আমাদের জন্যেও নিশ্চয়ই প্রশ্নের অভাব নেই তার কাছে।

মিতাকার বাড়িটায় পৌঁছানোর পর সংক্ষেপে তাকে সবকিছু খুলে বলি। মি. নোনোগুচির অ্যাপার্টমেন্টে যে পান্ডুলিপিগুলো খুঁজে পেয়েছি সেগুলোর ব্যাপারে জানালাম ভদ্রমহিলাকে। শুনে অবাকই হলো রাই।

পান্ডুলিপিগুলোর সাথে তার প্রয়াত স্বামীর কাজের এতটা মিল কেন, এই বিষয়ে তার কিছু জানা আছে কি না জানতে চাইলাম।

জবাবে মাথা ঝাঁকিয়ে মানা করে দিলো রাই। "আমার মনে হয় না উপন্যাসের আইডিয়ার ব্যাপারে কারো কাছ থেকে কোন প্রকার সাহায্য নিত

ও। অনুকরণ করা তো দূরের কথা। নিত্য নতুন প্লট খুঁজে বের করা সহজ কাজ নয়, মাঝে মাঝে বেশ কষ্ট হয়ে যেত ওর, কিন্তু তাই বলে গোস্টরাইটার নিয়োগ দেয়ার মত মানুষ ছিল না ও।" শান্তকণ্ঠে কথাগুলো বললেও চোখের তারায় জ্বলন্ত কয়লার আভা দেখতে পেলাম। ধিকিধিকি জ্বলছে।

কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করে নেয়াটা আমার জন্যে কষ্টকর। কুনিহিকো হিদাকার সাথে তার বিয়ে হয়েছিল এক মাস আগে। আমি নিশ্চিত প্রয়াত স্বামীর বিষয়ে অনেক কিছুই অজানা রয়ে গেছে ভদ্রমহিলার।

আমার দোটানার কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে সে। "আপনি যদি ভেবে থাকেন যে আমাদের বিয়ের বয়স খুব বেশি নয়, তাহলে ভুল ভাবছেন না। কিন্তু সেই সাথে আপনাকে এটাও মনে রাখতে হবে এর আগে আমি তার সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেছি।"

এই তথ্যটাও আগে থেকেই জানা ছিল আমার। হিদাকা যে প্রকাশনীগুলোর সাথে কাজ করতো, তারই একটায় চাকরি করতো রাই। সেই সূত্রেই পরিচয় হয়েছিল দু'জনের।

"আমি যখন ওর সম্পাদক ছিলাম, তখন আগামীতে কী লিখবে সেই ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ হতো। কেবলমাত্র একটা বইয়ের সম্পাদনার ক্ষেত্রেই আমি সাহায্য করেছিলাম ওকে। কিন্তু আমরা যদি আলাপ না করতাম, তাহলে বইটা হয়তো প্রকাশিতই হতো না। তাই এসবের সাথে নোনোগুচির সম্পৃক্ততার বিষয়টা একটু বেশি দুর্বোধ্য ঠেকছে আমার কাছে।"

"কোন উপন্যাসটার ব্যাপারে কথা বলছেন?"

"সমুদ্রের ডাক। গত বছর প্রকাশিত হয়েছিল ওটা।"

হিদাকার এই বইটা আমি এখনও পড়িনি। তাই সাথে আসা একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, সে পড়েছে কি না। তদন্তের খাতিরে আমার সহ-গোয়েন্দাদের অনেকেই হিদাকার কাজের ব্যাপারে মোটামুটি বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে।

জবাবে সে যা বলল তাতে কৌতূহল বাড়ল বৈ কমলো না। সমুদ্রের ডাকের কোন পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া যায়নি ওসামু নোনোগুচির বাসায়।

তবে শুধু সমুদ্রের ডাকই নয়, লেখালেখির ক্যারিয়ারে শুরুর তিন বছরে কুনিহিকো হিদাকার যেসব কাজ প্রকাশিত হয়েছে সবগুলোই মৌলিক। এমনকি এরপরেও তার যেসব কাজ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে প্রায় অর্ধেকের কোন পান্ডুলিপি বা খসড়া পাওয়া যায়নি নোনোগুচির ডেস্কে বা হার্ডড্রাইভে। অর্থাৎ এমনটা হতে পারে যে কুনিহিকো হিদাকা কিছু কিছু উপন্যাস নিজে লিখেছেন এবং বাকিগুলোর ক্ষেত্রে গোস্টরাইটারের সাহায্য নিয়েছেন।

আর এটা যদি সত্যি হয়েই থাকে, তাহলে মিসেস রাইয়ের বক্তব্য বিবেচনায় নিলেও আমার থিওরিটা ভুল প্রমাণিত হয় না।

সম্পূর্ণ নতুন একটা দৃষ্টিকোণ থেকে গোটা কেসটা দেখার চেষ্টা করলাম আমি। রাইকে জিজ্ঞেস করে যায় যে ওসামু নোনোগুচির হাতে হিদাকার খুন হওয়ার সম্ভাব্য কোন কারণ মাথায় আছে কি না তার।

"ওকে আপনারা গ্রেফতারের পর থেকেই ব্যাপারটা নিয়ে ক্রমাগত ভেবে চলেছি আমি, জানেন তো। সত্যি কথা বলতে, আমার এখনও বিশ্বাসই হচ্ছে না। ওরা তো খুবই ভালো বন্ধু ছিল। কখনো ঝগড়া বা তর্ক করতেও দেখিনি। পুরোটাই হয়তো বড় ধরণের কোন ভুল বোঝাবুঝি।"

রাইয়ের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না কোম প্রকার অভিনয় করছে সে। যা বলার, মন থেকেই বলছে। তার সাথে আরো টুকটাক কিছু কথা বলে বিদায় নিলাম।

আমরা বের হচ্ছি এই সময় ধূসর মলাটের একটা বই আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো রাই হিদাকা। তার মনে নিশ্চয়ই ঘুরছে যে আমার নিজের সমুদ্রের ডাক বইটা পড়া উচিত। তাহলে আর কুনিহিকো হিদাকার প্রতিভা নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলবো না।

সেই রাতেই বইটা শুরু করি আমি। কিছুদিন ওসামু নোনোগুচিকে যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম হিদাকা কোন রহস্যোপন্যাস লিখেছে কি না, তখন এই বইটার নামই বলেছিল সে। নোনোগুচির আমাকে এই বইটার নাম বলার পেছনে অন্য কোন কারণ ছিল কি না,সেটাই ভাবছি। হিদাকার প্রকাশিত যে বইটার সাথে তার কোন সম্পৃক্ততা নেই, হয়তো সেটা ইচ্ছে করেই পড়তে বলেছিল আমাকে।

সমুদ্রের ডাকের গল্পটা এক বয়স্ক লোক এবং তার তরুণী স্ত্রী'কে নিয়ে।

লোকটা একজন চিত্রশিল্পী এবং তার স্ত্রী হচ্ছে মডেল। এক পর্যায়ে চিত্রশিল্পীর সন্দেহ হতে থাকে যে তার স্ত্রী হয়তো পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছে। এই ধাঁচের বইগুলোর মধ্যে একদম সাধারণ একটা ঘটনা এই বিষয়টা। কিন্তু, তার স্ত্রী আসলে একজন দ্বৈত সত্ত্বার মানুষ। দুই সত্ত্বার ব্যক্তিত্বও দু'রকম। চিত্রশিল্পী স্ত্রী'র এই বৈশিষ্ট্যটা সম্পর্কে জানার পর থেকেই আসল ঘটনা শুরু হয়। তরুণীর দুই সত্ত্বার মধ্যে একটা সত্ত্বা স্বামীকে একদম অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসে। কিন্তু অন্য সত্ত্বাটার একজন আলাদা প্রেমিক আছে। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয় যে দ্বিতীয় সত্ত্বাটা তার স্বামীকে হত্যা করার পরিকল্পনা আঁটছে। চিত্রশিল্পী বুঝে উঠতে পারে না যে স্ত্রী'কে হাসপাতালে নিয়ে যাবে কি না। সেই সময় ডেস্কে একটা চিরকুট খুঁজে পায় সে। যেখানে লেখা :

"ড্রাগটা কাকে হত্যা করবে? আমাকে নাকি ওকে (স্ত্রী'র দ্বিতীয় সত্ত্বা)?"

চিরকুটটা চিত্রশিল্পীর দ্বিতীয় সত্ত্বার লেখা। বার্তাটা পরিষ্কার–চিকিৎসায় তার মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার ঠিক হলেও যে সত্ত্বাটা রয়ে যাবে সে চিত্রশিল্পীকে ভালোবাসবে কি না।

গোটা বিষয়টা নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় ভুগতে শুরু করে চিত্রশিল্পী। রাতে দুঃস্বপ্নও দেখে এই ব্যাপারে। এসব স্বপ্নে মুখে মধুর একটা হাসি ঝুলিয়ে শোবার ঘরে প্রবেশ করে তার স্ত্রী। কিছুক্ষণ পর খুলে দেয় জানালাটা। সেই জানালা গলে উদ্যোত ছুরি হাতে ঘরে প্রবেশ করে আততায়ী। কিছুক্ষণের মধ্যে আততায়ীর চেহারার জায়গায় ভেসে ওঠে তার স্ত্রী'র মুখটা। এই পর্যায়ে ঘেমে নেয়ে ঘুম ভেঙে যায় চিত্রশিল্পীর।

শেষ অবধি আসলেও তাকে আক্রমন করে বসে তরুণী স্ত্রী। আত্মরক্ষার সময় ভুলক্রমে স্ত্রী'কে পাল্টা জখম করে চিত্রশিল্পী। তার হাতের উপরেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে তরুণী। একদম শেষ মুহূর্তে চোখের দিকে তাকিয়ে চিত্রশিল্পী বুঝতে পারে তার স্ত্রী'র এই সত্ত্বা তাকে অন্তর থেকে ভালোবাসে। তাহলে চিত্রশিল্পীর হাতে যে প্রাণ হারালো, সে কি মন্দ নাকি ভালোর প্রতিনিধি? চিত্রশিল্পী এই উত্তর আর কখনো খুঁজে পাবে না।

মোটের উপরে এটাই কাহিনী। কিন্তু আমি নিশ্চিত বিদগ্ধ পাঠকেরা হয়তো রূপক কোন অর্থ খুঁজে বের করতে পারে গল্প থেকে। বুড়ো বয়সে সুন্দরি স্ত্রী ঘরে আনার অর্থ হতে পারে কামলোভী কোন বুড়োর জীবনের বয়ান এবং তার করুণ পরিণতি। সত্যি বলতে স্কুলে থাকতে সাহিত্য কখনোই আমাকে সেভাবে টানেনি। লেখার মান নিয়েও কোন প্রকার মন্তব্য করার যোগ্যতা নেই। তবে একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, রাই হিদাকার মতামতের প্রতি পূর্ণাঙ্গ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, বইটা খুব একটা সুবিধার নয়।

***

এবারে এই দু'জনের ক্যারিয়ারের ব্যাপারে আলোকপাত করা যাক–ভিক্টিম এবং খুনি।

কুনিহিকো হিদাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন একটা বেসরকারি হাই স্কুল থেকে পাশ করার পর সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই সাহিত্য এবং দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করে। ডিগ্রি শেষ হলে প্রথমে যোগ দেয় একটা বিজ্ঞাপন সংস্থায় এবং পরবর্তিতে একটা প্রকাশনা সংস্থায়। প্রায় দশ বছর আগে তার লেখা একটা ছোটগল্প একটা সাহিত্য পত্রিকায় সেরা নতুন কণ্ঠের পুরষ্কার জিতে নেয়। সেখান থেকেই তার ঔপন্যাসিক জীবনের শুরু। পরবর্তি দুই আড়াই বছর অবধি অবশ্য তার কোন বই খুব বেশি একটা বিক্রি হয় না। কিন্তু চতুর্থ বছরে প্রকাশিত প্রকাশিত 'নিভে যাওয়া অনল' জিতে নেয় নামকরা একটি সাহিত্য পুরষ্কার। সেখান থেকেই বিখ্যাত লেখক হিসেবে তার উত্থানের শুরু।

ওসামু নোনোগুচি পৃথক একটা বেসরকারি হাই স্কুল থেকে পড়াশোনার পাঠ চুকানোর পরে ভর্তি হয় সরকারি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগে। তার মেজর ছিল জাপানি সাহিত্য। শিক্ষকতার পেশায় যোগদানের পরীক্ষাতেও উতরে যায় সে। যোগ দেয় সরকারি মিডল স্কুলে। এই বছরের শুরুতে স্বেচ্ছা অবসর নেয়ার আগ অবধি তিনটা পৃথক পৃথক স্কুলে চাকরি

করে সে। আমার সাথে নোনোগুচির যেখানে পরিচয় হয়, সেটা ছিল তার দ্বিতীয় কর্মস্থল।

বছর দুয়েক আগে একটা দ্বি-বার্ষিক কিশোর পত্রিকায় গল্প ছাপানোর মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে লেখালেখির জীবনে পদার্পণ তার। এখন অবধি কোন উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি তার।

হাইস্কুল থেকে দুজন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পড়াশোনা করলেও, ওসামু নোনোগুচির ভাষ্যমতে সাত বছর আগে আবার দেখা হয়ে যায় দুজনের। হিদাকার নাম খবরের কাগজে দেখার পর বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করে সে।

খুব সম্ভবত এই কথাটা সত্যিই বলেছে নোনোগুচি। কারণ তাদের দু'জনের পুনরায় যোগাযোগের ছয় মাসের মাথায় 'নিভে যাওয়া অনল' বইটার জন্যে সাহিত্য পুরষ্কার লাভ করে কুনিহিকো হিদাকা। এই উপন্যাসটার একটা পান্ডুলিপি নোনোগুচির বাসায় খুঁজে পাই আমরা। সুতরাং, এটা বলাটা অত্যুক্তি হবে না যে পুরনো বন্ধুর সাথে যোগাযোগের ফলস্বরূপ পাল্টে যায় হিদাকার ভাগ্য।

নিভে যাওয়া অনল বইটার সম্পাদকের সাথে কথা বলতে গিয়েছিলাম আমি। ছোটখাটো লোকটা বর্তমানে একটা সাহিত্য পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে কাজ করে।

তার কাছে আমি মূলত জানতে চাই পূর্বে প্রকাশিত লেখাগুলো বিবেচনায় নিয়ে তার মনে হয় কী না কুনিহিকো হিদাকার পক্ষে ওরকম একটা উপন্যাস লেখা সম্ভব।

আমার প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে পাল্টা আরেকটা প্রশ্ন করে মি. মাইমুরা। "আপনি কি ওসব গোস্টরাইটার ছাইপাঁশ নিয়ে তদন্ত করছেন?"

এটা পরিষ্কার যে, মি. মাইমুরা আমার থিওরির সাথে বিশেষ একমত নন। মৃত্যুর পর কুনিহিকো হিদাকার সুনাম নষ্ট করে তার কোম্পানিরও কোন লাভ হবে না।

"এটাকে আসলে এখনও শক্ত কোন থিওরি বলতে নারাজ আমি। এটার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণাদি এখনও নেই আমাদের কাছে। আমি কেবল সবকিছু খতিয়ে দেখছি, এই যা।"

"তদন্তের বিষয়-আশয় আপনি আমার চেয়ে ঢের ভাল বোঝেন। কিন্তু এরকম গুজবের পেছনে ছোটা আর আলিয়ার পেছনে ছোটা একই কথা। সময় নষ্ট।" এটুকু বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন সম্পাদক সাহেব, এরপর আমার প্রশ্নের জবাবে বললেন, "সত্যিকার অর্থেই নিভে যাওয়া অনল হিদাকার ক্যারিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তার উন্নতি ছিল চোখে পড়ার মতন। রাতারাতি এরকম অগ্রগতি সাধারণত দেখা যায় না।"

"তাহলে আপনার মতে এই বইটা পূর্বে প্রকাশিত ওনার অন্যান্য বইয়ের চাইতে মানগত দিক দিয়ে ভালো?"

"তা বলা যায়। কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে বলবো এটা অপ্রত্যাশিত কিছু না, অন্তত আমার কাছে। হিদাকা বরাবরই শক্তিশালী লেখক। শুরুর দিকে লেখাগুলোয় কিছুটা খামখেয়ালিপনা ছিল, সেজন্যই ওই বইগুলো বেশি পাঠকপ্রিয়তা পায়নি। কিছু বাহুল্যের কারণে মূল বার্তাটা ধরতে পারেনি অনেকেই। কিন্তু নিভে যাওয়া অনল একদম বাহুল্য বর্জিত। আপনি নিজে পড়েছেন কি বইটা?"

"হ্যাঁ, পড়েছি। বেশ ভালো ছিল।"

"আমার মতে এটাই হিদাকার সেরা কাজ।"

এই বইয়ের গল্পটা মূলত সাধারণ এক চাকুরিজীবীকে নিয়ে। একটা জায়গায় কোম্পানির ট্যুরে গিয়ে আতশবাজির প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় সে। সিদ্ধান্ত নেয় চাকরি বাদ দিয়ে আতশবাজির ব্যবসা শুরু করার। মূল গল্পটা আসলেই ভালো। আমার সবচেয়ে উপভোগ্য লেগেছে বিভিন্ন ধরণের আতশবাজির বিস্তারিত বিবরণ।"

"এই উপন্যাসটা তো ধারাবাহিকভাবে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। একেবারে লিখে জমা দিয়েছিলেন হিদাকা, তাই না?"

"ঠিক বলেছেন।"

"উনি উপন্যাসটা লেখা শুরু করার আগেই কি আপনারা এই বিষয়ে কথা বলেছিলেন?"

"নিশ্চয়ই। আমাদের এখানে যত লেখক আছে সবার সাথেই এভাবে কাজ করি আমরা।"

"মি. হিদাকার সাথে কি বিষয়ে কথা হয়েছিল আপনার তখন?"

"মূল প্লটটা নিয়ে আলাপ করি আমরা। সেই সাথে প্রধান চরিত্রটা কেমন হবে, বর্ণনার ধরন এসব।"

"মূল সিদ্ধান্তগুলো কি সব আপনার একসাথে নিতেন?"

"নাহ। এগুলো মি. হিদাকার নিজের ব্যাপার। হাজার হলেও তিনিই তো লেখক। আমি শুধু আলোচনার মাধ্যমে কিছুটা মতামত দিয়েছি আর কি।"

"মূল চরিত্র যে আতশবাজির কারিগর হবে এই সিদ্ধান্তটা কি মি. হিদাকা নিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"আইডিয়াটা শুনে আপনার কেমন লেগেছিল?"

"মানে আমার পছন্দ হয়েছিল কি না জানতে চাচ্ছেন?"

"আমি বোঝাতে চাইছি এই ধরনের আইডিয়ার কথা তার মুখে আগেও শুনেছেন কি না ।"

"না, তা শুনিনি। কিন্তু অবাকও হইনি। এমন নয় যে আতশবাজির কারিগরদের নিয়ে সে-ই প্রথম লিখেছে।"

"আচ্ছা মি. মাইমুরা, উপন্যাসটায় কি এমন কিছু ছিল যা আপনার সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে সেখানে রেখেছিলেন মি. হিদাকা?"

"বড়সড় কিছু না। চূড়ান্ত খসড়াটা দেখার পর কিছু বিষয়ে পরামর্শ দেই আমি। কিন্তু সেই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন কি না, সেটা পুরোপুরি হিদাকার সিদ্ধান্ত।"

"শেষ প্রশ্ন। মি. হিদাকা যদি কারো লেখা অনুকরণ করে নিজের মত করে লেখেন, সেটা কি আপনি ধরতে পারবেন?"

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ ভাবলেন মাইমুরা। "সত্যি বলতে, না। বর্ণনার ধরণ আর শব্দের ব্যবহারই মূলত একজন লেখককে আরেকজন থেকে আলাদা করে।"

তবে শেষ পর্যন্ত আরেকটা কথা যোগ করা থেকে পিছপা হলেন না মি. মাইমুরা। "ডিটেক্টিভ, 'নিভে যাওয়া অনল' নিঃসন্দেহে হিদাকার মৌলিক কাজ। এটা লেখার সময় বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছিল আমাদের। অনেক

খেটেছে সে এটার পেছনে। মাঝে মাঝে তো আমার মনে হতো এই বই পুরোপুরি ভেঙে পড়বেন। অন্য কারো উপন্যাস হলে কিন্তু এমনটা ঘটতো না।"

তার এই কথার প্রেক্ষিতে আমি আর কথা বাড়াইনি, ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে বের হয়ে এসেছি। তবে মনে মনে একটা পালটা যুক্তি ঠিকই তৈরি করে ফেলেছিলাম। কোন কিছু নিয়ে আনন্দিত হবার অভিনয় করাটা কঠিন হলেও, এর বিপরীতটা তুলনামূলক সোজা। সম্পাদক সাহেব যা-ই বলুক না কেন, আমি এখনও আমার গোস্টরাইটার থিওরি নিয়ে আত্মবিশ্বাসী।

***

একজন পুরুষ যখন আরেকজন পুরুষকে হত্যা করে, প্রায়শই দেখা যায় ঘটনার সাথে কোন নারীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পৃক্ততা থাকে। তবে ওসামু নোনোগুচির জীবনে কোন নারী আছে কি না,সেই বিষয়ে আমরা এখনও কোন প্রকার তদন্ত করিনি। ডিপার্টমেন্টে সবারই ধারণা এই খুনটা আসলে 'ওই ধরণের' কিছু নয়। হয়তো মি. নোনোগুচির ব্যক্তিত্বের কারণেই এমনটা ধারণা হয়েছে সবার। তার চেহারা কুৎসিত, তা বলবো না। কিন্তু নোনোগুচির পাশে কোন নারীকে কল্পনা করা খানিকটা কষ্টকরই বটে।

তবে আমাদের আন্দাজ ভুল। অন্তত একজন নারীর সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল তার। আমার পরে তদন্ত দলের যারা নোনোগুচির অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশির জন্যে যায়, তারাই এই তথ্যটা আবিষ্কার করে। মোট তিনটে সূত্র পায় তারা।

প্রথমটা হচ্ছে চেক প্যাটার্নের মেয়েলি ডিজাইনের একটা অ্যাপ্রন। ধোয়া এবং আইরন করা অ্যাপ্রনটা সুন্দরমত ভাজ করে রাখা ছিল ওসামু নোনোগুচির ড্রয়ারে। আমাদের ধারণা মাঝে মাঝে নোনোগুচির বাসায় এসে টুকটাক কাজ করার সময় অ্যাপ্রনটা পরে সেই নারী।

দ্বিতীয় সূত্রটা হচ্ছে একটা সোনার নেকলেস। প্যাকেট থেকে অনেক

বের করা হয়নি ওটা। একটা নামকরা জুয়েলারি দোকান থেকে কেনা হয়েছিল নেকলেসটা। খুব সম্ভবত উপহার দেয়ার উদ্দেশ্যে।

তৃতীয় সূত্র হচ্ছে একটা জরিপের ফর্ম। সুন্দর মত ভাজ করে নেকলেসের বাক্সের সাথেই রাখা ছিল ওটা। জরিপের ফর্মটা ওকিনাওয়ার একটি ট্রাভেল এজেন্সির। বছর সাতেক আগের মে মাসের দশ তারিখ দেয়া ফর্মটায়। ভ্রমণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল জুলাই মাসের ৩০ তারিখে। এই সময়টায় সাধারণত ছুটি থাকে শিক্ষকদের। কিন্তু ফর্মটা যেহেতু পূরণ করে ফেরত দেয়া হয় নাই, এটা পরিস্কার যে ঘুরতেও যাওয়া হয়নি নোনোগুচির।

দুই ভ্রমণকারীর নামও লেখা আছে ফর্মটায়। একটা হচ্ছে ওসামু নোনোগুচি। আরেকটা হাতসুকো নোনোগুচি, বয়স উনিত্রিশ বছর।

কিন্তু আমরা খোঁজ খবর নিয়েও এই নামে কাউকে খুঁজে পাইনি। অন্তত ওসামু নোনোগুচির আত্মীয়দের মধ্যে এই নামে কেউ নেই। আমাদের ধারণা হাতসুকো নোনোগুচি একটা ছদ্মনামে। কাউকে নিজের স্ত্রী'র বেশে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল নোনোগুচি।

এখান থেকে আন্দাজ করা যায় যে সাত বছর আগে অন্তত একজন নারীর সাথে হলেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ওসামু নোনোগুচির। খুব সম্ভবত এখনও সেই নারীর জন্যে আবেগ কাজ করে তার। নতুবা নেকলেস আর অ্যাপ্রনটা ওভাবে যত্ন করে রেখে দেয়া হতো না।

চিফের কাছে এই ব্যাপারটা আরো খতিয়ে দেখার জন্যে অনুমতি চেয়েছি আমি। হাতসুকোর সাথে আমাদের কেসের কোন সম্পর্ক আছে কি না জানি না, তবে নিভে যাওয়া অনল বইটা খ্যাতি লাভ করে মোটামুটি সেই সময়েই। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে সেই সময়ে নোনোগুচির সাথে যার সম্পর্ক ছিল, তার সাথে কথা বললে আমি হয়তো নতুন কিছু তথ্য জানতে পারবো।

প্রথমে ওসামুকেই জিজ্ঞেস করি আমি। আমরা তার অ্যাপার্টমেন্টে নেকলেস আর জরিপের ফর্মটা খুঁজে পেয়েছি শুনে হাসপাতালের বিছানায় প্রায় অর্ধেক উঠে বসে সে।

"আপনি কি আমাকে বলবেন যে অ্যাপ্রনটা কার, নেকলেসটা কাকে

দেয়ার ইচ্ছে ছিল আপনার আর কার সাথে ওকিনাওয়ায় ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন?"

এর আগে করা আমার প্রশ্নগুলো শুনে খুব একটা বিচলিত হয়নি নোনোগুচি। কিন্তু এবারে তার চেহারায় পরিষ্কার দুশ্চিন্তার ছাপ পড়তে দেখলাম। "এর সাথে আপনাদের কেসের কি সম্পর্ক? আমি একটা খুন করেছি, সেজন্যে আমাকে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু তাই বলে আমার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়েও কথা বলতে হবে, যার সাথে কেসের কোন সম্পর্কই নেই?"

"আমি তো আপনাকে বলিনি যে এসব তথ্য পুরো দুনিয়ার মানুষ জানবে। শুধুমাত্র আমি জানব। আমার যদি মনে হয় যে কেসের সাথে এসব তথ্যের কোন সম্পর্ক নেই, তাহলে আর আপনাকে এই ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করা হবে না। মিডিয়ার লোকজনের কানেও কিছু যাবে না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, ভদ্রমহিলাকে কেউ বিরক্ত করবে না।"

"মাফ করবেন, কাগা। কিন্তু কেসের সাথে ওর কোন সম্পর্ক নেই। আমার মুখের কথাই বিশ্বাস করে নিতে হবে আপনাকে।"

"আমাকে বলে দিলেই কিন্তু ঝামেলা মিটে যায়। নতুবা আমরা তদন্ত করতে বাধ্য হব। সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সবকিছু বেরিয়ে আসবে। আর একবার আমাদের গোয়েন্দারা এই বিষয়ে খোঁজ খবর নেয়া শুরু করলে, মিডিয়ার লোকজনদের কাছেও ব্যাপারটা গোপন থাকবে না। সেটা নিশ্চয়ই চাইবেন না আপনি।"

আমার হাজারো চাপাচাপি সত্ত্বেও মহিলার নামটা মুখে আনলো না ওসামু নোনোগুচি। এমনকি তার অ্যাপার্টমেন্টে আমাদের বারবার তল্লাশি চালানোর বিষয়টা নিয়েও আপত্তি তুলল। "আপনারা ওভাবে বারবার আমার ব্যক্তিগত জিনিসগুলো ওলট-পালট না করলেই খুশি হবো। ওখানকার অনেকগুলো আমি উপহার হিসেবে পেয়েছি বন্ধুদের কাছ থেকে। সেগুলোর গুরুত্ব আমার কাছে অনেক বেশি।"

এই সময় ডাক্তার এসে জানালো নোনোগুচির সাথে আমার সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেছে বেরিয়ে যেতে হবে।

আমারও মনে হলো যা জানার আপাতত জেনে গিয়েছি। ওই মহিলার ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে হবে। নোনোগুচির মোটিভের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য হাতে আসতে পারে তাহলে।

প্রথমে নোনোগুচির প্রতিবেশীদের সাথে গিয়ে কথা বললাম। জানতে চাইলাম তার অ্যাপার্টমেন্টে কোন নারীকে কখনো আসতে দেখেছে কি না, কিংবা কারো গলার শব্দ শুনেছে কি না। পুলিশের সাথে কথা বলতে সাধারণত যারা দ্বিধাবোধ কর, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রতিবেশীদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারে কথা বলতে তাদের কোন আপত্তি থাকে না। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতিবেশীরা খুব বেশি কিছু জানাতে পারল না। এমনকি নোনোগুচির পাশের ফ্ল্যাটে যে গৃহিণী থাকে, সে-ও কখনো কোন নারীকে আসতে দেখেনি।

"গত কয়েক মাসের কথা বলছি না কিন্তু। গত কয়েক বছরের মধ্যে কাউকে আসতে দেখেছেন কি?"

জবাবে মহিলা আমাকে বলল, প্রায় দশ বছর ধরে এখানে থাকছে সে, অর্থাৎ নোনোগুচির সমসাময়িক সময়েই অ্যাপার্টমেন্টটায় উঠেছিল তারা। কারো সাথে যদি নোনোগুচির সম্পর্ক থেকে থাকে, সেটা জানবার কথা তার।

"একজনকে বোধহয় দেখেছিলাম," কিছুক্ষণ ভেবে বলে সে। "তবে সেটা অনেক আগের কথা। মাফ করবেন, আমার পরিষ্কার মনে নেই কিছু।"

ওসামু নোনোগুচির ব্যক্তিগত এবং পেশাগত সব সম্পর্কগুলো নিয়েই নতুন করে ভাবা শুরু করলাম আমি। মার্চে যে স্কুল থেকে অবসর গ্রহণ করে সে, সেই স্কুলটায় গেলাম প্রথমে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলাম প্রায় কেউই তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কিছু বলতে পারছে না। আসলে নোনোগুচিকে কোন অর্থেই মিশুক বলা সম্ভব না। কাজের বাইরে কারো সাথে সময় কাটিয়েছে সে, এমন ঘটনাও বিরল।

এরপর আমি গেলাম মিডল স্কুলটায়। ওকিনাওয়ায় ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা এই স্কুলে চাকরি কালীন সময়েই করেছিল সে। তবে এখানে যাওয়ার ব্যাপারে একটা অনীহা কাজ করছিল আমার মধ্যে। আমিও তো এখানেই চাকরি করতাম।

ক্লাস নেয়ার সময় শেষ হবার পরে স্কুলে যাই আমি। স্কুলের তিনটা দালানের মধ্যে দুটো সংস্কার করা হয়েছে। তাছাড়া সবকিছু একদম দশ বছর আগে যেরকম দেখেছিলাম, সেরকমই আছে।

গেটের সামনে গিয়ে হঠাৎ করেই ভেতরে ঢোকার সাহস হারিয়ে ফেললাম। শিক্ষার্থীরা দল বেঁধে বেরিয়ে যাচ্ছে স্কুল থেকে। এসময় একটা পরিচিত মুখের দেখা পেলাম। ইংরেজির শিক্ষিকা, মিসেস টোম। আমার থেকে বয়সে প্রায় সাত-আট বছরের বড় হবেন ভদ্রমহিলা। পেছন থেকে তাকে ডাকলাম আমি। আমাকে চিনতে পেরে একটা হাসি ফুটলো তার মুখে। হাসির সাথে খানিকটা বিস্ময়ও খেলা করছে চোখে।

নোনোগুচির ব্যাপারে আলাপ শুরু করার আগে কুশল বিনিময় করলাম আমরা। প্রাক্তন সহকর্মীর নাম শোনা মাত্র গম্ভীর হয়ে গেল মিসেস টোমের চেহারা।

স্কুলের পাশেই একটা কফিশপে বসলাম আমরা। আমি যখন চাকরি করতাম, তখনও ছিল না এই কফিশপটা।

"ঘটনা শুনে তো আমাদের সবার মাথা ঘুরে গেছে। মি. নোনোগুচি এমন কিছু করতে পারেন তা অবিশ্বাস্য," উত্তেজিত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন তিনি। "আর কাকতালীয়ভাবে আপনিই কি না এই কেসের তদন্ত কর্মকর্তা!"

জবাবে বললাম, এই কাকতালীয়তার জন্যই আমার কাজ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সমস্যাটা বুঝতে পারছেন, এই ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি। এরপর আমার প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করলাম। প্রথমেই জানতে চাইলাম নোনগুচির জীবনে কোন নারীর ব্যাপারে কিছু জানেন কি না তিনি।

মিসেস টোম বললেন এই প্রশ্নটার জবাব দেওয়া একটু কঠিন। "আমি একদম নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবো না, কিন্তু আমার ধারণা তার জীবনে কেউ ছিল না ।"

"এমনটা মনে হওয়ার কারণ?"

"অনুমান?" বলেই নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসলেন মিসেস টোম। "আমি জানি এই ধরনের ব্যাপারে অনুমান করে কিছু বলা ঠিক নয়। কিন্তু সবকিছু বিবেচনা করে এটিই আমার কাছে ঠিক মনে হচ্ছে। আপনি কি জানেন যে

অনেকেই কিন্তু মি. নোনোগুচিকে ব্লাইন্ড ডেটে যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছে।"

"না, তা জানতাম না। সে কারো সাথে ডেটিংয়ে যাবে এটা আমার জন্য বিশ্বাস করা একটু কষ্টকরই বটে।"

"ক্যাজুয়াল ডেটিং নয়, বরং বিয়ে করার জন্যে কাউকে খুঁজছিল সে। আমি মোটামুটি নিশ্চিত আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ও তার পরিচিত একজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন নোনোগুচিকে। যে বিয়ে করার জন্যে এমন হন্য হয়ে পাত্রী খুঁজবে, তার জীবনে তো কারো থাকার কথা নয়।

"কত বছর আগের কথা বলছেন?"

"এখানকার চাকরি ছাড়ার খুব বেশিদিন আগের কথা না। পাঁচ-ছয় বছর হবে।"

"তার আগে? তখনও কি কাউকে খুঁজে দেয়ার ব্যাপারে কিছু বলতো সে?"

"আমার আসলে একদম ঠিকঠাক মনে নেই। অন্য টিচারদের এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবো? সেই সময়ে নোনোগুচির সাথে চাকরি করতো এমন অনেকেই আছে এখনও।"

জানালাম, তেমনটা হলে আমার জন্যে খুবই ভালো হবে।

একটা ডায়রি বের করে সেখানে বিষয়টা টুকে নিলেন মিসেস টোম।

এবারে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করলাম তাকে। "ওসামু নোনোগুচি আর কুনিহিকো হিদাকার সম্পর্কের ব্যাপারে কিছু জানা আছে আপনার?"

"ওহ, ততদিনে তো আপনি স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন।"

"কুনিহিকো হিদাকা যখন পুরষ্কারটা জেতেন।"

"আমার আসলে ঠিক মনে নেই যে তখন এখানে ছিলাম কি না। সাহিত্য সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখা হয়নি কখনোই। পুরষ্কার-টুরষ্কার তো দূরের ব্যাপার।"

"নোনোগুচি যদি স্কুলে সবাইকে ঘটা করে না বলতো, তাহলে আমিও জানতাম না। বন্ধু পুরষ্কার জেতায় খুবই খুশি হয়েছিল সে।"

"সেই সময়ে কি মি. নোনোগুচি আর হিদাকার মধ্যে যোগাযোগ ছিল? এই ব্যাপারে কিছু জানা আছে আপনার?"

"আমি নিশ্চিত নই, তবে থাকার সম্ভাবনা কম। তবে কিছুদিন পরে দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ হয়।"

"কতদিন পর? দুই-তিন বছর?" সেক্ষেত্রে হিদাকার সাথে সাত বছর আগে দেখা হয়েছিল নোনোগুচির, যেমনটা দাবি করেছিল সে।

"হ্যাঁ, ওরকমই হবে।"

"মি. নোনোগুচি কি হিদাকার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতো?"

"কী রকম আলোচনা?"

"যেকোন ধরণের। তার স্বভাব চরিত্র কেমন, সে মানুষ হিসেবে কেমন। কিংবা তার লেখা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেছিল হয়তো।"

"তার স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলেছিল কি না,তা মনে নেই। কিন্তু মি. নোনোগুচি প্রায়ই হিদাকার লেখার ধরণ নিয়ে অভিযোগ জানাতেন।"

"ওনার উপন্যাসগুলো পছন্দ ছিল না নোনোগুচির? বিশেষ কোন ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়েছিল কি?"

"ওই ঘুরে ফিরে একই কথা। মি. হিদাকা সাহিত্য বোঝেন না। তার চরিত্রগুলো বাস্তবসম্মত হয়না। বইগুলোর গুণগত মান ভালো না।"

ওসামু নোনোগুচির মুখে হিদাকার লেখা নিয়ে এরকম কিছু শুনিনি। যে ব্যক্তি হিদাকার উপন্যাসগুলোকে নিজের লেখার মডেল হিসেবে ব্যবহার করে, তার মুখে এরকম কথা একদমই মানানসই না।

"পছন্দ না হওয়া সত্ত্বেও হিদাকার বই পড়তো সে? আবার গিয়ে দেখাও করেছে?"

"হ্যাঁ, করেছে। আমার ধারণা এক প্রকার আক্ষেপ থেকেই ওই কথাগুলো বলতো নোনোগুচি।"

"আক্ষেপ?"

"মি. নোনোগুচি নিজেও তো লেখক হতে চাইত। কিন্তু তার ছেলেবেলার বন্ধু সেই প্রতিযোগীতায় হারিয়ে দেয় তাকে। চাইলেও হিদাকার কাজগুলোকে অস্বীকার করতে পারেনি সে। হয়তো অবচেতন মনেই ভাবত–'এগুলো আর এমন কি? আমি এর চেয়ে ভাল লিখতে পারি।' "

এরকম কিছু কল্পনা করা তুলনামূলক সহজ আমার জন্যে।

"নিভে যাওয়া অনলের জন্যে যখন পুরষ্কার জিতলেন হিদাকা, তখন ওসামু নোনোগুচির প্রতিক্রিয়া কি ছিল, মনে আছে আপনার?"

"আমি যদি বলি তার চেহারাটা হিংসায় বিকৃত হয়ে যেতে দেখেছিলাম, সেটাই বোধহয় বেশি মুখরোচক খবর হবে। কিন্তু সত্যি বলতে তাকে গর্বিতই মনে হয়েছিল।"

এই তথ্যটার সম্ভাব্য অর্থ অনেক কিছুই হতে পারে। তবে তথ্যটা দরকারি, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নোনোগুচির কোন প্রেমিকার ব্যাপারে কিছু জানতে না পারলেও একদম খালি হাতে ফিরে যেতে হচ্ছে না। সময় দেয়ার জন্যে মিসেস টোমকে ধন্যবাদ জানালাম।

প্রয়োজনীয় আলাপ শেষ হবার পর আমার প্রাক্তন সহকর্মী জানতে চাইল যে শিক্ষকতার চাকরি ছাড়ার পর কেমন আছি, নতুন চাকরি কেমন চলছে। কোনমতে বিষয়টা এড়িয়ে গেলাম, এই ব্যাপারে কথা বলতে আমার আসলে ভালো লাগে না।

সে-ও বোধহয় বুঝলো ব্যাপারটা, খুব বেশি চাপাচাপি করলো না। কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে বলল, "বুলিয়িং" কিন্তু এখনও একটা সমস্যা।"

"সেই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। "খবরের বুলিয়িং বিষয়ে যখনই কিছু দেখায়, মনোযোগ দিয়ে দেখি আমি। কারণ সেই সময়কার ব্যর্থতা এখনও তাড়া করে বেড়ায় আমাকে।

কফিশপ থেকে বের হয়ে যে যার পথ ধরলাম।

***

মিসেস টোমের সাথে দেখা হবার দিনেই ছবিটা হাতে এলো আমাদের। নোনোগুচির অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি চালাতে গিয়ে এটা খুঁজে পেয়েছে মাকিমুরা।

হাতসুকো নামের সেই নারীর বিষয়ে তথ্যের আশায় আবারো নোনোগুচির বাড়িতে এসেছিলাম আমরা। আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কোন ছবি পাওয়া যায় কি না, সেটা খুঁজে দেখা। আমি এক প্রকার নিশ্চিত ছিলাম ছবির ব্যাপারে। যে ব্যক্তি অ্যাপ্রন আর নেকলেসটা ওরকম যত্ন সহকারে রেখে দিয়েছে, সে অবশ্যই ছবিও যত্ন করে রাখবে। কয়েকটা অ্যালবাম চোখে পড়লো আমাদের, কিন্তু সেগুলোর একটাতেও সঠিক বয়সের কাউকে খুঁজে পাইনি।

"নোনোগুচি ছবি কেন রাখবেন না?" বিশ্রাম নেয়ার ফাঁকে মাকিমুরাকে জিজ্ঞেস করি আমি।

"হয়তো কোন ছবি নেই তার কাছে। সাধারণত একসাথে কোথাও ঘুরতে গেলে স্মৃতি ধরে রাখার জন্যে ছবি তোলে যুগলরা। কিন্তু নোনোগুচি তো বোধহয় ওনিকাওয়া যেতে পারেনি। সেজন্যে ছবি নেই।"

"আসলেই? ভ্রমণ সংক্রান্ত কাগজপত্র যে ড্রেসারে রেখে দিয়েছে, নিদেনপক্ষে একটা ছবি তো তার তোলারই কথা।"

অ্যাপ্রনটার উপস্থিতি প্রমাণ করে যে সে মহিলা এক সময় নিয়মিত আসত এই বাড়িতে। আমরা জানি যে তার একটা ক্যামেরা আছে। সুতরাং, মহিলা যখন এখানে আসত, তখন একটা ছবি তুলতেই পারে সে।

"সেক্ষেত্রে," একটু ভেবে বলে মাকিমুরা, "আমরা ছবিটা খুঁজে পাচ্ছি না কারণ ওটা কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে।"

"ঠিক এটাই ভাবছিলাম আমি। কিন্তু লুকাবে কেন? তার বাসায় যে পুলিশ আসবে এটা তো সে জানত না, তাই না?"

"আরেকটা রহস্য।"

ঘরটায় তল্লাশি চালাচ্ছিল এই সময় নোনোগুচির বলা একটা কথা মাথায় খেলে গেল আমার। সেদিন হাসপাতালে সে বলেছিল তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র যেন তল্লাশির নাম করে নষ্ট না করি। বিশেষ করে বইগুলো।

নোনোগুচির অফিস রুমটার একপাশের দেয়াল জুড়ে বইয়ের তাক। ডিটেক্টিভ মাইমুরা এবং আমি নিজেদের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক করে বইগুলো ভাগাভাগি করে নিলাম। এরপর প্রতিটা বইয়ে একদম শুরুর পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত খুঁজতে লাগলাম। ছবি, চিঠি, চিরকুট–যে কোন কিছু থাকতে পারে এখানে।

প্রায় দু'ঘন্টার মত সময় লাগল আমাদের। লেখকদের বাসায় বই বোঝাই থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। খুঁজতে খুঁজতে পিসার হেলানো টাওয়ারের মতন বইয়ের হেলানো টাওয়ার বানিয়ে ফেললাম আমরা দু'জনই।

একটা পর্যায়ে গিয়ে মনে হলো যে ভুল বুঝেছিলাম আমি। যে ছবিটা দেখার জন্যে এত কষ্ট করতে হবে, সেই ছবিটা কেন রাখবে কেউ? নিশ্চয়ই এমন কোথাও রাখবে, যেখান থেকে বের করে দেখতে বেশিই ঝক্কি পোহাতে হবে না।

মি. নোনোগুচির ওয়ার্ড প্রোসেসরটা যে টেবিলে রাখা, সেটার দিকে এগোলো মাকিমুরা। এমন ভঙ্গিতে চেয়ারে বসলো যেন লেখালেখি শুরু করবে। "ধরো আমি আমার নতুন উপন্যাসটা লিখছি, এসময় তার কথা মনে হলো। সেক্ষেত্রে ছবিটা তো কাছাকাছিই রাখবো," ওয়ার্ড প্রসেসরটার ঠিক পাশের খালি জায়গাটার দিকে দেখাল মাকিমুরা।

"এমন একটা জায়গাও হতে পারে যেটা সহজে চোখে পড়বে না, কিন্তু হাত বাড়ানো দূরত্বে থাকবে।"

আশপাশে নজর বুলায় মাকিমুরা। সামনেই একটা ডিকশনারি, যেটার ভেতরে অনেকগুলো বুকমার্ক রেখে দিয়েছে নোনোগুচি। হেসে সেটার দিকে হাত বাড়ালো মাকিমুরা। ওর অনুমান একদম সঠিক। পাঁচটা বুকমার্কের মধ্যে একটা হচ্ছে কম বয়সি এক নারীর ছবি। রাস্তার পাশে একটা রেস্তোরার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। সাদা কালো দাবার ছকের মত নকশার একটা ব্লাউজ আর সাদা স্কার্ট তার পরনে।

তার পরিচয় বের করতে খুব বেশি কষ্ট করতে হলো না। রাই হিদাকাকে দেখাতেই চিনে ফেলল। তরুণীর নাম হাতসুমি হিদাকা–কুনিহিকো হিদাকার মৃত স্ত্রী।

"হাতসুমির বিয়ের আগে নাম ছিল শিনোদা," আমাদের উদ্দেশ্যে বলে সে। "প্রায় বারো বছরের সংসার ছিল ওদের। পাঁচ বছর আগে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার আগ অবধি বিবাহিত ছিল ওরা। আমার সাথে হিদাকার যখন পরিচয় হয়, ততদিনে মারা গেছে হাতসুমি। কিন্তু অ্যালবামগুলোতে ওর ছবি এতবার দেখেছি যে চেহারা মুখস্থ হয়ে গেছে।"

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ওই অ্যালবামগুলো আমরা দেখতে পারবো কি না। "আমার কাছে নেই তো অ্যালবামগুলো। হিদাকার সাথে আমার বিয়ের পরপরই ওগুলো সহ হাতসুমির অন্যান্য সব জিনিসপত্র তার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল ও। কানাডাতে আমরা যা যা পাঠিয়েছে সেখানে হয়তো কিছু জিনিস থাকতে পারে, আমি নিশ্চিত নই আসলে। তবুও খুঁজে দেখব। কানাডা থেকে ফেরত আসছে সবকিছু। কয়েকদিনের মধ্যেই জাপানে পৌছে যাবে।"

অ্যালবামগুলো কেন ফেরত পাঠালেন হিদাকা তা জানতে চাইলাম।

ভ্রুকুঁচকে গেল রাইয়ের। "আমার কারণেই হয়তো। কিন্তু, সত্যি বলতে ছবিগুলো থাকলেও আসলে আমার কোন সমস্যা হতো না। বারো বছর কিন্তু লম্বা সময়। প্রাক্তন স্ত্রীর কিছু স্মৃতিচিহ্ন রাখতেই পারত ও কিন্তু রাখেনি হিদাকা, এমনকি এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোনদিন কোন কথাও হয়নি। কে জানে, হাতসুমির কথা মনে হলেই হয়তো খারাপ লাগে ওর। আর আমিও কখনো বিষয়টা নিয়ে কিছু বলিনি। এমন নয় যে হাতসুমিকে নিয়ে কোন প্রকার হিংসা কাজ করে আমার মধ্যে। আসলে কখনো দরকারই হয়নি এই ব্যাপারে কথা বলার।"

আমার কাছে মনে হলো রাই হিদাকা একটু বেশিই চেষ্টা করছে এই বিষয়ে নিজেকে নির্মোহ প্রমাণ করার। তবে তার কোন দরকার ছিল না। তার বক্তব্যে কোন কিছু অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক ঠেকেনি আমার কাছে। তবে আমাদের কাছে তার স্বামীর প্রাক্তন স্ত্রী'র ছবি কিভাবে এলো তা জানতে চাইলো সে। কেসের সাথে ছবিটার কোন সম্পর্ক আছে কি না, সেটাও জিজ্ঞেস করলো।

"এই ব্যাপারে আমরা এখনও নিশ্চিত নই আসলে," বললাম। "আসলে

ছবিটা বেশ অপ্রত্যাশিত একটা জায়গা থেকে হাতে এসেছে, তাই ভাবলাম একটু খোঁজখবর নেই।"

"অপ্রত্যাশিত জায়গা বলতে কী বোঝাচ্ছেন?"

বুঝলাম যে ভুল করে ফেলেছি। "মাফ করবেন, কিন্তু এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।"

তবে রাই হিদাকা ততক্ষণে অন্য ব্যাপারে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। হঠাৎই বিস্ময় ভর করলো তার চেহারায়। "মি. নোনোগুচি কিছুদিন আগে বেশ অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করেছিল আমাকে।"

"কী প্রশ্ন?"

"আমাদের ভিডিওটেইপগুলো কোথায়, সেটা জানতে চেয়েছিল।"

"ভিডিওটেইপ?"

"ভেবেছিলাম হিদাকা যে ছবিগুলো সংগ্রহ করেছে, সেগুলোর কথা বলছে। কিন্তু আমার ধারণা ভুল ছিল। আসলে হিদাকা লেখার রিসার্চের জন্যে যে ভিডিওগুলো দেখত, সেগুলোর কথা জানতে চায় সে।"

"উপন্যাস লেখার জন্যে যে ভিডিওগুলো দেখতেন মি. হিদাকা?"

"হ্যাঁ। রিসার্চের জন্যে কোথাও গেলে প্রায়ই ভিডিও করে আনত হিদাকা।"

"মি. নোনোগুচিকে কি বলেছিলেন আপনি?"

"বলি যে টেপগুলো খুব সম্ভবত কানাডায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। গোছগাছের সময় কাজ সংক্রান্ত সবকিছু হিদাকা নিজের হাতে সামলেছিল। তাই আমি আসলেই জানতাম না।"

"নোনোগুচি কি বলেছিল এটা শুনে?"

"বলেছিল কানাডা থেকে জিনিসগুলো ফেরত আসলে তাকে জানাতে। সে নাকি তার নিজের কাজ সংক্রান্ত কিছু টেপ ধার দিয়েছিল হিদাকাকে।"

"টেপগুলো কিসের সেই ব্যাপারে কিছু বলেনি নোনোগুচি?"

মাথা ঝাঁকিয়ে মানা করে দিলো রাই হিদাকা। "আপনার কি মনে হয়, হাতসুমির ভিডিও ওগুলো?"

এই ব্যাপারে কোন মন্তব্য করলাম না। শুধু বলে রাখলাম টেপগুলো

ফেরত আসলে আমাকে জানাতে। শেষ প্রশ্নটা করলাম এরপর। "এটা বাদে মি. নোনোগুচি এমন কোন কিছু কি জিজ্ঞেস করেছিল আপনাকে, যেটা অদ্ভুত শোনায়?"

কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর মুখ খুলল রাই হিদাকা। "কুনিহিকোর শেষকৃত্যে নয়, নোনোগুচি বেশ কিছুদিন আগে জিজ্ঞেস করেছিল হাতসুমির কথা। তবে শুধুমাত্র একবার।"

"কি জিজ্ঞেস করেছিল?"

"দুর্ঘটনাটার ব্যাপারে।"

"ওহ। দুর্ঘটনার ব্যাপারে আবার কি কথা।"

"এবারেও কথা বলার আগে দ্বিধা ভর করলো রাইয়ের চেহারায়। তবে নিজেকে দ্রুত সামলে নিল সে। "বলেছিল, তার ধারণা ওটা নিছক কোন দুর্ঘটনা ছিল না।"

এটা হেলাফেলা করার মত কোন কথা নয়। তাকে খুলে বলতে বললাম ব্যাপারটা।

"সেটাই তো সমস্যা। এই বিষয়ে আর কথা বাড়ায়নি নোনোগুচি। হিদাকা কিছুক্ষণের জন্যে ঘর থেকে বের হয়েছিল, সেই সুযোগে মন্তব্যটা করে। কথাটা কেন উঠেছিল, সেটা ভুলে গেছি। কিন্তু শব্দগুলো মাথায় গেঁথে আছে।"

কথাটা শুনে অবাক হলাম না। কারো হবু বউকে এই ধরণের কিছু বলা আসলেও অস্বাভাবিক।

"যদি ওটা 'নিছক কোন দুর্ঘটনা' না হয়, তাহলে কি হয়েছিল? আপনি কি বলেছিলেন?"

"আমি জিজ্ঞেস করি যে এমন একটা কথা কেন বলল সে। তখন তার চেহারা দেখে মনে হয় মুখ ফসকে বলে ফেলেছে কথাটা। আমাকে বিষয়টা ভুলে যেতে বলে অনুরোধ করে যেন হিদাকাকে কিছু না জানাই।"

"আপনি কি আপনার স্বামীর সাথে এই বিষয়ে কোন আলাপ করেছিলেন?"

"আসলে, বলিনি। যেমনটা আপনাকে আগেও বলেছি, হাতসুমিকে নিয়ে

কখনোই খুব একটা কথা হতো না আমাদের মধ্যে। আর এমন একটা বিষয় নিয়ে হুটহাট কথাও বলা যায় না।"

এই বিষয়ে দ্বিমতের কোন সুযোগ নেই।

***

তবুও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ছবিটা আমরা হাতসুমি হিদাকাকে আগে থেকে চেনে এমন কয়েকজনকে দেখালাম–যে সম্পাদকদের কুনিহিকোর বাসায় নিয়মিত যাতায়াত ছিল এবং প্রতিবেশীদের। তাদের প্রত্যেকেই নিশ্চিত করলো ছবিটা হাতসুমির।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে হিদাকার প্রাক্তন স্ত্রী'র ছবি কেন নিজের কাছে রাখবে নোনোগুচি। তাও ওরকম একটা জায়গায়?

এখানে খুব বেশি ভাবনা চিন্তার কিছু নেই। যার অ্যাপ্রন অ্যাপার্টমেন্টটায় পাওয়া গেছে, নেকলেসটা যাকে উপহার দেয়ার জন্যে কেনা হয়েছিল, ওনিকাওয়ায় নোনোগুচির সম্ভাব্য সহযাত্রী আর কেউ নয়, কুনিহিকো হিদাকার প্রাক্তন স্ত্রী হাতসুমি হিদাকা। ভ্রমণের কাগজপত্রে হাতসুমি নামটা বদলে হাতসুকো লেখা হয়েছে। সেই সময় হিদাকার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল সে, অর্থাৎ নোনোগুচির সাথে তার সম্পর্কটাকে পরকীয়া বলা যায়। এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে তাদের সম্পর্কটা তৈরি হয়েছিল সাত বছর আগে হিদাকা এবং নোনোগুচির আবারো দেখা হওয়ার পর।

আমি এখন মোটামুটি নিশ্চিত যে হিদাকাকে খুন করার মোটিভের সাথে এই ব্যাপারটা জড়িত। ওসামু নোনোগুচি কুনিহিকো হিদাকার গোস্টরাইটার হিসেবে কাজ করছিল এই থিওরিতে ফিরে যাওয়া যাক। সব প্রমাণ সেদিকেই নির্দেশ করছে, কেবলমাত্র নোনোগুচির মোটিভ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। টাকা পয়সা লেনদেনের কোন প্রকার প্রমাণ আমরা খুঁজে পাইনি। তাছাড়া বেশ কয়েকজন সম্পাদকের সাথে কথা বলে যা বুঝেছি, সাহিত্য জগতে সাফল্য এনে দিতে পারে এরকম কোন লেখার দাবি একজন লেখকের পক্ষে এভাবে ছেড়ে দেওয়া আসলেই বড় কঠিন। হোক সেটা টাকার জন্য।

কিন্তু এমনটা কি হতে পারে যে, নোনোগুচির কোন প্রকার ঋণ ছিল হিদাকার কাছে?

আর এখানেই কোন একভাবে হাতসুমি হিদাকা ঘটনার সাথে জড়িয়ে আছে। এটা বোঝার জন্য শার্লক হোমস হতে হবে না যে হিদাকা তাদের দুজনের অবৈধ সম্পর্কের বিষয়ে জেনে গিয়েছিল। ওসামু নোনোগুচিকে সে বাধ্য করত উপন্যাসগুলো লিখতে। বিনিময়ে মুখ বন্ধ রাখবে সে। কিন্তু সেক্ষেত্রে হাতসুমির মৃত্যুর পরেও কেন লেখা থামায়নি নোনোগুচি?

ওসামু নোনোগুচি আর হিদাকাদের মধ্যে আসলে কি হয়েছিল, সেই বিষয়ে খোঁজ-খবর নিলেই কেবলমাত্র সত্যটা জানা যাবে হয়তো।

এছাড়া রাই হিদাকাকে হাতসুমির মৃত্যু নিয়ে নোনোগুচির বলা ওই কথাটাও ভুলে গেলে চলবে না। এমন একটা কেন বলল সে?

সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, হাতসুমির মৃত্যুর ব্যাপারে আরো খোঁজ খবর নিব। ডাটাবেজে একটা সার্চ করে জানলাম পাঁচ বছর আগে মার্চ মাসে মারা যায় সে। রাত এগারোটার দিকে বাসার পাশের দোকান থেকে একটা জিনিস কিনতে যাওয়ার পথে ট্রাক মেরে দেয়। দুর্ঘটনাটা যেখানে ঘটে, সেখানে বেশ তীক্ষ্ণ একটা বাঁক ছিল, যে কারণে হাতসুমিকে দেখতে পায়নি চালক। বৃষ্টি হচ্ছিল সেই রাতে। রাস্তায় কোন জেব্রা ক্রসিংও ছিল না।

আদলতে বিচারল বলেন যে ট্রাক ড্রাইভারের অমনোযোগীতার কারণেই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে। এই ধরণের কেসে সচরাচর যা বলা হয় আরকি। কিন্তু নথিপত্র অনুযায়ী ড্রাইভার লোকটা কখনো দোষ স্বীকার করেনি। তার ভাষ্যমতে হাতসুমি নাকি হঠাৎ লাফ দিয়ে তার ট্রাকের সামনে এসে পড়েছিল। পথচারীদের রাস্তায় গাড়িচাপা দেয়ার পরে বেশিরভাগ চালকই এই একই কথা বলে। ট্রাফিক পুলিশেরাও এই অজুহাত শুনতে শুনতে ক্লান্ত। এই কেসের ক্ষেত্র চালক যদি সত্যি কথা বলেও থাকে, দুর্ভাগ্যবশত অন্য কেউ সেই মুহূর্তে রাস্তায় উপস্থিত ছিল না। সুতরাং তার কথা সত্যি না মিথ্যে তা যাচাই করার কোন উপায় নেই।

তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম ট্রাক চালকের কথাই ঠিক। সেক্ষেত্রে নোনোগুচির বক্তব্য বিবেচনায় নিলে দুটো সম্ভাবনা দাঁড়ায়। আত্মহত্যা অথবা খুন।

খুন করার জন্যে কেউ যদি আসলেও ধাক্কা দিয়ে থাকে হাতসুমিকে, তাকে অবশ্যই দেখতে পাওয়ার কথা ট্রাক চালকের। তেমনটা হলে আদালতে সেই ব্যক্তির কথা অবশ্যই উল্লেখ করতো সে।

এখানে যৌক্তিক অনুমান এটাই বলে যে নোনোগুচির ধারণা হাতসুমি আত্মহত্যা করেছে।

কিন্তু এই ভাবনাটাই বা তার মাথায় আসবে কেন? তার কাছে কি কোন প্রমাণ ছিল? হাতসুমি কোন বিদায়ী চিঠি বা চিরকুট পাঠিয়েছিল তাকে? নাকি ওসামু নোনোগুচি জানত কোন একটা কারণে আত্মহত্যার চিন্তাভাবনা করছে হাতসুমি? হয়তো তাদের পরকীয়াই সেই কারণ।

হয়তো হাতসুমির স্বামী জেনে ফেলেছিল পরকীয়ার ব্যাপারে। হিদাকা তাকে ছেড়ে চলে যাবে এই ভয়েই কি সে আত্মহত্যা করেছিল?

মোদ্দা কথা, আমাকে হাতসুমির ব্যাপারে আরও তথ্য জোগাড় করতে হবে।

চিফের অনুমতি জোগাড় করে মাকিমুরাকে সাথে নিয়ে তার বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। শিনোদাদের বসবাস ইয়োকোহামার কানাযাওয়া ওয়ার্ডে, বনেদি এক পাড়ায়। বাড়ির সামনে বিশাল বাগান। কানাযাওয়া পাহাড়ি এলাকা, গাড়ি বেশ সাবধানে চালাতে হয়।

আমি শুনেছি হাতসুমির বাবা-মা দুজনেই বেঁচে আছেন। তবে সেদিন তার বাবা বাইরে ছিলেন, তাই কেবল মার সাথেই কথা হলো। ছোটখাটো গড়নের, পরনের পোশাক একদম পরিপাটি। ভদ্রমহিলার নাম ইউমি শিনোদা।

আমাদের দেখে খুব একটা অবাক হলেন না তিনি। বরং বললেন যে আমাদের আসতে এত দেরি হয়েছে দেখেই বিস্মিত হয়েছে। কুনিহিকো হিদাকার হত্যাকান্ডের খবর সংবাদপত্রের প্রকাশিত হবার পর থেকেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন।

জানতে চাইলাম প্রয়াত কন্যার স্বামীর সম্পর্কে তার ধারণা কেমন ছিল।

"লেখকরা যেমন হয়, একটু খামখেয়ালী ধরনের। দ্রুত মেজাজ হারাতো। হাতসুমি একবার আমাকে বলেছিল কাজ নিয়ে কোন ঝামেলায়

পড়লে মেজাজ একদম সপ্তমে চড়ে থাকতো হিদাকার। তবে আমার মতে স্বামী হিসেবে চমৎকার ছিল ও। চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিত সব বিষয়ে। ভদ্রমহিলা কথাগুলো মন থেকে বলছেন নাকি স্রেফ বলার জন্যে বলছেন তা বুঝতে পারছি না। বয়স্ক মানুষদের, বিশেষ করে নারীদের মাথায় কি ঘুরছে তা আন্দাজ করা মুশকিল।

মহিলার ভাষ্যমতে কুনিহিকো হিদাকা এবং হাতসুমির পরিচয় হয়েছিল একটা ছোটখাটো বিজ্ঞাপনী সংস্থায় চাকরি করার সময়। সেখান থেকে একটা প্রকাশনীতে চাকরি নিগে চলে যায় কুনিহিকো হিদাকা। এর কিছুদিনের মধ্যেই দু'জনে বিয়ে করে। তার অল্প কয়েকদিন পরেই সেরা তরুণ লেখকের পুরষ্কারটা পায় হিদাকা। তখন চাকরি ছেড়ে লেখালেখিতে পুরোপুরি মনোনিবেশ করে সে।

"ঘনঘন চাকরি বদলায়, এমন কারো হাতে মেয়েকে তুলে দেয়ার ব্যাপারে একটু সন্দিহান ছিলাম আমি আর আমার স্বামী। তবে ওদের কখনো টাকা-পয়সা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়নি। আর একবার যখন হিদাকার উপন্যাসগুলো বেস্টসেলারের তালিকায় উঠে যায়, মেয়ের ভালো থাকা নিয়ে আমাদের মন থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তাও দূর হয় চিরতরে। কিন্তু দুর্ঘটনাটা...আপনার যতই টাকা থাকুক না কেন, ভাগ্যের হাত থেকে নিস্তার নেই।"

মিসেস শিনোদার চোখের কোণে পানি জমলেও আমাদের সামনে কাঁদলেন না তিনি। পাঁচ বছর লম্বা সময় একজনের মানুষের পক্ষে শোক সয়ে নেয়া শেখার জন্যে।

"দোকানে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি, তাই তো?" বললাম।

"কুনিহিকো তেমনটাই জানিয়েছিল আমাদের। হাতসুমি নাকি স্যান্ডউইচ কেনার রুটি কিনতে বেরিয়েছিল।"

"ট্রাক ড্রাইভারের দাবি হাতসুমি হঠাৎ লাফ দিয়ে রাস্তার মাঝে এসে পড়েছিলেন।"

"সেটাই তো শুনেছি। কিন্তু আমার মেয়ে এরকম অস্থির স্বভাবের

কখনোই ছিল না। তার চরিত্রের সাথে ভীষণ বেমানান ব্যাপারটা। তবে ও যেখান দিয়ে রাস্তা পার হবার চেষ্টা করেছিল সেটা ভীষণ বিপজ্জনক একটা জায়গা। বাঁকের কারণে আড়াল থেকে দেখা যায় না কিছু। আর হাতসুমিও তাড়াহুড়ায় ছিল।"

"দুর্ঘটনার আগে কুনিহিকো হিদাকার সাথে ওনার সম্পর্ক কেমন যাচ্ছিল?"

এই প্রশ্নটা শুনে বেশ অবাক হলেন মিসেস শিনোদা। "ঠিকঠাকই তো। একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

"বিশেষ কোনো কারণ নেই। অনেক সময় দুর্ঘটনার সম্মুখীন ব্যক্তিরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের কোন কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকার কারণে চারপাশে মনোযোগ দিতে পারে না," দ্রুত জবাব দিলাম।

"আমার যতদূর মনে আছে সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল। নতুন একটা উপন্যাসের কাজে হাত দিয়েছিল কুনিহিকো। তাই মাঝে মাঝে কিছুটা নিঃসঙ্গ বোধ করত হাতসুমি, এর বেশি কিছু না।"

"উনি নিজে বলেছিলেন আপনাকে কথাগুলো?" নিঃসঙ্গতার কারণেই অমনোযোগী থাকার ফলে দুর্ঘটনাটা হয়েছে, এটা আমার মনে হয় না। "দুর্ঘটনার আগে প্রায়ই দেখা হত আপনাদের?"

"না ওর স্বামী নতুন একটু উপন্যাসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তাছাড়া আমাদের এখানে খুব বেশি একটা আসতো না ও। যা কথা হওয়ার ফোনেই হত।"

"তার কণ্ঠস্বর শুনে কি কোন কিছু অন্যরকম লেগেছিল আপনার কাছ?"

মাথা ঝাঁকিয়ে মানা করে দিলেন বয়স্ক মহিলা, এরপর দ্বিধান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "কুনিহিকোর খুন হবার সাথে এসবের কোন সম্পর্ক আছে?"

জবাবে বললাম যে যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। সাধারণত একটা খুন হবার পর ভিকটিমের পরিচিত সবার সাথে কথা বলা রুটিনের মধ্যেই পরে একজন ডিটেক্টিভের জন্য। ব্যাখ্যা তার মনঃপুত হয়েছে বলে মনে হয় ন।

"আপনার মেয়ে কি কখনো আপনার সাথে ওসামু নোনোগুচির ব্যাপারে কথা বলেছিলেন?" এবারে মূল বিষয়ে আলাপ শুরু করলাম।

"বলেছিল ওদের বাসায় মাঝে মাঝে আসতো সে। উনি তো বোধ হয় কুনিহিকোর বন্ধু, লেখক হবার ইচ্ছে ছিল যার?"

"আর কিছু?"

"আসলে এসব তো অনেক আগের কথা। ইদানিং সবকিছু মনে রাখতেও কষ্ট হয়। তবে এর বেশি আর কিছু ও আমাকে বলেনি খুব সম্ভবত।"

এসময় আমার মনে হলো ওসামু নোনোগুচির সাথে যদি আসলেই পরকীয়ার সম্পর্ক থাকতো হাতসুমির, তবে নিজের মাকে নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে কিছুই বলবে না সে।

"আমি শুনেছি ওনার বেশিরভাগ ব্যবহার্য জিনিস এখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছ। সেগুলো একটু দেখা যাবে কি?"

বিস্ময় ভর করল ভদ্রমহিলার চোখ। "খুব বেশি কিছু নেই আমাদের এখানে।"

"যে কোন কিছুই আমাদের কাজে আসতে পারে।"

"আমি আসলে বুঝতে পারছি না কিভাবে..."

"উনি কি নিয়মিত ডায়রি লিখতেন?"

"না, এই অভ্যাস ছিল না ওর।"

"কোন ছবির অ্যালবাম?"

"হ্যাঁ, সেটা আছে..."

"আমরা কি ওগুলো একটু দেখতে পারি?"

"অ্যালবামগুলোয় কেবল কুনিহিকো আর হাতসুমির ছবি।"

"ওটাই যথেষ্ট আমাদের জন্যে। একবার চোখ বুলালেই বুঝে যাব যে আমাদের কাজে কিছু আসবে কি না।"

ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই ভাবছেন আমি এসব নিয়ে কেন কথা বলছি। ওসামু নোনোগুচির বিষয়টা জানালে এসব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো না আমাকে। কিন্তু চিফ অনুমতি দেননি এই ব্যাপারে কিছু বলার।

চোখে সন্দেহ নিয়েই ভিতরে ঢুকে অ্যালবামগুলো নিয়ে আসলেন তিনি। একটা প্লাস্টিকের বক্সে রাখা ছিল ওগুলো।

আমি আর ডিটেক্টিভ মাকিমুরা সবগুলো অ্যালবাম ঘাটতে শুরু করলাম। অ্যালবামগুলোর এই মহিলাই যে ওসামু নোনোগুচির বাসায় খুঁজে পাওয়া ছবিটার সেই মহিলা, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই।

প্রতিটা ছবিতে টাইম স্ট্যাম্প দেয়া এক কোণায়, তাই নোনোগুচির সাথে হাতসুমির সম্ভাব্য যে সময়ে পরকীয়া চলছিল, সেই সময়ের ছবিগুলোও চোখে পড়লো। আমি ছবিগুলো দেখে কোন সূত্র পাওয়া যায় কি না সেটা বোঝার চেষ্টা করলাম।

এবারেও মাকিমুরাই প্রয়োজনীয় ছবিটা খুঁজে পেল। নীরবে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো সেটা। কেন এই ছবিটা বিশেষভাবে ওর নজর কেড়েছে, তা বুঝতে অসুবিধা হলো না আমার।

মিসেস শিনোদার কাছে অনুমতি চাইলাম অ্যালবামটা এক সপ্তাহ আমাদের হেফাজতে রাখার। সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকালেও মানা করলো না সে।

"হাতসুমির আর কিছু কি আপনার কাছে আছে?"

"কিছু গয়নাপাতি আর জামাকাপড়। কুনিহিকো যেহেতু দ্বিতীয় বিয়ে করেছে তাই খুব সম্ভবত এগুলো আর ওই বাসায় রাখতে চায়নি।"

"চিঠি বা পোস্টকার্ড জাতীয় কিছু নেই?"

"না মনে হয়, আপনারা চাইলে আমি আরেকবার ঠিকমতো দেখতে পারি।"

"ভিডিওটেইপ? ক্যাসেট টেপের মত ছোটগুলো?" হিদাকা তার রিসার্চের সময় ৮ মিলিমিটারের ছোট টেপগুলোই ব্যবহার করতো।

"এরকম কিছু আমার চোখে পড়েনি।"

"হাতসুমির কাছের কোন বন্ধুর নাম মনে আছে আপনার?"

"কাছের কেউ?" বলে ভেতরে চলে গেলেন ভদ্রমহিলা। কিছুক্ষণ পর একটা নোটবুক হাতে নিয়ে ফিরলেন।

"এটা আমাদের অ্যাড্রেস বুক। ওর কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের নাম এখানে আছে।"

তিনজনের নাম আমাদের বেছে দিলেন তিনি। দুজন হাতসুমির স্কুলের বন্ধু আর একজন সেই বিজ্ঞাপনী সংস্থার প্রাক্তন সহকর্মী, যেখানে হিদাকা আর হাতসুমি একসাথে কাজ করতো। তিনজনই নারী। তাদের নামধাম আর যোগাযোগের নম্বর টুকে নিলাম আমি।

***

অফিসে ফিরেই হাতসুমির বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ শুরু করে দিলাম আমরা। স্কুলের বান্ধবী দু'জনের সাথে কথা বলে জানা গেল যে বিয়ের পর তাদের খুব বেশি যোগাযোগ হয়নি হাতসুমির সাথে। তবে শিজুকো নাগানো নামের সহকর্মীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল হাতসুমির। এমনকি মারা যাওয়ার কিছুদিন আগেও ফোনে কথা হয়েছিল দুজনের।

শিজুকো আমাদের বলে, "প্রথম দিকে কিন্তু হাতসুমির নজরে পড়েননি মি. হিদাকা। একদম প্রথম দর্শনে প্রেম, এটাও বলা যাবে না। কিন্তু মি. হিদাকা বারবার চেষ্টা করতে থাকেন। পেশাগত ব্যক্তিগত–কোন ক্ষেত্রেই ব্যর্থতা মেনে নেয়ার মত মানুষ ছিল না সে। আর হাতসুমিও একটু লাজুক আর চুপচাপ স্বভাবের। একটা পর্যায়ে গিয়ে আর মানা করতে পারেনি। মি. হিদাকা যখন তাকে প্রোপোজ করে, তখনও হয়তো পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল না হাতসুমি, কিন্তু তাকে রাজি করিয়ে ফেলে মি. হিদাকা।

"তবে আমি এটা বলবো না যে বিবাহিত জীবনে অসুখি ছিল ও। ভালোই দিন কাটাচ্ছিল, যদিও মি. হিদাকা পুরোপুরি লেখক বনে যাওয়ার পর একটু মানসিক চাপের মধ্যে পড়ে যায়। লেখালেখির সময় তো নির্দিষ্ট কোন রুটিন মানত না হিদাকা, তাই আরকি। তবে কখনো অভিযোগ করেনি ও।"

ফোন কলটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে শিজুকো বলে, "আমিই ফোন দিয়েছিলাম ওকে, যদিও বলার মতন ওরকম কিছু ছিল না। ও সবসময় যেভাবে কথা বলে, সেভাবেই বলছিল। ঠিক কি কথা হয়েছিল, পুরোপুরি মনে নেই আমার। তবে খুব সম্ভবত কোথায় শপিংয়ে যাওয়া যায় আর নতুন

রেস্তোরাঁর বিষয়ে আলাপ করেছিলাম। আসলে এ রকম টুকটাক ব্যাপারেই কথা হতো আমাদের মধ্যে। দুর্ঘটনার খবরটা শুনে অবাক হয়েছিলাম খুব। এতটাই যে কাঁদতেও ভুলে গেছিলাম। তবে শেষকৃত্যে গিয়েছিলাম।"

শেষকৃত্যে কুনিহিকো হিদাকাকে কেমন দেখেছিল, সেটা জিজ্ঞেস করলাম এবারে। "এরকম লোকেরা তো খুব একটা আবেগ দেখায় না কখনোই। কিন্তু সেদিন মি. হিদাকাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন। আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না পাঁচ বছর হয়ে গেল ওর মারা যাওয়ার।"

ওসামু নোনোগুচির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে বলল–"কে? হিদাকার খুনি? সে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এসেছিল কি না আমার মনে নেই। অনেক লোক হয়েছিল অনুষ্ঠানে। পুলিশ এতদিনে হাতসুমির বিষয়ে খোঁজ-খবর নিচ্ছে কেন? খুনের সাথে এসবের কোন সম্পর্ক আছে?"

***

হাতসুমির মা'র সাথে কথা বলার দু'দিন পর ডিটেক্টিভ মাকিমুরা আর আমি গেলাম ওসামু নোনোগুচির সাথে হাসপাতালে দেখা করতে। প্রথমে তার ডাক্তারের সাথে কথা বললাম।

ভদ্রলোককে দেখে মনে হলো ঝামেলার মধ্যে আছেন। তিনি চাইছেন যত দ্রুত সম্ভব সার্জারিটা সেরে ফেলতে কিন্তু রোগি সম্মতি দিচ্ছে না। নোনোগুচির মতে সার্জারিতে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা কম হলে সে বরং সার্জারি না করে আরো কয়েকটা দিন বেশি বাঁচতে চায়।

"সার্জারির কারণে তার মৃত্যু তরান্বিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে?" ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম।

"আসলে এসব ব্যাপারে কিছুই বলা যায় না। সম্ভাবনা তো আছে অবশ্যই।"

কিন্তু ফলাফল ভালো হবার সম্ভাবনাও যেহেতু আছে, ডাক্তার যত দ্রুত সম্ভব সার্জারিটা করে ফেলতে চান।

এই কথা শুনে আমরা নোনোগুচির ঘরে গেলাম। বসে বসে একটা বই পড়ছিল সে। আগের তুলনায় একটু শুকিয়ে গেলেও চেহারা দেখে তুলনামূলক ভালোই মনে হলো তাকে।

"আপনাদের কথাই ভাবছিলাম। অনেকদিন দেখা নেই," চেহারা দেখে খানিকটা সুস্থ মনে হলেও গলার স্বরে কোন জোর নেই ওসামুর।

"আরেকটা অনুরোধ আছে আমার," বললাম।

ওসামু নোনোগুচিকে কিছুটা হতাশ মনে হলো। "আপনি দেখি নাছোড়বান্দা। নাকি ডিটেক্টিভ হতে হতে এরকম বনে যায় সবাই?"

জবাবে কিছু না বলে ডিকশনারিতে খুঁজে পাওয়া হাতসুমির ছবিটা দেখালাম তাকে।

একদম জমে গেল নোনোগুচির চেহারা। মুখ খুলেও বন্ধ করে নিল। পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

"হ্যাঁ?" কোনমতে বলল কিছুক্ষণ পরে। বুঝতে পারলাম যে এই একটা শব্দ বলতেই তার বেগ পেতে হচ্ছে।

"কুনিহিকো হিদাকার প্রাক্তন স্ত্রীর ছবি আপনার কাছে কেন? তাও ওরকম একটা জায়গায়?"

জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকলো নোনোগুচি। ভাবছে। তার চেহারা থেকে নজর হটালাম না আমি।

"আমার কাছে হাতসুমির ছবি আছে তো কি হয়েছে?" জানালা থেকে মুখ না ফিরিয়ে অবশেষে বলল সে। "আপনার কেসের সাথে এটার কোন সম্পর্ক নেই ডিটেক্টিভ।"

"সেই সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে দিন।"

"আপনাদের সত্যি কথাটাই বলছি।"

"তাহলে এই ছবিটার ব্যাপারে কিছু বলুন দয়া করে।"

"বলার মত কিছু তো নেই। ওর একটা ছবি তুলেছিলাম কিন্তু দেওয়ার কথা মনে ছিল না, ব্যস।"

"আর সেটা বুকমার্ক হিসেবে ব্যবহার করতেন?"

"সামনে পড়ে ছিল, এজন্য হয়তো।"

"ছবিটা কোথায় তোলা? আর কবেকার। দেখে তো মনে হচ্ছে রাস্তার পাশের কোন রেস্তোরাঁ।"

"ভুলে গেছি। ওদের দুজনের সাথে প্রায়ই ঘুরতে বের হতাম আমি। নানা রকম উৎসবে যেতাম। ওরকমই কোন একটায় হয়তো।"

"কিন্তু ছবিতে তো কেবল হাতসুমিকেই দেখা যাচ্ছে। কোন দম্পতির সাথে কোথাও ঘুরতে গিয়ে কেবলমাত্র একজনের ছবি তোলার বিষয়টা একটু কেমন না?"

"দেখতেই তো পাচ্ছেন একটা রেস্তোরায় তোলা। হিদাকা হয়তো বাথরুমে গিয়েছিল।"

"সেবারের আর কোন ছবি আছে আপনার কাছে?"

"আমি তো বুঝতেই পারছি না এটা কোথাকার ছবি, আপনাকে কিভাবে বলবো? কোন একটা অ্যালবামে আছে হয়ত। আমি ফেলেও দিতে পারি সেটা। যা-ই হোক, আমার মনে নেই।"

বোঝাই যাচ্ছে যে ভীষণ অস্বস্তিতে ভুগছে ওসামু নোনোগুচি।

আরো দুটো ছবি বের করে তার সামনে রাখলাম। ছবি দুটোই ফুজি পর্বতের সামনে তোলা। "এগুলোর কথা তো আপনার মনে আছে, তাই না?"

ছবিগুলোর দিকে তাকালো সে। খেয়াল করলাম, একবার ঢোক গিলল।

"আপনার একটা অ্যালবাম থেকেই ছবিগুলো খুঁজে পেয়েছি আমরা। এগুলোর কথা নিশ্চয়ই ভোলেননি?"

মাথা ঝাঁকাল নোনোগুচি। "কবে যে তোলা হলো ঠিক মনে পড়ছে না।" তার কণ্ঠ দুর্বল শোনাচ্ছে এখন।

"দুটো ছবিই এক জায়গায় তোলা। আপনার মনে নেই কোথায়?"

"সরি।"

"ফুজি নদী। একদম ঠিকঠাকভাবে বললে ফুজি নদীর পাশে রেস্ট এরিয়াতে। আপনাকে একটু আগে দেখানো ছবিটাও সেখানেই তোলা। পেছনের সিড়িটা দেখুন, একদম এক।"

কিছু বলছে না ওসামু নোনোগুচি।

আমার দলের বেশ কয়েকজন তদন্ত কর্মকর্তা রেস্ট এরিয়াটা চিনতে

পেরেছে। তাদের কাছ থেকে এই কথা শুনে শিজুকা প্রিফেকচারের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ করি আমরা। তারাই একদম সঠিক জায়গাটা খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

"বাথরুমের ছবিগুলোর ব্যাপারে কিছু না বলতে পারলেও, ফুজি পর্বতের ছবিগুলোর ব্যাপারে তো কিছু না কিছু মনে আছে আপনার? ওগুলো আপনার অ্যালবাম থেকেই পেয়েছি আমরা। আচ্ছা, বলুন তো, এই ছবিগুলো রাখলেও হাতসুমির ছবিটা আপনি অ্যালবামে রাখেননি কেন?"

"সরি, এই ছবিগুলোর কথা মাথাতেই ছিল না আমার।" ইচ্ছেকৃত বোকা সেজে থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

"আরো একটা ছবি আছে আমার কাছে," বলে শেষ ছবিটা জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করলাম আমি। এই ছবিটাই হাতসুমির মা'র কাছ থেকে ধার নিয়েছিলাম আমরা। "এখানে কিছু একটা নিশ্চয়ই আপনার পরিচিত ঠেকবে?"

ছবিটার দিকে তাকাতে দেখলাম তাকে। তিনজন মহিলা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। একটু হলেও বড় হয়ে যেতে দেখলাম নোনোগুচির চোখজোড়া।

"মি. নোনোগুচি?"

"সরি, আপনি কি বলতে চাইছেন তা বুঝতে পারছি না," ফ্যাসফেসে শোনাচ্ছে তার কণ্ঠস্বর।

"আসলেই? মাঝের জন যে হাতসুমি হিদাকা, সেটা তো বুঝতে পারছেন?"

নোনোগুচির নীরবতাকে সম্মতি হিসেবে ধরে নিলাম।

"তার পরনের অ্যাপ্রনটা দেখুন। দাবার ছকের মত নকশা যেটার। আপনার অ্যাপার্টমেন্টে ঠিক এরকম একটা অ্যাপ্রনই পেয়েছিলাম আমরা।"

"তো?"

"তো ওনার ছবি নিজের কাছে রাখার যেনতেন একটা ব্যাখা দিয়ে পার পেয়ে গেলেন। কিন্তু অ্যাপ্রনটা নিজের কাছে রাখার ব্যাপারে কী বলবেন? আপনার সাথে হাতসুমি হিদাকার কোন সম্পর্ক ছিল কি না?"

গোঙিয়ে উঠল নোনোগুচি।

"দয়া করে সত্যটা খুলে বলুন। আপনাকে আগেও বলেছি, যত লুকোবেন, তত গভীরে গিয়ে ঘাঁটতে হবে আমাদের। আর এটা মাত্র সময়ের ব্যাপার যে সংবাদমাধ্যমের কেউ কিছু একটা জেনে কাল্পনিক রিপোর্ট ছেপে ফেলল। এমনটা নিশ্চয়ই কাম্য নয় আপনার। আমাদের এখনই সব খুলে বলুন, তাহলে আর ওরকম কিছু হবেনা ।"

আমার কথা আদৌ কোন প্রভাব ফেলল কি না তার মনে তা বোঝা যাচ্ছিল না। শুধু এটুকু বুঝতে পারছিলাম যে ভীষণ দোটানায় পড়ে গেছে।

অবশেষে মুখ খুলল সে, "আমার আর হাতসুমির মধ্যে যা-ই ঘটুক কেন, তার সাথে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই। এ কথা পরিষ্কার বলে দিতে চাই আপনাদের।"

এতক্ষণে কাজের কথা বলছে সে। "তাহলে আপনি স্বীকার করে নিচ্ছেন যে ওনার সাথে আপনার সম্পর্ক ছিল?"

"এটাকে ঠিক সম্পর্ক বলা যায় কি না জানি ন। কিছু সময়ের জন্য আমরা একে অপরের একটু কাছাকাছি হয়েছিলাম। কিন্তু আবেগটুকু ফিকে হয়ে যেতেও সময় লাগেনি।"

"আরম্ভটা হয়েছিল কখন?"

"আমার ঠিক মনে নেই। হিদাকাদের ওখানে যাওয়া আসা শুরু করার পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে হয়তো। খুব জ্বরে পড়েছিলাম সেবার। হাতসুমি আমাকে দেখতে আসত মাঝে মাঝে। ওভাবেই শুরু।"

"কতদিন চলেছিল এসব?"

"দুই-তিন মাস। যেমনটা বললাম, দু'জনই খুব দ্রুত আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। এসব ক্ষেত্রে যেমনটা হয়, প্রথম দিকে খুব জোশ থাকে, এরপর উত্তাপ হারায় সম্পর্ক।"

"কিন্তু এরপরেও তো হিদাকাদের সাথে সম্পর্ক রাখেন আপনি। অন্য কেউ হলে তো দূরে দূরে থাকত।"

"এমন কিন্তু নয় যে আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা বিষিয়ে উঠেছিল। একে অপরকে দেখতে পারতাম না। ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলি আমরা, সিদ্ধান্ত

নেই যে সম্পর্কটা আর আগে বাড়ানো উচিত হবে না। তবে সেটা যে পুরোপুরি সম্ভব হয়েছিল, তা বলবো না। ওদের বাড়িতে গেলে একজন আরেকজনের দিকে তাকাতাম। তবে বেশিরভাগ সময়েই বাইরে থাকত ও। ইচ্ছেকৃতভাবেই এড়ানোর চেষ্টা করতো আমাকে। ও সেই সময় দুর্ঘটনার সম্মুখীন না হলে আমি নিজেই যাওয়া বন্ধ করে দিতাম হয়তো।"

একবার মুখ খোলার পর আর থামছে না নোনোগুচি। কিছুক্ষণ আগের সেই ভয় বা দ্বিধার ছিটেফোঁটাও উপস্থিত নেই। তার অভিব্যক্তি খেয়াল করলাম আমি। বোঝার চেষ্টা করছি কতটুকু সত্য বলছে সে আর কতটুকু মিথ্যা। যদিও চেহারায় মিথ্যে বলার কোন ছাপ আপাতদৃষ্টিতে চোখে পড়ছে না। কিন্তু আশ্চর্য রকমের শান্ত মনে হ"ছ তাকে।

"অ্যাপ্রনটার পাশাপাশি একটা নেকলেস আর ট্রাভেল এজেন্সির ফর্মও পেয়েছি আমরা।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "একসাথে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম আমরা। কিন্তু সেই পরিকল্পনা আর বাস্তবায়িত হয়নি।"

"কেন?"

"কারণ আমাদের মনে হয়নি কাজটা ঠিক হবে। এটাও বলতে হবে?"

"আর নেকলেসটা?"

"যেমনটা আপনারা সন্দেহ করছেন, ওটাও ওকে দেয়ার জন্যেই কিনেছিলাম। কিন্তু সিদ্ধান্ত বদল করি শেষ মুহূর্তে। অন্যান্য পরিকল্পনাগুলোর মতনই।"

"আপনার কাছে কি হাতসুমি হিদাকার আর কিছু আছে?"

কিছুক্ষণ ভাবলো ওসামু নোনোগুচি। "একটা নেকটাই খুঁজে পাবেন আমার ড্রয়ারে। ওটা ছিল ওর পক্ষ থেকে দেয়া উপহার। এছাড়া কাবার্ডে একটা মেইসান চায়ের কাপ আছে। আমার বাসায় এলে ওটা ব্যবহার করতো ও। কাপটা আমরা একসাথে গিয়ে কিনেছিলাম।"

"কোত্থেকে কিনেছিলেন?"

"গিনজার কোথাও থেকে। কিন্তু দোকানটার নাম বা অবস্থান মনে নেই আমার।"

পরের প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করার আগে নিশ্চিত হলাম যে ডিটেক্টিভ মাকিমুরা তথ্যটা টুকে নিয়েছে। "আপনি বোধহয় এখনও হাতসুমি হিদাকাকে ভুলতে পারেননি, তাই না?"

"ভুলিনি, কিন্তু এসব অনেক আগের বিষয়।"

"তাহলে স্মৃতিচিহ্নগুলো এত যত্ন করে রেখে দেয়ার কারণ কি?"

"এত 'যত্ন' করে রেখে দিয়েছি, এটা একটু বেশি বেশি বলে ফেলছেন। ওগুলো কখনো ফেলে দেয়া হয়নি–এই যা।"

"আর ছবিটা? বুকমার্ক হিসেবে যেটা ব্যবহার করছিলেন সেটাও ফেলে দেয়ার কথা ভুলে গেছেন?"

এই প্রশ্নটার জবাব দিতে বেগ পেতে হলো নোনোগুচিকে। কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল সে, "আপনারা যা খুশি ভেবে নিতে পারেন, খুনের সাথে সবার কোন সম্পর্ক নেই।"

"আপনি নিশ্চয়ই মি. সেকিকাওয়ার উপর অনেক রেগে আছেন?"

"এটা আবার কে?"

"তাতসুয়ো সেকিকাওয়া। নামটা তো শুনেছেন নিশ্চয়ই?"

"না। কখনো শুনিনি।"

তার এই জবাবেরই অপেক্ষা করছিলাম আমি। এবারে বললাম,"হাতসুমিকে যে ট্রাকটা ধাক্কা দিয়েছিল সেটা উনিই চালাচ্ছিলেন।"

নোনোগুচিকে দেখে মনে হলো ভীষণ অবাক হয়েছে। "ওহ। এই নাম ছিল লোকটার।"

"আপনি যেহেতু লোকটার নামও জানেন না, তাহলে কি আমরা ধরে নেব তার প্রতি আপনার কোন রাগ নেই।"

"না, ওরকম কিছু না। রাগ তো অবশ্যই আছে। নামটা ভুলে গিয়েছিলাম আরকি। তাছাড়া রাগ করলে তো আর ওকে ফিরিয়ে আনা যাবে না।"

"আপনি ড্রাইভারের উপর রাগ করে নেই...এর অর্থ কি এটা হতে পারে যে আপনি ধরেই নিয়েছিলেন যে ঘটনাটা আত্মহত্যা।"

বিস্ফোরিত নয়নে আমার দিকে তাকালো নোনোগুচি। "একথা কেন বলছেন?"

"কারণ আপনি একজনকে এই কথা বলেছিলেন।"

আমি বোধহয় যথেষ্ট হেয়ালি করতে পারিনি, কারণ নোনোগুচির চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সে বুঝে গেছে কার কথা বলছি।

"দেখুন"আসলে আবেগের বশে কথাটা বলে ফেলেছিলাম। খুব বেশি ভাবনা চিন্তা করিনি। এটাকে ধরে বসে থাকবেন না দয়া করে।"

"সে যা-ই হোক, আমি কারণটা জানতে চাইছি।"

"ভুলে গিয়েছি। আপনাকে যদি এখন আমি পাঁচ বছর আগেকার কোন কথার ব্যাখা জিজ্ঞেস করি, আপনি নিজেও বলতে পারবেন না।"

এরপর আর কথা বাড়ালাম না। তবে বের হয়ে আসার আগে নোনোগুচিকে বলে দিলাম যে শিঘ্রই আবার দেখা হবে আমাদের।

ব্যক্তিগতভাবে, মনে মনে আমি খুশিই ছিলাম। তার সাথে কথোপকথনে এটুকু মোটামুটি নিশ্চিত হতে পেরেছি যে সে আসলেই ধরে নিয়েছে হাতসুমি আত্মহত্যা করেছে।

***

আমরা কেবলই অফিসে ফিরেছি এসময় রাই হিদাকার ফোন এলো। কানাডা থেকে জিনিসগুলো ফেরত এসেছে আর সেখানে কুনিহিকো হিদাকার অনেকগুলো ভিডিও টেপ খুঁজে পেয়েছে সে। সাথে সাথে বের হয়ে পড়লাম আমরা।

"এই কয়টা টেপই পেয়েছি," ৮ মি.মি.র সাতটা টেপ সাজিয়ে রাখা টেবিলে। প্রতিটার রেকর্ডিং টাইম এক ঘন্টা। একটা একটা করে ওগুলো হাতে নিয়ে দেখলাম আমি। প্রতিটায় ক্রমান্বয়ে এক থেকে সাত পর্যন্ত নম্বর দেয়া। কোনটারই আলাদা কোন শিরোনাম নেই। ভেতরে কি আছে তা মনে রাখার জন্য নিজস্ব কোন পদ্ধতি ছিল কুনিহিকো হিদাকার।

রাইকে জিজ্ঞেস করলাম সে ভিডিওগুলো দেখেছে কি না।

দেখেনি সে। "আসলে দেখার কথা মনে হতেই কেমন জানি লাগছিল।"

জিজ্ঞেস করলাম ওগুলো ধার নিতে পারি কি না। জবাবে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"এখানে আরেকটা জিনিস আপনারা বোধহয় দেখতে চাইবেন।" লাঞ্চ বক্সের মত দেখতে চৌকো একটা কাগজের বক্স টেবিলের উপরে রাখল রাই। "হিদাকার কাপড় চোপড়ের সাথে রাখা ছিল এটা। আমি আগে কখনো দেখিনি। অর্থাৎ ও নিজেই রেখেছিল সেখানে।"

বক্সটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে ঢাকনা খুললাম। ভেতরে প্লাস্টিকে মোড়ানো একটা ছুরি। হাতলটা বেশ শক্তপোক্ত গড়নের। আর ফলাটা কমপক্ষে বিশ সেন্টিমিটার লম্বা। বক্সটা হাতে তুলে নিলাম। ওজন আছে জিনিসটার।

রাইকে জিজ্ঞেস করলাম সে জানে কি না ছুরিটা কি কাজে ব্যবহৃত হয়। মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলো, "আমার কোন ধারনাই নেই, সেজন্যই তো আপনাদের দেখাচ্ছি। কুনিহিকো এটার কথা আগে কখনো আমাকে বলেনি।"

ব্যাগের ভেতর দিয়েই ছুরিটা ভালো মত দেখলাম। খুব একটা ব্যবহৃত মনে হচ্ছে না। তবে এটা নিশ্চিত যে জিনিসটা নতুন নয়। কুনিহিকো হিদাকার পাহাড়ে চড়ার অভ্যাস ছিল কি না জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে রাই বলল, তার জানামতে ছিল না।

টেপসমেত ছুরিটা হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে নিয়ে এলাম। এরপর ভাগাভাগি করে দেখতে শুরু করলাম ভিডিওগুলো। আমার ভাগ্যে যে টেপটা পড়েছে সেটায় কিয়োটোর ঐতিহ্যবাহী নানারকম শিল্পের ভিডিও। দক্ষ শিল্পীদের হাতের কাজ, তাদের জীবনধারা-এসব। মাঝে মাঝে নিচু স্বরে কিছু মন্তব্য করছে একজন। এটা যে কুনিহিকো হিদাকার কণ্ঠস্বর, তা বুঝতে সমস্যা হলো না। আমার টেপটার আশি ভাগ জুড়ে এই ভিডিও, বাকিটা ব্ল্যাংক।

অন্যান্য ডিটেক্টিভদের সাথে কথা বলে বুঝলাম তাদের টেপগুলোতেও কম বেশি এই একই জিনিস ছিল। হিদাকার লেখালেখির জন্যে রিসার্চ ফুটেজ বাদে আর কিছু নেই টেপগুলোতে। তবুও আরেকবার নিশ্চিত হবার জন্যে টেপগুলো বদলাবদলি করে দেখলাম আমরা। কিন্তু মতামত বদলাল না।

আমি ধরেই নিয়েছিলাম ওসামু নোনোগুচি টেপগুলো দেখতে চায় কারণ সেখানে হয়তো বিশেষ কিছু আছে। যেটা সে চায় না আমরা দেখি। কিন্তু একটা টেপেও এমন কিছু চোখে পড়লো না যেটার সাথে নোনোগুচির কোন সম্পর্ক থাকতে পারে।

অফিসের সবাইই যে কমবেশি হতাশ, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। একটা সুযোগ হারিয়েছি আমরা। এই সময় ফরেনসিক থেকে খবর এলো যে ছুরিটার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করেছে তারা।

তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, "ফলার একপাশে উঁচুনিচু কিছু দাগ প্রমাণ করে যে ব্যবহৃত হয়েছে জিনিসটা। কিন্তু সেই ব্যবহারের পরিমাণ খুব বেশি নয়। রক্তের উপস্থিতির কোন প্রমাণ মেলেনি। তবে হাতের ছাপ পাওয়া গেছে, যেটা ওসামু নোনোগুচির বলে আমরা প্রমাণ পেয়েছি।"

এটা অবাক করার মত ব্যাপার। কুনিহিকো হিদাকা ওসামু নোনোগুচির আঙ্গুলের ছাপ সমেত একটা ছবি এত যত্ন করে রেখে দেবে কেন। আর বিষয়টা সে তার স্ত্রীর কাছ থেকেও লুকিয়েছে, কেন? একটা জবাব আমার মাথায় ঘুরতে শুরু করলো। কিন্তু সেটা এতটাই বিস্ময়কর যে আরো প্রমাণাদি ছাড়া কাউকে কিছু বলার সাহস পেলাম না।

একবার ভাবলাম নোনোগুচিকে জিজ্ঞেস করবো ছুরিটার কথা। কিন্তু আপাতত বাদ দিলাম চিন্তাটা। ডিপার্টমেন্টের সবার মাথায় একই চিন্তা ঘুরছে। এই ছুরিটাই হবে আমাদের বাজির শেষ দান।

***

পরদিন রাই হিদাকার কাছ থেকে আরেকট ফোন পেলাম আমরা। আরেকটা টেপ খুঁজে পেয়েছে সে। আমরা দ্রুত ছুটলাম সেটা নিয়ে আসতে।

"এটা দেখুন," বলে সমুদ্রের ডাক বইটার একটা পেপারব্যাক কপি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলো রাই। এই বইটা আগেও আমাকে দিয়েছিল।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম।

"প্রচ্ছদটা উল্টান।"

তার কথামতো কাজ করলাম। হাঁ হয়ে গেল ডিটেক্টিভ মাকিমুরার মুখটা। আমারও প্রায় একই দশা। ভেতরে বইয়ের পাতাগুলো কেটে বের করে ফেলা হয়েছে। সেখানে গুজে রাখা হয়েছে একটা ভিডিও টেপ। মনে হচ্ছে কোন পুরনো গোয়েন্দা সিনেমার দৃশ্য ।

"এই বইটা অন্যান্য বইগুলোর থেকে আলাদা একটা বক্সে রাখা ছিল। এজন্যেই কৌতুহলী হয়ে খুলে দেখেছিলাম," আমাদের বলল রাই হিদাকা।

জানতে চাইলাম তার বাসায় এই মুহূর্তে কোন ভিডিও প্লেয়ার আছে কি না। সে হ্যাঁ বলাতে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ওখানেই ভিডিওটা দেখো। অফিসে ফেরত নিয়ে গিয়ে সময় নষ্ট করার কোন মানে নেই।

প্রথমেই একটা পরিচিত জানালা আর বাগানের ভিডিও ভেসে উঠল পর্দায়। হিদাকাদের উঠানের দৃশ্য। ভিডিওটা রাতে করা হয়েছে তাই চারপাশ। আলোর উৎস বলতে মাঝখানের জানালাটা।

পর্দার একদম কোনায় দেখা যাচ্ছে ভিডিওটা কবে এবং কখন করা হয়েছিল। সাত বছর আগের ডিসেম্বর মাস।

উত্তেজনার বশে সামনে ঝুঁকে বসলাম। কি দেখতে পাবো সেই চিন্তা ঘুরছে মাথায়। কিন্তু ক্যামেরায় কেবল জানালা আর বাগানটাই দেখা যাচ্ছে। ঘটছে না কিছুই।

"ভিডিওটা ফাস্ট ফরোয়ার্ড করে একটু এগিয়ে দেই?"

এবারে নাটকের কুশীলব পা রাখলেন মঞ্চে।

অধ্যায় ৫

স্বীকারোক্তি
ওসামু নোনোগুচির বয়ান

গত কয়েক দিন ধরেই আমার মনে হচ্ছিল এর পরেরবার যখন ডিটেক্টিভ কাগা হাসপাতালে আমার সাথে দেখা করতে আসবে, প্রয়োজনীয় সমস্ত উত্তর হয়তো থাকবে তার কাছে। এমনি এমনি নয়, তার কাজের ধরণ দেখেই এমনটা মনে হয়েছিল আমার। তদন্ত প্রক্রিয়া যাকে বলে একদম নিখুঁত। যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখিবে তাই–নীতিতে বিশ্বাসী। কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে খুব বেশি সময় নষ্ট করে না। চোখ বন্ধ করলেই যেন তার পায়ের শব্দ শুনতে পাই। সে হাতসুমির ব্যাপারে জেনে ফেলার পরেই একরকম হাল ছেড়ে দেই আমি। চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকি। কপালে যা আছে সেটাই হবে।

ওর চোখের দ্যুতিতে সবসময় চিকচিক করে কৌতূহল। জীবনে কার কি করা উচিত, সেই বিষয়ে মন্তব্য করার অভ্যেস কখনোই ছিল না আমার, কিন্তু শিক্ষকতার পেশা থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্তটা নিয়ে ভালোই করেছিল ও।

পরের বার কাগা উপস্থিত হলো দুটো প্রমাণ নিয়ে। প্রথম প্রমাণটা হচ্ছে একটা ছুরি, আর দ্বিতীয়টা একটা ভিডিওটেইপ। এটা শুনে অবাক হলাম যে টেপটা সমুদ্রের ডাক বইয়ের ভেতরের পাতাগুলো কেটে বসানো ছিল। *হিদাকা ছাড়া আর কার মাথা থেকে এই বুদ্ধি বেরুবে*, ভাবলাম আমি। অনেকে হয়তো ভাববে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই কাজটা করেছিল ও। যদি ওটা অন্য কোন বই হতো তাহলে ডিটেক্টিভ কাগার পক্ষেও এত দ্রুত সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হত না।

"এই টেপের দৃশ্যগুলো ব্যাখা করুন, দয়া করে। যদি আরেকবার

দেখতে চান, আমি নিশ্চিত হাসপাতালে খুঁজে একটা ভিডিও প্লেয়ার পাওয়া যাবেই।"

পুরো সত্যটা আমার মুখ থেকে বের করার জন্যে এটুকুই বলার দরকার ছিল তার। ভিডিওটেইপে যে দৃশ্যটা দেখা যাবে, সেটার ব্যাখা দেয়ার জন্যে সত্য কথা না বলে উপায় নেই।

হ্যাঁ, এরপরেও আমি কিছুটা জোরাজুরি করি। জবাব না দিয়ে এড়িয়ে যেতে চাই, কিন্তু তখনও আমি জানতাম, এসব করে কোন লাভ নেই। আমার পিছু ছাড়বে না সে। আমাকে খোলসের ভেতরে ঢুকে পড়তে দেখে সময় নষ্ট না করে নিজের থিওরিটা বলতে শুরু করলো ডিটেক্টিভ কাগা। সে আগে থেকেই আন্দাজ করে রেখেছিল, এরকম কিছু একটা ঘটবে।

একদম শেষটায় উপসংহারের মত করে বলল, "এখন অবধি আমি যা যা বললাম, তার পুরোটাই অনুমান। কিন্তু হিদাকাকে খুন করার পেছনে আপনার মোটিভ খুঁজে বের করতে এটুকুই যথেষ্ট। আপনিই তো বলেছিলেন, চাইলে আমরা নিজেদের মত মোটিভ ভেবে নিতে পারি। সেটাই করেছি।"

ভুল বলেনি ও। সত্যটা স্বীকার করার চাইতে আমার মনে হয়েছিল ওরা কিছু একটা কল্পনা করে নিলেই ভালো। কিন্তু তখন কে জানত, কাগার অনুমান এরকম নির্ভুল হবে?!

"হারিয়েই দিলেন শেষ পর্যন্ত," থকথক করতে থাকা নীরবতার জাল ছিড়ে ফেলে বললাম অবশেষে। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছি যেন আমার বিস্ময়টুকু গোপন থাকে কিন্তু শেষ অবধি তা-ও সম্ভব হলো না।

"এবার কি খুলে বলবেন সব?"

"না বললে কি আপনি এতক্ষণ আমাকে যা যা বললেন তা কোর্টেও বলবেন?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে তো আর কোন কিছু লুকোনোর কোন মানে হয় না। বিড়াল যেহেতু থলে থেকে বেরিয়েই গেছে, সব তথ্য ঠিকঠাকভাবে উপস্থাপিত হলেই ভালো।"

"আমার অনুমানে কোথাও কি কোন ভুল ছিল?"

"খুব বেশি কিছু না। তবুও সম্মান রক্ষার্থে কিছু সংযুক্তির দরকার আছে।"

"আপনার সম্মান?"

মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলাম। "হাতসুমি হিদাকার সম্মান।"

সায় জানিয়ে পাশে বসা ডিটেক্টিভকে তথ্যগুলো টুকে নেয়ার কথা বলল কাগা।

"দাঁড়ান, দাঁড়ান!" বললাম। "কাজটা কি এভাবেই করতে হবে আপনাদের?"

"মানে?"

"অনেক লম্বা কাহিনী। সবকিছু একদম ঠিকঠাক মনে করতে হবে আমাকে। আমি চাইছি না একটানা কথা বলতে গিয়ে গোলমাল পাকিয়ে ফেলতে।"

"রিপোর্টটা লেখা শেষ হলে আপনাকে পড়তে দেব।"

"আমি জানি। কিন্তু স্বীকারোক্তি যদি দিতেই হয়, নিজের ভাষাতে দিতে চাইছিলাম।"

বেশ লম্বা একটা সময় নীরব রইলো ডিটেক্টিভ কাগা। অবশেষে জিজ্ঞেস করলো, অর্থাৎ, আপনি আপনার স্বীকারোক্তি নিজেই লিখতে চাইছেন?"

"আপনি যদি অনুমতি দেন আর কী।"

"ঠিক আছে। আমাদের জন্যেও সেটাতেই সুবিধা। কতক্ষণ লাগবে?"

"একদিন পুরো তো লাগবেই।"

"আগামীকাল সন্ধ্যা নাগাদ আসব আমি।" ঘড়ি দেখে বলল ডিটেক্টিভ কাগা। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল এরপর।

***

আর এভাবেই নিজের স্বীকারোক্তি নিজেই লিখতে বসলাম আমি। লেখাটা এই ভেবে লিখছি যে, এটাই হবে আমার লিখিত শেষ কোন কিছু। আমার চূড়ান্ত কাজ। আর এই চিন্তাটা মাথায় ঢোকার পর মনে হল, একটা শব্দও

বৃথা খরচ করা যাবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা আমাকে মেনে নিতে হবে যে, শব্দ নিয়ে খেলা করার মতো সময় এখন আমার হাতে নেই।

যেমনটা আগেও বলেছি, কুনিহিকো হিদাকার সাথে আমার দেখা হয়েছিল সাত বছর আগে। ততদিনে ওর প্রথম বই প্রকাশিত হয়ে গেছে। আমাদের দেখা হওয়ার দু'বছর আগেই ছোটখাটো একটা প্রকাশনী থেকে সেরা নবীন লেখকের পুরস্কারও বাগিয়ে ফেলেছে। সেই সময় নাগাদ একটা গল্পগ্রন্থ ও তিনটা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে হিদাকার। 'সাহিত্যে নবদিনের সূচনা' ওর লেখা নিয়ে প্রকাশক এমনটাই বলেছিল। অবশ্য কোন নতুন লেখক পেলেই প্রকাশকেরা এটা অনেক আগে থেকেই বলে আসছে।

লাইব্রেরীতে ওর বই বিক্রি শুরু হওয়ার সময় থেকেই আমি খেয়াল করছিলাম সবকিছু। বন্ধু হিসেবে কিছুটা গর্বও হচ্ছিল। তবে অস্বীকার করবো না, ওর সাফল্য দেখে হিংসের পরিমাণটাও কম ছিল না। একদম ছোট থেকে লেখক হবার ব্যাপারে কথা বলতাম আমরা। দুজনেই বই পড়তে অনেক ভালবাসতাম। অনেক বই আদান প্রদান করে পড়া হতো। হিদাকাই আমাকে শার্লক হোমস আর আর্সেন লুপার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। এর বদলে জুল ভার্নের জাদুকরি জগতের ঠিকানা বাতলে দেই আমি।

হিদাকা প্রায়শই গর্ব করে বলতো এদের যে কারো তুলনায় ভালো লেখক হয়ে দেখিয়ে দেবে সে। খুব বেশি বিনয় কোন কালেই ছিল না ওর মধ্যে। তবে বুক ফুলিয়ে এই কথাগুলো না বললেও, আমি নিজেও এই স্বপ্ন দেখতাম। সুতরাং, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন কেন ওর সাফল্যে ঈর্ষা কাজ করতে শুরু করে আমার মনে। যেখানে আমি লেখক হবার সিঁড়ির প্রথম ধাপেই পা রাখিনি, সেখানে ও ইতিমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল।

তবে মন থেকেই অভিনন্দন জানাতে চেয়েছিলাম ওকে। সেই সাথে স্বার্থপরের মতন এটাও ভেবেছিলাম, আমাকেও হয়তো কোন একটা সুযোগ করে দেবে হিদাকা। ওর মাধ্যমে প্রকাশকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবো, দেশের প্রকাশনা শিল্পের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলব–খুব ছোট থেকেই যে স্বপ্নটা বুকে লালন করছি।

তখনই যোগাযোগ করতে চেয়েছিলাম ওর সাথে কিন্তু ভয় পাচ্ছিলাম,

প্রথম বই প্রকাশিত হবার পরপরই যোগাযোগের চেষ্টা করলে হয়তো বিরক্ত হবে। বন্ধুত্ব যতই পুরনো হোক না কেন। তাই নীরবেই উৎসাহ জুগিয়ে যাই ওকে। পত্রিকায় গল্প প্রকাশিত হলে পড়ে ফেলতাম। নতুন উপন্যাস প্রকাশিত হলে কিনতে দেরি করতাম না। এর মাঝে ওর সাফল্য দ্বারা উৎসাহিত হয়ে নিজেও আবার লেখালেখি শুরু করি। এর আগে আমার লেখালেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য পত্রিকায় গল্প প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বেশ কয়েক বছর ধরেই মাথায় নতুন কয়েকটা গল্প ঘুরঘুর করছিল। সেখান থেকেই একটা বেছে নিয়ে লিখতে শুরু। এক আতশবাজির কারিগরিকে নিয়ে গল্প। আমি যেখানে বড় হয়েছি, সেখানকারই এক বুড়োর জীবন দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল গল্পটা। এলিমেন্টারি স্কুলে পড়ার সময় শেষ দুটো বছর তার ওখানে নিয়মিত যাতায়ত ছিল আমার। একথা কখনো ভুলিনি যে কিভাবে জীবনের শেষার্ধে এসে নিজেকে নতুন করে খুঁজে পায় সে। একজন ছাপোষা কেরানি বেড়াতে গিয়ে আতশবাজির প্রদর্শনী দেখে সেটার প্রেমে পড়ে যায়। আমার মনে হয় এই গল্পটাকেই বড় করে উপন্যাসে রূপ দেয়া যায়। সেটার নাম দেই বহ্নিচক্র।

প্রায় দুই বছর পর প্রথম হিদাকাকে চিঠি দেই আমি। বলি ওর সবগুলো বই আমার পড়া হয়ে গেছে। বন্ধুর সাফল্যে ভীষণ গর্বিত। শেষে বলি ওর সাথে দেখা করতে পারলে ভালো লাগবে। আমাকে অবাক করে দিয়ে পরদিনই ফোন দেয় হিদাকা।

আমাদের একসাথে কাটানো শৈশবের কথা ওর স্মৃতিতে মলিন হয়নি। ফোনে কথা বলতে বলতে বুঝতে পারি এলিমেন্টারি স্কুল থেকে পাশ করার পর লম্বা একটা সময় তেমন যোগাযোগই হয়নি আমাদের মাঝে।

"মা'র কাছে শুনেছিলাম তুমি স্কুলে পড়ানো শুরু করেছো। খারাপ না কিন্তু, চাকরি হিসেবে যথেষ্ট ভাল। কোন ঝুঁকি নেই। আমার চেয়ে অন্তত ভালো। আমি তো কোন বোনাসও পাই না। আগামী দিনে কী ঘটবে তা-ও বুঝতে পারি না।" হেসে কথাগুলো বলে ও।

তবে হাসিটা নির্ভার। আমরা দু'জনেই ভালো করে জানতাম জীবনযুদ্ধে

অনেকটাই এগিয়ে গেছে হিদাকা। তবে এটা নিয়ে আমার মধ্যে কোন প্রকার বিবমিষা ছিল না।

দেখা করার পরিকল্পনা করি আমরা। প্রথমে শিনজুকুর একটা ক্যাফেতে কফি খেয়ে চাইনিজ রেস্তোরাঁয় ডিনার। অফিস থেকে সরাসরি চলে যাই হিদাকার সাথে দেখা করতে, স্যুটটাও পাল্টাইনি। ওর পরনে ছিল একটা বোম্বার জ্যাকেট আর জিন্সের প্যান্ট। 'গৎবাধা চাকরি না করার এই এক সুবিধা'–সেই মুহূর্তে একথাই মনে হয়েছিল হিদাকাকে দেখে। কোন এক অদ্ভুত কারণে বিষয়টা মাথায় গেথে যায় আমার।

ফেলে আসা সময় আর পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আলাপ করি আমরা। এক সময় আলোচনা মোড় নেয় ওর উপন্যাসগুলোর দিকে। হিদাকা যখন জানতে পারে যে আমি আসলেই ওর প্রকাশিত সবগুলো কাজ পড়েছি, ভীষণ অবাক হয়। ওর কাছ থেকে নতুন লেখা নেয়ার জন্যে যে সম্পাদকেরা পেছন পেছন ঘুরতো, তারাও নাকি সব লেখা পড়েনি। এবারে আমার অবাক হবার পালা।

সেদিন একদম কথায় পেয়ে বসেছিল ওকে। মুখে খই ফুটছিল অনবরত। কিন্তু আমি বইয়ের বিক্রিবাট্টার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা মাত্র চেহারায় আঁধার ঘনায়।

"তোমার কাছে আর কি লুকোবো। একটা সাহিত্য পত্রিকার সেরা তরুণ সাহিত্যিকের পুরষ্কার জিতলেই রাতারাতি সফল হওয়া যায় না। মানুষের হাতে হাতে তোমার বই পৌঁছাতে হবে। সেটা নিয়ে আলোচনা হতে হবে। হ্যাঁ, পুরষ্কার তোমাকে আগের তুলনায় কিছুটা পরিচিত করে তুলবে পাঠকদের মধ্যে, কিন্তু ওটুকুই। এরপর কি হবে বলা মুশকিল।"

বিষয়টা একটু হতাশাজনক নিশ্চয়ই, ভাবি আমি, *লেখক হিসেবে কিছুটা নাম কামানোর পরপরই বোঝা যায় যে কষ্টের কেবল শুরু।* আমার বিশ্বাস হিদাকাকে তখনও কিছুটা বেগ পেতে হচ্ছিল এসব নিয়ে। অনেকে রাইটার্স ব্লক বিষয়টাকে মেনে নিতে পারে না। আমার মনে হয় ভবিষ্যত নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তায় ভুগছিল ও। অবশ্য তখন সেটা আমি বুঝতে পারিনি।

এরপরেই ওকে খুলে বলি যে আমি নিজেও একটা উপন্যাস লেখার কাজে হাত দিয়েছি। শিঘ্রই সেটা প্রকাশ করারও ইচ্ছে আছে।

"লিখে ফেলেছ নাকি?" জানতে চায় ও।

"না, মানে আসলে, এখনও প্রথম উপন্যাসটা নিয়েই আছি। আশা করি কিছুদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।"

"বেশ তো, শেষ হলে নিয়ে এসো। আমি পড়তে চাই। ভালো লাগলে তোমার সাথে কয়েকজন সম্পাদকের পরিচয় করিয়ে দেয়া যাবে।"

"আসলেই? কী বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ দেব। আমার তো এখনই আবার লিখতে বসে যেতে ইচ্ছে করছে। আসলে আমার এই লাইনে পরিচিত কেউ নেই তো, ভাবছিলাম তরুণ লেখকদের ওসব প্রতিযোগীতায় উপন্যাসের খসড়াটা পাঠিয়ে দিব কি না।"

"আরে, ওগুলোর পেছনে সময় নষ্ট কোরো না। মানদন্ডের কোন ঠিক ঠিকানা নেই। বেশিরভাগ লেখকই ভাগ্যজোরে জিতে যায়। ওদের প্যানেলের যে বিচারক থাকবে, তাদের পছন্দমত না লিখলেই তোমার বই বাদ। ছাপার অক্ষরে তখন আর নিজের নাম দেখতে হবে না।"

"কিছুটা ধারণা আছে।"

"ভেতরের দৃশ্য আরো বাজে। এর চেয়ে সরাসরি সম্পাদকদের সাথে আলাপ করাই ভালো।"

সেদিনকার মত বিদায় নেয়ার আগে ওকে কথা দিলাম যে লেখা শেষ হওয়া মাত্র জানাব।

এবারে মনে মনে একটা ডেডলাইন ঠিক করে নিয়ে আটঘাট বেঁধে লিখতে বসি। এক রাতের মধ্যেই লেখার প্রতি আমার মনোভাব পুরোপুরি পাল্টে যায়। একমাসের মধ্যে শেষ করে ফেলি উপন্যাসের বাকি অংশটুকু। মাঝারি দৈর্ঘ্যের একটা কাজ, দু'শো পাতা হবে বড়জোর।

হিদাকার সাথে যোগাযোগ করে জানাই, বইটা লিখে শেষ করেছি। ও পাঠিয়ে দিতে বললে ফটোকপি করে কুরিয়ার করে দেই। এরপর অপেক্ষার পালা। মনে আছে, সেদিন কাজে গিয়েও কোন কিছুতে মনোযোগ দিতে পারিনি।

কিন্তু হিদাকার পক্ষ থেকে কোন জবাব আসে না। ধরে নেই ও হয়তো ব্যস্ত, সেজন্যে বিরক্তও করিনি। কিন্তু আমার মনের ভেতরে একটা অংশ খুব করে জানতে চাইছিল ওর কাছে উপন্যাসটা কেমন লেগেছে। মাঝে মাঝে বিচিত্র সব চিন্তাও এসে ভর করতো মাথায়। ওগুলো নিয়ে খুব বেশি ভাবতে ইচ্ছে করতো না।

ওর কাছে খসড়াটা পাঠানোর পুরো একমাস পর অবশেষে ফোন দেয়ার সিদ্ধান্ত নেই। হিদাকার জবাব শুনে কিছুটা হতাশ হই, তবে সেটার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ও নাকি তখনও পড়েইনি উপন্যাসটা।

"সরি, কিছু মনে কোরো না, আমি কয়েকটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত এই মুহূর্তে।"

এর জবাবে আমার আর কী-ই বা বলার ছিল। ও একজন পেশাদার লেখক। নিজের পেটটাও তো চালাতে হবে ওকে, নাকি?

"ঠিক আছে, আমার কোন তাড়া নেই। হাতের কাজ শেষ করে নাও তুমি," কেন যে ওকে এই কথাগুলো বলেছিলাম সেদিন, জানি না।

"সরি, হাতের কাজগুলো শেষ হলেই পড়ে ফেলব। শুরুর কয়েক পাতা উল্টিয়েছিলাম। একজন আতশবাজির কারিগরকে নিয়ে লিখেছো, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"মন্দিরের কাছে যে বুড়ো লোকটা থাকত, তাকে নিয়েই গল্প সাজিয়েছ বোধহয়?"

"হ্যাঁ।"

"আমাদের কত স্মৃতি ছিল ওখানে! যাইহোক, আমি আসলেই উপন্যাসটা পড়তে চাই, কিন্তু সময় করে উঠতে পারছি না।"

"তোমার হাতের কাজ শেষ হতে কতদিন লাগতে পারে?"

"আরো প্রায় মাসখানেক। পাণ্ডুলিপিটা আমার সামনেই রাখা আছে। পড়ামাত্র তোমাকে ফোন দিয়ে জানাব।"

ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দেই। আমার মাথায় তখন ঘুরতে থাকে একজন পেশাদার লেখকের জীবন কেমন হয়, এসব নিয়ে চিন্তা। হিদাকার উৎসাহকে ঘুণাক্ষরেও মেকি হয়নি তখন।

আরো এক মাস কেটে যায় এভাবে। কিছু জানায় না ও। কাউকে বারবার বিরক্ত করা আমার স্বভাবের সাথে একদমই যায় না। কিন্তু আমার লেখাটা ওর কেমন লাগলো তা জানতেই হতো। থাকতে না পেরে একসময় আবারো ফোন করি ওকে।

"সরি, এখনও পড়া হয়নি আসলে," হিদাকার মুখে এই কথা শুনে এবার সত্যিই দমে যাই। "যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও বেশি সময় নিয়ে নিচ্ছে হাতের কাজটা। একটু অপেক্ষা করতে পারবে? আমি আসলেও দুঃখিত।"

"আচ্ছা, ব্যাপার না।" সত্যি বলতে, তখন আসলে আমি অপেক্ষা করার মত অবস্থায় ছিলাম না। অন্য একটা বুদ্ধি মাথায় আসে। "তুমি যদি বেশি ব্যস্ত হও, তাহলে অন্য কারো কাছে লেখাটা একটু পাঠাতে পারবে? কোন সম্পাদক?"

গম্ভীর হয়ে ওঠে ওর কণ্ঠস্বর। "সম্পাদকেরা অনেক ব্যস্ত থাকে। লেখাটা ভালো নাকি খারাপ, এসব না জেনে কাউকে কিছু পাঠানো আমার পক্ষ থেকে শোভন হবে না। বিশ্বাস করো, প্রতিদিন প্রায় কয়েক শ' পান্ডুলিপি এসে জমা হয় ওদের কাছে। আমি যদি তাদের সাথে কাউকে পরিচয় করিয়ে দেই, আগে আমার নিজের সেই লেখকের লেখা পড়তে হবে। বুঝতে পারছ কি বলছো? অবশ্য তুমি যদি আমার মতামত না চাও, তাহলে ভিন্ন কথা। চাইলে পান্ডুলিপিটা ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারি।"

এই কথার জবাবে কী বলতাম আমি? "আমি আসলে এরকম কিছু বোঝাতে চাইনি। তোমার ব্যস্ততার কারণেই বললাম।"

"সরি, কিন্তু কোন সম্পাদকের হাতে এরকম কাচা লেখা পড়ার মত সময় নেই। চিন্তা কোরো না...আমিই পড়বো, কথা দিচ্ছি।"

"আচ্ছা...দেখ একটু লেখাটা," বলে লাইন কেটে দেই।

যেমনটা ভেবেছিলাম, আরো সপ্তাহদুয়েক কেটে যাওয়ার পরেও হিদাকার কাছ থেকে কোন ফোন আসে না। আরো একবার হতাশ হতে হবে, এটা মেনে নিয়েই ডায়াল করি ওর নম্বরে।

"হ্যালো, আরে, তোমাকেই ফোন দেয়ার কথা ভাবছিলাম," ওর গলার ঔদাসিন্য শঙ্কা জোগায় আমার মনে।

"পড়েছ?"

"হ্যাঁ, দুই দিন আগে শেষ করলাম।"

তাহলে দুই দিন আগেই কেন ফোন করে জানায়নি এই প্রশ্নটা করা থেকে বিরত করলাম নিজেকে। "কেমন লাগল?"

"আসলে..." কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে যায় কিন্তু কিছু বলে না ও। "ফোনে এসব ব্যাপারে আলোচনা করা কঠিন," অবশেষে মুখ খোলে। "তুমি চলে এসো আমার বাসায়। আলাপ করা যাবে।"

ও যে আমাকে ডেকে পাঠাতে পারে, তা মাথাতেই আসেনি আমার। আমি তো কেবল এটুকু জানতে চাইছিলাম লেখাটা ওর ভালো লেগেছে কি না। এমনি এমনি আমার সময় নষ্ট করছে, তা-ও বলা যায় না। নতুবা বাসায় ডাকতে যাবে কেন? অর্থাৎ, বইটা হয়তো পুরোপুরি পড়েছে ও। বিশেষ কিছু বলতে চায় সেই ব্যাপারে। কিছুটা দোটানা নিয়েই ওর বাসায় যেতে সম্মত হই আমি।

আর এভাবেও হিদাকাদের ওখানে যাওয়া আসার শুরু। এই সামান্য একটা ব্যাপারই যে আমার জীবনটা পালটে দিবে, তা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি।

বাসাটা তখন কেবল কিনেছে ও। চাকরি করার সময় নাকি কিছু টাকা জমিয়েছিল। তাছাড়া আমার ধারণা ওর বাবার কাছ থেকেও উত্তরাধিকার সূত্রে বেশ অর্থ সমাগম হয়েছে। ওর ভাগ্য ভালো, কিছুদিনের মধ্যে বেস্টসেলিং তালিকায় চলে আসে উপন্যাসগুলো। নতুবা বাড়ির মর্টগেজের টাকা দিতে পারত কি না সন্দেহ।

বাসায় প্রথম যাচ্ছি, এই উপলক্ষে এক বোতল হুইস্কি কিনি আমি। দরজায় আমাকে স্বাগত জানালো হিদাকা। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল হাতসুমি।

এখন চিন্তা করলে বুঝতে পারি লোকে প্রথম দর্শনেই প্রেম বলতে আসলে কী বোঝায়। ওকে দেখা মাত্র গলা শুকিয়ে যায় আমার। শিল্পীরা তাদের আঁকাআঁকির জন্যে যেমন অনুপ্রেরণা খুঁজে নেয় প্রেয়সীর মাঝে, সেরকম ছিল ব্যাপারটা। দেজাভুঁ হতে থাকে আমার। মনে হয়, এমন একজনের সাথে দেখা হয়েছে, যার সাথে দেখা হওয়া আমার ভাগ্যেই ছিল। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। কিছু বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলাম।

হিদাকা অবশ্য আমার ক্ষণিকের এই বিহ্বলতা টের পায়নি। হাতসুমিকে কফি বানাবার কথা বলে আমাকে নিয়ে নিজের অফিসে ঢুকে পড়ে ও।

ভেবেছিলাম সরাসরি আমার উপন্যাসটা নিয়ে আলাপ শুরু করবে, কিন্তু কিছুক্ষণ কথা বলার পর মনে হয়ে ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে হিদাকা। তৎকালীন রাজনীতি নিয়ে কিছুক্ষণ আলাপ করি আমরা। আমার শিক্ষকতা কেমন চলছে এই বিষয়ে টুকটাক প্রশ্ন করে ও। এমনকি হাতসুমি কফি নিয়ে আসার পরেও এটাসেটা নিয়ে কথা বলতে থাকে হিদাকা। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করেই বসি আমি, "আমার গল্পটা কেমন লেগেছে? যদি খারাপ লেগে থাকে, তাহলে সরাসরি বলো।"

হাসিটা মলিন হয়ে গেল ওর। "গল্পটা খারাপ না।"

"মানে, খারাপ না আবার ভালোও না?"

"আসলে...হ্যাঁ, তা বলা যায়। ভালো বই একদম শুরু থেকেই পাঠককে চুম্বকের মত টেনে ধরে। রান্নার সাথে যদি তুলনা করি, তাহলে বলা যায়, তোমার উপকরণগুলো সব ঠিকই আছে, কিন্তু রেসিপিটা ভুল।"

"কোন্ অংশটায় সমস্যা? একটু বলবে?"

"চরিত্রগুলো অতটা আকর্ষণীয় না, আর গল্প বলার ধরনটাও...কী বলবো, নিরামিষ ধাঁচের।"

"চরিত্রগুলোর কোন গভীরতা নেই, এটা বলতে চাইছো? গল্পটাও জুতের না?"

"ওরকমই। আমাকে ভুল বুঝো না কিন্তু, কাচা হাতের কারো লেখা উপন্যাস তুলনায় অনেক ভালো। লেখা ঠিক আছে, গল্পের সব উপাদানও আছে কিন্তু উপাদানগুলো যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখাটা একটু কঠিনই হবে। প্রকাশ হবার ক্ষেত্রেও মূল বাঁধা এটাই। কোন বিষয়ের ক্রিয়া-কৌশল জানলেই যে তুমি ভালো একটা প্রোডাক্ট তৈরি করে ফেলতে পারবে, এমন নয় কিন্তু। দিনশেষে সব উপন্যাসই একটা প্রোডাক্ট, ভুলে যেও না।"

সমালোচনা শোনার জন্যে মনে মনে তৈরিই ছিলাম আমি। কিন্তু ও যা বলল, তাতে পুরোপুরি দমে গেলাম। যদি আমার গল্পে নির্দিষ্ট কোন অংশে

ভুল থাকত, তাহলে সেটা ঠিক করা যেত নাহয়। কিন্তু 'পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখতে পারবে না' এটা আবার কি? তোমাকে দিয়ে লেখালেখি হবে না–একভাবে ধরলে এই কথাই বলেছে হিদাকা।

"তাহলে, আমি গল্পটা নিয়ে আরেকটু ঘাটাঘাটি করবো? অন্য কোন দিক দিয়ে সামনে এগোবো এবারে?" বলি আমি। তখনও পুরোপুরি হাল ছেড়ে দেইনি।

মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলো হিদাকা। "এই একটা গল্প নিয়েই পড়ে থাকলে চলবে না। আমি তোমার জায়গায় থাকলে আবার নতুন করে শুরু করতাম সব। নতুবা দেখা যাবে আবারো একই ভুল করছো। আমার পরামর্শ থাকবে এবারে সম্পূর্ণ নতুন কিছু লেখ।"

এরকম কিছু শোনার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু ওর কথা একেবারে ফেলনাও নয়।

জানতে চাই আমি আরেকটা গল্প লিখলে সেটা ও পড়বে কি না।

"আলবত পড়বো," বলে হিদাকা।

পরদিনই লিখতে বসে যাই। এবারে আমার কলম চলছিলই না। প্রথম উপন্যাসটা লেখার সময় নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিয়েছিলাম, কিন্তু এবারে প্রতিটা শব্দ লেখার পর মনে হচ্ছিল কোথাও একটা সমস্যা হয়েছে। মাঝে মাঝে কেবল একটা বাক্য নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিচ্ছিলাম ডেস্কে। এর কারণ হতে পারে লেখার সময় হিদাকার মতামতের বিষয়টা মাথায় ঘোরা। যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে লেখার সাহসটা হারিয়ে ফেলি। হয়তো এটাই একজন পেশাদার আর অপেশাদার লেখকের তফাত।

তবুও, কষ্ট করে লেখা চালিয়ে যাই আমি। এর মাঝে হিদাকাদের বাসাতেও যাওয়া আসা চলতে থাকে। বলা যায় আমাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘ বিরতির পর আবার পুনর্জীবন খুঁজে পায়। একজন পেশাদার লেখকের জীবন নিয়ে স্বভাবতই আগ্রহ কাজ করছিল আমার। আর হিদাকাও নিশ্চয়ই নিজের সম্পাদকদের বাইরে কারো সাথে আড্ডা দিয়ে মজাই পাচ্ছিল। কথায় কথায় একবার আমাকে বলেছিল যে লেখালেখিকেই মূল পেশা হিসেবে নেয়ার পর বাইরের দুনিয়া থেকে নিজেকে কেমন যেন বিচ্ছিন্ন লাগতে শুরু করে ওর।

এখানে স্বীকার করে নেয়া ভালো, ওদের বাড়িতে যাতায়াতের সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটা কারণও ছিল আমার। হাতসুমি। জীবন সঙ্গীনি হিসেবে আমি যেরকম একজন মানুষকে চেয়েছিলাম, ও ছিল ঠিক তাই। আমার জন্যে ওর মুখে সদা আন্তরিক একটা হাসি লেগেই থাকতো। যা-ই পড়তো না কেন, সুন্দর মানিয়ে যেত ওকে। রোজকার পোশাকেও। কখনো অবশ্য একদম সাজগোজ করা অবস্থায় দেখিনি ওকে, তবে সেভাবে যে আরো সুন্দরি দেখাবে, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। হিদাকা হয়তো ওরকম হাতসুমিকেই পছন্দ করত বেশি। কিন্তু আমি যে হাতসুমির প্রেমে পড়েছিলাম–সে ছিল স্নিগ্ধ, মিষ্টি হাসির অধিকারী। বাড়ি ফিরে যাকে দেখলে চিত্ত শান্ত হয়। এরকম সৌন্দর্যের হয়তো স্বপ্নই দেখে যায় অনেক নারী।

একদিন আগে ফোন না করেই চলে যাই আমি। অজুহাত হিসেবে বলি, সেই এলাকায় গিয়েছিলাম একটা কাজে, ভাবলাম দেখা করে যাই। কিন্তু সত্যটা হচ্ছে, একটানা কাজ করার ফাঁকে হঠাৎই ওই হাসিটা দেখার তীব্র বাসনা অনুভব করি আমি। ওখানে গিয়ে দেখি হিদাকা বাসায় নেই। তখন নিজেকে মনে মনে বলি, এবারে বেরিয়ে যেতে হবে, যেহেতু অজুহাত হিসেবে বলেছিলাম বন্ধুর সাথে দেখা করতে গিয়েছি।

কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে ভেতরে আসতে বলে হাতসুমি। জানায়, কেবলই একটা কেক বানিয়েছে সে, আমি যেন সেটা চেখে দেখি। কয়েকবার বিড়বিড় করে বলার চেষ্টা করি, ওকে বিরক্ত করতে চাই না অসময়ে। কিন্তু সত্যি বলতে মনে মনে সুযোগটা হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না।

পরবর্তি দুই ঘন্টা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সেরা দুটো ঘন্টা। ভেতরে ভেতরে ভীষণ উচ্ছ্বাস কাজ করছিল। ঝড়ের গতিতে কথা বলছিলাম একের পর এক বিষয়ে। হাতসুমি বিরক্ত তো হয়ইনি বরং বারবার হেসে উঠছিল। ওর সেই কাচ ভাঙা শব্দের মতন হাসি হৃদয়ে আলোড়ন তুলছিল আমার। ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই আনন্দে ফেটে পড়ছিলাম আমি। কারণ বাইরে বের হওয়ার পর ঠান্ডা বাতাসও উপভোগ করতে শুরু করি। সবকিছু রঙিন মনে হয়।

হিদাকার কাছ থেকে লেখালেখির বিষয়ে পরামর্শ নেয়ার অজুহাতে ঘনঘন ওদের বাসায় আসা-যাওয়া চলতে থাকে আমার কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ছিল হাতসুমিকে দেখা। হিদাকা অবশ্য এসব খেয়াল করেনি। আমার সাথে নিয়মিত কথা বলার সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা উদ্দেশ্য ছিল ওর, তবে সেটা আমি তখন বুঝতে পারিনি।

অবশেষে দ্বিতীয় উপন্যাসটা লেখা শেষ হয় আমার। এবারেও হিদাকাকে দিয়ে লেখাটা পড়িয়ে নিতে চাই। আর এবারেও হতাশ হতে হয় আমাকে, কারণ উপন্যাসটা ওর মনঃপুত হয়নি।

"সেই গৎবাঁধা পুরনো প্রেমের উপন্যাস," আমাকে বলে ও। "নিজের চেয়ে বেশি বয়সি কোন নারীর প্রেমে পড়ার কাহিনী এখন আর চলে না। নতুন কোন চমক আনতে হবে তোমাকে এই গল্পে। তাছাড়া নায়ক যার প্রেমে পড়েছে তার চরিত্রটা ঠিক যাচ্ছে না গল্পের সাথে। ঠিক বাস্তবিক ঠেকছে না। তুমি তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে লিখছো না এটা জানি, কিন্তু লেখার মধ্যে আরেকটু বাস্তবতা আনতে হবে।"

কঠোর সমালোচনা বোধহয় একেই বলে। ওর কথাগুলো শুনে একদম হতবাক হয়ে যাই আমি। বিশেষ করে গল্পের নায়িকাকে নিয়ে বলা কথাগুলো বুকে শেলের মতন বেঁধে। কারণ হাতসুমিই ছিল আমার অনুপ্রেরণা।

হিদাকার কাছে জানতে চাই, আমাকে দিয়ে আদৌ লেখালেখি হবে কি না।

কিছুক্ষন ভাবে হিদাকা, এরপর বলে, "এত তাড়া কিসের তোমার, শুনি? চাকরি তো আছেই একটা। ওটার পাশাপাশি শখ হিসেবে লেখালেখি চালিয়ে যাও। প্রথম বই প্রকাশের জন্যে তাড়াহুড়ো করো না।"

ওর কথা শুনে খুব যে ভরসা পেলাম, তা নয়। দ্বিতীয় উপন্যাসটা নিয়ে অনেক আশা ছিল আমার। নিজের দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ হতে শুরু করে। এমনকি হাতসুমির সান্ত্বনাবাক্যও আমার হতাশা কমাতে পারে না।

পরপর বেশ কয়েকদিন রাতে ঘুমাতে পারি না, ফলে খুব দ্রুত খারাপ হয়ে যায় শরীর। একপর্যায়ে বুকে ঠান্ডা বসে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ি। এরকম সময়গুলোতে একাকীত্ব বড্ড অসহ্য ঠেকত আমার। বিছনায় কম্বল মুড়ি

সিয়ে কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা ছাড়া করার আর কিছু ছিল না।

এরপরেই একদম অভাবনীয় ঘটনাটা ঘটে, যা ডিটেক্টিভ কাগাকে ইতিমধ্যে বলেছি আমি। আমাকে দেখতে অ্যাপার্টমেন্টে আসে হাতসুমি। নক শুনে দরজার পিপহোল দিয়ে বাইরে উঁকি মেরে দেখার পর মনে হয় ভুলভাল দেখছি বুঝি

"ওর কাছে শুনলাম আপনি অসুস্থ, কাজেও যেতে পারছেন না," বলে হাতসুমি।

আমি যে ওকে দেখে কতটা খুশি হয়েছে এটা প্রাথমিক অবস্থায় চোখে পড়ে না ওর। ভেতরে ঢুকেই সরাসরি রান্নাঘরে চলে যায়। রান্নার সব সরঞ্জাম সাথে করে নিয়ে এসেছে। আমার মনে হয় আমি যেন মেঘের উপরে ভাসছি, তবে সেটা জ্বরের ঘোরে নয়।

হাতসুমি আমার জন্যে যে সব্জির স্যুপটা রান্না করে, তার স্বাদ ছিল অনন্য। তবে আমি যে স্বাদটা খুব বেশি উপভোগ করতে পারছিলাম, এমন নয়। জ্বরের কারণে মুখ থেকে স্বাদ চলে যায়। কিন্তু যা খাচ্ছি, তা হাতসুমির রান্না করা, এই ভাবনাটাই যথেষ্ট ছিল আমার জন্যে। সেদিন রাতে নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখি মানুষ মনে হয় আমার।

পুরো এক সপ্তাহ ছুটি নেই অফিস থেকে। শারীরিক দিক দিয়ে কখনোই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বলা যাবে না আমাকে। ঠান্ডা থেকে সেরে উঠতে প্রায়ই বেশ সময় লেগে যেত আমার; কিন্তু সেবারই এই শারীরিক অসুস্থতার জন্যে ভাগ্যবান মনে হয় নিজেকে। সেই সপ্তাহে তিনবার আমার বাসায় আসে ও। শেষদিন ওর কাছে জানতে চাই আমার খেয়াল রাখার কথা হিদাকা ওকে বলেছিল কি না।

"আসলে ও কিছু জানে না এই ব্যাপারে।"

"কেন?"

"আসলে...আপনি তো জানেনই। ও একটু..." বলতে গিয়ে থেমে যায় হাতসুমি। "আসলে ও বুঝত না।"

"আচ্ছা, ব্যাপার না," ওর মাথায় কী ঘুরছে সেটা জানতে ইচ্ছে হলেও এই ব্যাপারে আর কিছু বলি না।"

পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার পর হাতসুমির জন্যে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কিছু একটা করতে ইচ্ছে করে আমার। উপহার দিলে সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে অনেকে। তাই এক সন্ধ্যায় ডিনারের আমন্ত্রণ জানাই।

প্রথম দিকে ইতস্তত বোধ করলেও শেষ পর্যন্ত রাজি হয় হাতসুমি। উপন্যাসের কিছু বিষয়ে রিসার্চের জন্যে কয়েকদিনের জন্যে বাইরে গিয়েছিল হিদাকা। আয়োজনটা সেই সময়ে হলে আমার কোন সমস্যা হবে কি না জানতে চায় সে। সমস্যা তো ছিলই না, বরং আমার কাছে সেই সময়টাই একদম যথার্থ মনে হয়।

রোপ্পোঙ্গির একটা ট্র্যাডিশনাল জাপানিজ রেস্তোরাঁয় ডিনারে যাই আমরা। সেদিন রাতে আমার সাথে আমার অ্যাপার্টমেন্টে ফেরে ও।

এর আগে বোধহয় আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে বলেছিলাম যে ওর প্রতি টান অনুভব করি আমি। এখন সেই বক্তব্যটা পাল্টে ফেলার সময় হয়েছে। আসলে একে অপরকে ভালোবাসতাম আমরা। একে কোনভাবেই টান বা সাময়িক আবেগ হিসেবে আখ্যা দেয়া যায় না। প্রথম যেদিন ওর উপরে চোখ পড়ে, সেদিন থেকেই জানতাম নিয়তি ওকেই পছন্দ করে রেখেছে আমার জন্যে। সেই রাতট ছিল আমাদের ভালোবাসার সূচনা পর্ব।

চোখের পলকে কেটে যায় মুহূর্তগুলো; শেষদিকে হাতসুমি আমাকে বলে-"হিদাকা তোমাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।" ওর চোখেমুখে খেলা করছিল নিদারুণ এক বিষন্নতা, অথচ কিছুক্ষণ আগেও সেখানে ছিল উচ্ছ্বাস।

"মানে?"

"ও চায় না তোমার কোন লেখা প্রকাশিত হোক। এতে হতাশ হয়ে এক সময় লেখালেখি থেকে মন উঠে যাবে তোমার।"

"আমার উপন্যাসগুলো এতটাই বাজে?!"

"না, মোটেও না। বরং, এর পুরো বিপরীত। ও হিংসে করে তোমাকে, কারণ তোমার লেখা ওর লেখার তুলনায় মানের দিক দিয়ে অনেক ভালো।"

"অসম্ভব।"

"আমার নিজেরও একথা শুরুতে বিশ্বাস হতে চায়নি। কিন্তু এছাড়া ওর এরকম আচরণের আর কোন ব্যাখ্যা নেই।"

"কী রকম আচরণ?"

"তুমি যখন প্রথম উপন্যাসটার পান্ডুলিপি পাঠিয়েছিলে, সেটা পড়ার কোন ইচ্ছেই ছিল না ওর। বলছিল এসব কাচা হাতের লেখা পড়া আর সময় নষ্ট করা একই কথা। উপর উপর দিয়ে একটু চোখ বুলিয়ে তোমাকে যা বলার বলে দেবে।"

"কী বলছো এসব!" হিদাকা আমার সাথে যেরকম ব্যবহার করেছে তার সাথে হাতসুমির বর্ণনার কোন মিলই খুঁজে পাচ্ছি না। "ও কি আসলেও পড়েছিল লেখাটা?"

"সেটাই তো বলছি তোমাকে। একবার পড়তে শুরু করার পর আর ছেড়ে উঠতে পারেনি। সাধারণত বই খুব বেছে পড়ে হিদাকা। একটু একঘেয়ে লাগলেই ছুড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু তোমার বইটা একদম বুভুক্ষের মতন পড়ে ও। সেটা নিশ্চয়ই এমনি এমনি না? লেখায় দম ছিল বলেই পড়েছে ওভাবে। ছাড়তেই পারছিল না।"

"কিন্তু আমাকে তো বলেছিল ছাপার যোগ্য না।"

"সত্যিটা বলেনি। কয়েকবার তো আমার সামনেই মিথ্যে বলেছিল। তুমি যে ফোন করতে...বই পড়া হয়ে গেলেও বলতো যে পড়ার সময় পায়নি। ও আসলে তখনও ভাবছিল লেখাটা নিয়ে কী করবে। শেষমেষ তোমাকে নিরুৎসাহিত করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে লেখালেখি ছেড়ে দাও।"

"হয়তো..." বললাম, "হয়তো ওভাবে মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল কারণ আমরা বন্ধু।"

"নাহ্, আমি তো চিনি ওকে। নিজেকে ছাড়া আর কাউকে নিয়ে ভাবে না।"

লম্বা সময় প্রেম করে বিয়ে করার পর কেউ যদি স্বামীকে নিয়ে এরকম কিছু বলে সেটা অস্বাভাবিকই ঠেকবে। তবে এখন চিন্তা করলে মনে হয়, হয়তো আমার কাছে সান্ত্বনা খুঁজছিল সে। যে মানুষটাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল, সে বদলে গিয়েছে। তাই...এই বিষয়টা নিয়ে ভাবতে চাই না আমি।

হাতসুমি আমাকে বলে লেখালেখি নিয়ে বেশ বাজে সময় কাটছিল হিদাকার। নতুন কিছু লেখা হচ্ছিল না দেখে হতাশ হয়ে পড়ছিল দিন দিন। নতুন আইডিয়া না পেয়ে আত্মবিশ্বাস গিয়ে ঠেকেছিল তলানিতে।

"তুমি আর তোমার কোন লেখা পাঠিও না ওর কাছে। অন্য কারো কাছে যাও, যে আসলেও সাহায্য করবে।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও! হিদাকা যদি এটাই চায় যে আমার লেখা কেউ প্রকাশ না করুক, তাহলে দ্বিতীয় উপন্যাসটা পড়তে নিল কেন?"

"তুমি ওকে চেন না। ইচ্ছে করে দেরি করাচ্ছে যেন অন্য কারো সাথে কথা বলতে না পার। দেরি করালে হতাশ হবার এক পর্যায়ে লেখালেখি ছেড়ে দেবে, সেজন্যেই ঘুরাচ্ছে বারবার। সম্পাদকদের কারো সাথে পরিচয় করানোর কোন ইচ্ছে নেই।" হাতসুমির কণ্ঠে রুক্ষতা স্পষ্ট।

হিদাকা যে এতটা বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের হতে পারে, তা বিশ্বাস করা আমার জন্যে কষ্টকর। এ রকম অসূয়া তো মানুষ ঘোর শত্রুর জন্যেও কামনা করে না। তবুও হাতসুমি তো আর বানিয়ে বলবে না এসব। আমি ওকে জানাই, তৎক্ষনাৎ যোগাযোগ বন্ধ করবো না, কিছুটা সময় নিয়ে দেখব পরিস্থিতি কোন দিকে গড়াচ্ছে। পরিকল্পনাটা হাতসুমির বিশেষ পছন্দ হয় না, কিন্তু এই ব্যাপারে আর কিছু বলেও না সে।

এরপর থেকে হিদাকাদের বাসায় আনাগোণা কমিয়ে দেই। এমন নয় যে হিদাকার উপর থেকে ভরসা উঠে গেছে, আসলে আমি নিজেকেই ভরসা করতে পারছিলাম না। কেবলই মনে হচ্ছিল, ও হয়তো বুঝে যাবে আমার আর হাতসুমির সম্পর্কের ব্যাপারটা। হিদাকা বরাবরই সবকিছু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে। একবার যদি টের পায় আমি হাতসুমির দিকে অন্য দৃষ্টিতে তাকাচ্ছি, তাহলেই সব শেষ।

কিন্তু হাতসুমিকে না দেখে লম্বা সময় কাটানোও সম্ভব নয় আমার পক্ষে; জনসম্মুখে কোথাও দেখা করবো, সেই উপায়ও নেই। তাই গোপনে আলোচনা করে দু'জনে সিদ্ধান্ত নেই, ও আমার অ্যাপার্টমেন্টেই আসবে। যেমনটা ডিটেক্টিভ কাগা জানে, আমার অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সটায় খালি অনেকগুলো ফ্ল্যাট আছে, কেউ হয়তো খেয়ালও করবে না ওকে। আর

খেয়াল করলেও হাতসুমির পরিচয় তাদের জানার কথা নয়। তাই গুজব ছড়ানোর কোন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

হাতসুমি অপেক্ষা করতো কখন হিদাকা রিসার্চের কাজে শহরের বাইরে যাবে। আমার বাসায় অবশ্য কখনো রাত কাটায়নি ও, কিন্তু রাতের খাবার বানাতো প্রায়ই। দু'জনে একসাথে খেতাম। আর এসব দিনেই রান্না করার সময় অ্যাপ্রোনটা পরতো ও (হ্যাঁ, এই অ্যাপ্রোনই খুঁজে পেয়েছিল ডিটেক্টিভ কাগা এবং তার সঙ্গী)। ওকে অ্যাপ্রোন পরা অবস্থায় রান্নাঘরে দেখলে মনে হতো আমরা নবদম্পতি, এই বাড়িতে সদ্য উঠেছি।

সাথে থাকার সময়টা যতই আনন্দে কাটুক, যখন একজন আরেকজনের কাছ থেকে বিদায় নিতাম, বিষাদে ছেয়ে উঠত মন। ঘড়ির কাটাগুলোকে বড্ড নিষ্ঠুর মনে হত।

প্রায়ই ভাবতাম একসাথে দু'তিন দিন কাটানো গেলে কেমন লাগবে। কথাও বলতাম ব্যাপারটা নিয়ে, যদিও দুজনই জানতাম বিষয়টা অসম্ভব। এই পর্যায়ে এমন একটা সুযোগ এলো যেটা হাতছাড়া করা আমাদের কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। একটা কাজে সপ্তাহখানেকের জন্যে অ্যামেরিকা যেতে হতো হিদাকাকে। সাথে ওর একজন সম্পাদকও যাবে। হাতসুমি এই সময়টা বাড়িতেই থাকবে।

এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলাম আমরা। পুরো সময়টা কি করবো, তা নিয়ে অনেক আগে থেকেই জল্পনা-কল্পনা করছিলাম দুজনে। কিশোর-কিশোরীদের মতন হেসে একজন আরেকজনের শরীরে ঢলে পড়তাম আলোচনা করতে করতে। এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেই ওকিনাওয়া যাব। এমনকি একটা ট্রাভেল এজেন্সিতে গিয়ে টিকেটও কেটে ফেলি। আমাদের ভ্রমণের সময়কাল খুব বেশিদিন হবে না, কিন্তু এই অল্প সময়ই স্বামী-স্ত্রীর মতন সর্বক্ষণ একসাথে থাকব। আনন্দে নেচে ওঠে আমার মন।

ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করার সময়টুকুই ছিল আমাদের সম্পর্কের সবচেয়ে সুখি সময়। যেমনটা আপনারা জানেন, ওকিনাওয়ায় আমাদের আর যাওয়া হয়নি। যে পত্রিকার আমন্ত্রনে যাওয়ার কথা ছিল, তারা অল্প ক'দিন আগে মানা করে দেয় হিদাকাকে। কারণ সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানি না

আমি। হিদাকা মুষড়ে পড়ে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম আমরা দুজন।

মনে হয় আমাদের হাতের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেল স্বর্গ। লক্ষ্যের এত কাছে গিয়েও ফিরে আসায় ওকে দেখার বাসনাটা আরো তীব্র রূপ ধারণ করে। প্রায় পাগলের মতন হয়ে যাই আমি। যখনই দেখা হতো, মন ভরতো না। ও চোখের আড়াল হওয়া মাত্র দিন গুণতে শুরু করতাম পরবর্তি সাক্ষাতের।

একটা সময় হঠাৎ আমার বাসায় আসা কমিয়ে দেয় হাতসুমি। কারণ জিজ্ঞেস করলে যা বলে, শুনে রীতিমত আত্মা শুকিয়ে যায়। ওর ধারণা হিদাকা আমাদের ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে। আরো বলে, সম্পর্কের ইতি টানাই উচিত হবে আমাদের।

"ও যদি টের পেয়ে যায়, তাহলে কোন না কোন উপায়ে প্রতিশোধ নেবেই। আমার কারণে তোমাকে ভুগতে হোক, এটা চাই না।"

"যা হয় হবে," বলি আমি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে, আমিও চাই না ও কোন কারণে কষ্ট পাক। হিদাকাকে খুব ভালো করেই চেনা ছিল আমার, ডিভোর্সের কাগজে সই করার মত মানুষ নয় ও। তা সত্ত্বেও হাতসুমির সাথে আর দেখা হবে না, এটা ভাবতেই কেমন যেন লাগছিল।

আমার মাথা থেকে দূর করতে পারি না ব্যাপারটা। বাচ্চাদের পড়ানো শিকেয় তুলে ভাবতে থাকি কী করে সবকিছু ঠিক করবো। অবশেষে, একটা সিদ্ধান্তে আসি। ডিটেক্টিভ কাগা ইতিমধ্যেই ধরে ফেলেছেন কী পরিকল্পনা এটেছিলাম আমি। হ্যাঁ, হিদাকাকে খুন করবো বলে ঠিক করেছিলাম।

এভাবে কথাটা লিখে ফেলে এখন অদ্ভুত লাগছে। কিন্তু সেই সময় একদম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম ব্যাপারটা নিয়ে। পরিকল্পনাটা করার সময় এক মুহূর্তের জন্যেও আফসোস হয়নি। এখানে বলে রাখা ভালো, সেদিনের আগেও আরো অনেকবার মনে মনে হিদাকার মৃত্যু কামনা করেছিলাম আমি। হাতসুমি যে ওর স্ত্রী, তা মানতেই পারতাম না। আমরা, মানুষেরা কতটা খেয়ালী হতে পারি এর একটা উদাহরণ এটা। কারণ এখানে ভুল কাজটা আমিই করছিলাম–অন্যের অধিকার খর্ব করছিলাম। কিন্তু মানুষের মৃত্যু কামনা করা এবং তাকে নিজ হাতে খুন করার মধ্যে অনেক পার্থক্য।

যেমনটা অনেকেই আন্দাজ করবে, হাতসুমি আমার পরিকল্পনার ঘোর বিরোধী ছিল। কান্নাকাটি জুড়ে দেয় ও। বলে, আমাকে এমন কিছু করতে দেবে না। কারণ ধরা পড়লে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু ওর কান্না আমার ক্রোধের অনলে যেন ঘি ছড়িয়ে দেয়। মনে হতে থাকে হিদকাকে হত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায় খোলা নেই।

"ভুলেও আমাকে সাহায্য করার কথা মাথায় আনবে না," ওকে বলি। "যা করার নিজেই করবো। যদি ধরা পড়ে যাই, পুলিশ গ্রেফতার করে আমাকে, তোমার নাম মুখেও আনব না।"

আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এই পর্যায়ে যৌক্তিকভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি আমি। হাতসুমি হয়তো বুঝতে পারে আমার সংকল্প কতটা দৃঢ়, কিংবা ও নিজেও জানত এছাড়া আর কোন উপায় নেই আমাদের এক হবার। তাই কিছুদিন পর আমাকে সাহায্য করার কথাও বলে। আমি চাইনি ও ঝুঁকি নিক। কিন্তু একটা বিষয় একদম পরিষ্কার করে দেয় ও–হয় কাজটা একসাথে করবো আমরা, নয়তো করবোই না।

এরপর দুজনে মিলে কুনিহিকো হিদাকাকে হত্যার ছক সাজাই। কিন্তু এখন আমার মনে হয় না পরিকল্পনাটা খুব একটা ভালো কিছু ছিল। গোটা ব্যাপারটাকে ডাকাতির চেষ্টা হিসেবে সাজানোর পরিকল্পনা করি আমরা। দিন ঠিক হয় ডিসেম্বরের ১৩ তারিখ।

সেদিন গভীর রাতে গোপনে হিদাকাদের বাগানে ঢুকে পড়ি আমি। ডিটেক্টিভ কাগা ইতিমধ্যেই জানেন সেদিন কি ছিল আমার পরনে–একটা কালো প্যান্ট, কালো জ্যাকেট। যদি সেদিন কোন মুখোশ পরতাম, তাহলে হয়তো আজকে আর এই স্বীকারোক্তিটা লেখা হতো না। কিন্তু সেই মুহূর্তে কথাটা মাথায় আসেনি।

হিদাকার অফিস ঘরের লাইটটা নেভানো ছিল। ভয়ে ভয়ে জানালায় হাত দিয়ে পাল্লাটা একপাশে সরিয়ে দেই। সহজেই খুলে যায় ওটা। শ্বাস চেপে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ি। দেখি, সোফার এক কোণায় চিত হয়ে শুয়ে আছে হিদাকা। বুকটা ওঠানামা করছে নির্দিষ্ট ছন্দে। ঘুমাচ্ছিল ও। আমরা সেই দিনটা বেছে নেই কারণ পরদিন একটা কাজ জমা দেয়ার কথা ছিল হিদাকার; এ রকম হলে সাধারণত অফিসেই রাত কাটাতো ও।

কিন্তু মাথায় কাজের খড়্গ নিয়েও কেন ঘুমাচ্ছিল ও, তা ব্যাখা করা দরকার। হাতসুমি ওর রাতের খাবারের সাথে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দিয়েছিল। হিদাকা প্রায়ই ঘুমের ঔষধ খেত বিধায় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখেও কারো কিছু সন্দেহ হবে না। হিদাকাকে ওখানে শুয়ে থাকতে দেখে বুঝে যাই, সব পরিকল্পনা মাফিকই এগোচ্ছে। কাজ করতে করতে এক পর্যায়ে ক্লান্ত হয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছিল নিশ্চয়ই, এরপরেই ঘুমিয়ে গেছে। হাতসুমি ভেতরে ঢুকে নিশ্চিত হয় ও আসলেই ঘুমাচ্ছে, এরপর বাতি নিভিয়ে বেরিয়ে যায়। তবে যাওয়ার আগে জানালাটা খুলে দিতে ভোলে না।

বাকি দায়িত্ব আমার। কম্পমান হাতে জ্যাকেটের পকেট থেকে ছুরিটা বের করি আমি। এই ছুরিটাই হিদাকাদের অন্যান্য জিনিসের মাঝে খুঁজে পেয়েছেন ডিটেক্টিভ কাগা।

সত্যি বলতে আমি চেয়েছিলাম ওকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করতে। ছুরিকাঘাত করছি, এটা ভাবলেই যেন কেমন লাগতো। কিন্তু সেটাই বিশ্বাসযোগ্য দেখাবে তদন্তে। অস্ত্র ছাড়া নিশ্চয় কেউ ডাকাতি করতে ঢোকে না।

প্রথমে আমি বুঝে উঠতে পারি না, ওকে কোথায় আঘাত করবো। পাশে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নেই ওর বুকেই ছুরিটা চালিয়ে দেব। ছুরির বাটটা ভালোমতো ধরার জন্য হাত থেকে গ্লাভস খুলে ফেলি। ভেবেছিলাম পরে মুছে ফেললেই হবে। এরপর ছুরিটা চেপে ধরে হাত দুটো মাথার উপরে নিয়ে আসি। ইচ্ছে ছিল ফলাটা একদম ওর বুকে গেঁথে দেব।

ঠিক সেই মুহূর্তে অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা ঘটে যায়। চোখ খুলে হিদাকা। জমে যাই আমি। হাত নামিয়ে আনতে পারি না। মুখে কথাও ফোটে না।

কিন্তু হিদাকা খুব দ্রুত ওখান থেকে সরে যায়। কী ঘটছে তা বুঝে ওঠার আগেই টের পাই ও আমাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে পিঠের উপরে চেপে বসেছে। ছুরিটা আগেই হাত থেকে ছুটে গিয়েছে। হিদাকা বরাবরই আমার তুলনায় স্বাস্থ্যবান ছিল।

"হচ্ছেটা কী? আমাকে খুন করতে চাইছো কেন?" চেঁচিয়ে বলে সে।

জবাবে বলার মত কিছু খুঁজে পাইনি আমি।

এক পর্যায়ে হাতসুমিকে ডাকে হিদাকা। ফ্যাকাসে মুখে ভেতরে প্রবেশ করে ও। স্বামীর ডাক শুনেই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল কী ঘটেছে।

"পুলিশে ফোন দাও," নির্দেশ দেয় আমার বন্ধু।

কিন্তু হাতসুমি ওখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

"এভাবে সঙের মতন দাঁড়িয়ে আছো কেন? ফোন নিয়ে এসো!"

"কিন্তু এটা তো নোনোগুচি।"

"সেটা তো আমিও জানি! ও আমাকে খুন করতে চাইছে, এই সত্যটা তো আর বদলাচ্ছে না।"

"না, কুনিহিকো, তুমি ভুল বুঝছ–" নিজের জড়িত থাকার বিষয়টা বলতে উদ্যত হয় হাতসুমি।

কিন্তু ওকে মাঝপথেই থামিয়ে দেয় হিদাকা। "তোমার কি আমাকে গর্দভ মনে হয়?"

কিভাবে যেন আমাদের পরিকল্পনার কথা জেনে গিয়েছিল সে। আসলে সোফায় শুয়ে ঘুমানোর অভিনয় করছিল। আমি ছুরি চলাতে উদ্যত হলেই লাফ দিয়ে উঠে বসে।

"নোনোগুচি," আমার মুখটা কার্পেটে ঠেস দিয়ে ধরে বলে ও। "বিনা অনুমতিতে কারো বাড়িতে ঢোকার আইন সম্পর্কে কিছু জানো? চাইলে আত্মরক্ষার্থে এখন যদি তোমাকে আমি হত্যাও করি, আমার কিন্তু তেমন শাস্তি হবে না।"

ওর শীতল কণ্ঠ শুনে কেঁপে উঠি আমি। যদিও আমার মনে হয় না, আসলেও কাজটা করবে ও। কিন্তু সেটার বদলে কী করতে পারে, তা ভাবতেই গলা শুকিয়ে যায়।

"তবে তোমার ভাগ্য ভালো, আজকে আমি ভালো মেজাজে আছি। তোমাকে হত্যা করে আমার কোন লাভই হবে না। পুলিশে ধরিয়েই দেই বরং–" বাঁকা দৃষ্টিতে হাতসুমির দিকে তাকিয়ে হেসে বলে হিদাকা, এরপর আবার আমার দিকে দৃষ্টি ফেরায়। "কিন্তু তুমি জেলে পচলেও আমার কী লাভ হবে?"

ওর কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারি না। সেজন্যই ভয়টা আরো জেঁকে বসে মনের মধ্যে।

টের পাই ওর হাতের বাঁধন হালকা হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর আমার উপর থেকে উঠে যায়। হাতে কম্বল পেচিয়ে দূরে পড়ে থাকা ছুরিটা তুলে নেয় সে।

"চিন্তা নেই, নোনোগুচি...তোমাকে আমি যেতে দিচ্ছি। এই জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পার তুমি।" মুখ বিকৃত করে বলে। "মনে হচ্ছে যেন তুমি ভুত দেখেছো। আমি মত বদলানোর আগেই চলে যাও এখান থেকে।"

"কী পরিকল্পনা তোমার?" কেঁপে উঠল আমার কণ্ঠস্বর।

"সেটা নিয়ে তোমার চিন্তা না করলেও চলবে। বের হও তো..." ছুরিটা দেখিয়ে বলে ও। "এটা আমি প্রমাণ হিসেবে রেখে দিচ্ছি।"

ভাবলাম ছুরিটা প্রমাণ হিসেবে আদালতে দেখানো হবে কি না, এতে তো আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে। যেন আমার চিন্তাটা পড়তে পারল ও। বলতে থাকল, "একটা জিনিস জেনে রাখ, এই ছুরিটাই একমাত্র প্রমাণ নয়। আমার হাতে আরেকটা প্রমাণ আছে। সেটা আদালতে দেখালে কোনভাবেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবে না।"

ভাবার চেষ্টা করলাম, কীসের কথা বলছে ও, কিন্তু কিছুই আন্দাজ করতে পারলাম না। হাতসুমির দিকে তাকালাম। কাগজের মত সাদা দেখাচ্ছে ওর সুন্দর মুখটা, চোখের কোণ লাল। এ রকম বিষাদ কারো চেহারায় কখনো দেখিনি আমি, ভবিষ্যতে কখনো দেখব, সেই সম্ভাবনাও নেই। উঠে জানালা দিয়ে বেরিয়ে বিভ্রান্তি নিয়েই হাঁটতে থাকলাম। কয়েকবার ভাবলাম দৌড় দিয়ে একেবারে উধাও হয়ে যাই। কিন্তু সেটা করলাম না, কারণ হাতসুমির সাথে কী ঘটতে পারে সেটা নিয়ে চিন্তা হচ্ছিল।

দিনগুলো ভয়ে ভয়ে কাটতে লাগলো আমার। কেন না হিদাকার প্রতিশোধ নেয়ার আশা ত্যাগ করার সম্ভাবনাই নেই। যদিও জানি না কী ধরনের প্রতিশোধের কথা ভেবে আমি আতঙ্কিত।

হাতসুমি বা হিদাকার সাথে আর দেখা করতে যাইনি। আমাদের

একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম ছিল ফোনকল। হাতসুমি কাজে বের হলে তখনই কথা হত শুধু।

"ওই রাতের ব্যাপারে কোনো কথা বলেনি ও," আমাকে জানায় হাতসুমি। "মনে হয়েছে যেন পুরো ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছে।"

আমরা দুজনেই জানি, ও ভোলেনি। অস্বস্তিবোধটা ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে আমার।

কিন্তু কয়েক মাস পর সব পরিস্কার হয়। একটা বইয়ের দোকানে গিয়ে প্রথম টের পাই এর ব্যাপারে। আমি নিশ্চিত, ডিটেক্টিভ কাগাও এতক্ষণে বুঝে গিয়েছেন। হিদাকার জনপ্রিয় 'নিভে যাওয়া অনল' বইটাতেই রয়েছে ব্যাপারটা। প্রথমে ওই উপন্যাসিকাটা আমিই ওকে দেখাই, এরপর সেটাকে বিস্তৃত করে নিজের মাস্টারপিসে রূপান্তরিত করেছে হিদাকা।

আমি বিশ্বাস করতে পারিনি ব্যাপারটা, করতে চাইও না। আমার জন্য এটা দুঃস্বপ্ন। যে মানুষটা দীর্ঘদিন ধরে লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে, তার জন্যে এর চেয়ে বড় আঘাত আর কী হতে পারে? হিদাকার পক্ষেই এরকম কঠিন ও নির্মম শাস্তি দেয়া সম্ভব।

একজন লেখক হিসেবে হিদাকার লেখা তার নিজেরই একটা অংশ। বলা চলে লেখালেখির বিষয়টা তার কাছে সন্তানের মত। পিতা-মাতা যেমন সন্তানকে ভালোবাসে, লেখকরাও নিজেদের সৃষ্টিকে একইভাবে ভালোবাসেন। 'নিভে যাওয়া অনল' বইটা কুনিহিকো হিদাকার লেখা উপন্যাস হিসেবেই পরিচিতি পেয়ে যাবে, যদি না আমি কিছু ফাঁস করে দেই। কিন্তু হিদাকা ভালোমতোই জানে, আমি এমনটা করবো না।

এটাই সত্যি। হৃদয়ে খুবই বাজেভাবে আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও মুখ বন্ধ রাখব। জানি, একটু আওয়াজও যদি করি, সে বলবে–"মুখ বন্ধ রাখ, নয়তো জেলে যেতে হবে।"

হিদাকার কারচুপি ফাঁস করতে চাইলে আমাকে স্বীকার করে নিতে হবে ওর বাড়িতে ঢুকে ওকে খুন করার চেষ্টা চালিয়েছিলাম। পুলিশের কাছে নিজেকে সমর্পন করার পর 'নিভে যাওয়া অনল' উপন্যাসটি নিজের বলে ঘোষণা দেয়ার কথা অনেকবার ভেবেছি আমি। একবার তো ফোন তুলে

স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে নম্বরে ডায়ালও করা শুরু করেছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারিনি। খুনের চেষ্টা চালানোর দায়ে গ্রেফতার হওয়ার ব্যাপারটাকে ভয় পেয়েছি বারবার। তবে আসল ভয়টা ছিল হাতসুমিকে নিয়ে। ওর বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হবে আমার সহায়তাকারী হিসেবে। যতই জোর দিয়ে বলি না কেন আমি নিজে থেকেই কাজটা করেছি, পুলিশ নিশ্চিতভাবেই বুঝে নেবে আমার একজন সহায়তাকারীর প্রয়োজন ছিল। আর সেটা হাতসুমি ছাড়া আর কারোর পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, হিদাকা হাতসুমিকে ছেড়ে কথা বলবে, এমনটাও অকল্পনীয়। আমি দোষ স্বীকার করে নিলে কোনোভাবেই হাতসুমিকে নিরাপদ রাখতে পারতাম না। এ জন্য আমার লেখাটা তার নামেই প্রকাশ করতে দিয়েছি। যদিও কষ্টে বুকটা ফেঁটে গিয়েছে। কিন্তু আমি চাইনি আমার জন্য হাতসুমিকে আর কোনো ঝামেলায় পড়তে হোক। নিশ্চিত, এটা পড়তে গিয়ে নিজমনেই হাসছেন ডিটেক্টিভ কাগা। আমি একজন স্বঘোষিত খুনি, যে কি না নিজেকে মহৎ দেখানোর চেষ্টা করছি।

আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার মত ভাষা জানা ছিল না হাতসুমির। তবে হিদাকা বেরিয়ে গেলে আমাকে কল দিত ও। কিন্তু ওই ফোনকলগুলোতে বিরাজ করত অস্বস্তিকর নীরবতা।

"কখনোই ভাবিনি, এতটা খারাপ কাজ করতে পারে ও। চুরি করবে তোমার লেখা। এটা তো.. "

"বাদ দাও। এই ব্যাপারে আমাদের দুজনের কিছু করার নেই।"

"কিন্তু এটা ভাবলে আমার খুব খারাপ লাগে।"

"তোমার কোনো দোষ নেই, আমিই আসলে নির্বোধ। যেমন কর্ম করেছি তেমন ফলই ভোগ করছি।"

যে মেয়েটাকে ভালোবাসি তার সাথে এই ধরনের কথাবার্তা আমার অন্তরে কোনো আশা বা স্পৃহা জাগাত না। অনুভব করতাম দিনে দিনে অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে আমার হৃদয়। ভাগ্যক্রমে, বেশ সাদরেই 'নিভে যাওয়া অনল' বইটাকে গ্রহণ করে পাঠক। কোনো পত্রিকা বা ম্যাগাজিনে বইটার প্রশংসা দেখলেই মনে হত অজানা কিছু একটা চিবিয়ে খাচ্ছে আমার

হৃদয়টা। মুহূর্তের জন্য প্রশংসাগুলো দেখে ভালোই লাগত, কিন্তু পরক্ষনেই মনে হত, লেখাটা প্রশংসিত হচ্ছে সেটা আমার নামে নয়।

এই বইয়ের জের ধরে আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয় হিদাকা। সবাই বলতে থাকে, সে কোনো সাহিত্য সম্মাননার যোগ্য কি না। আমি ভাবি, তাকে সাহিত্য সম্মাননা গ্রহণ করতে দেখলে আমার অন্তরে যে যন্ত্রণা অনুভূত হবে সেটা কি আদৌ কেউ কখনো বুঝবে? এই ভাবনায় কয়েক রাত আমি ঘুমাতে পারিনি পর্যন্ত।

এ রকম দুঃস্বপ্নের প্রহরই কাটছিল আমার, এরপর একদিন হঠাৎ করেই কানে এলো ডোরবেলের আওয়াজ। দরজার পিপহোলে চোখ রেখে মনে হল শ্বাস আটকে আসছে। দরজার অপরপাশে দাঁড়িয়ে ছিল কুনিহিকো হিদাকা। ওই রাতে তার বাড়িতে চুরি করে ঢোকার পর এই প্রথম দেখলাম ওকে। আমার লেখা চুরির জন্য ওকে ঘৃণা করলেও, আমি যা করেছি সেটার জন্য অনুতাপ হচ্ছিল। এক সেকেন্ডের জন্য ভাবলাম, ঘাপটি মেরে বাড়িতে না থাকার অভিনয় করি।

কিন্তু এভাবে পালিয়ে বেরিয়ে লাভ নেই। খুললাম দরজাটা।

হাসল হিদাকা, "ঘুমাচ্ছিলে নাকি?"

"নাহ।" রবিবার ছিল সেদিন, আমার পরনে তখনও রাতের পোশাক।

"দারুণ। তোমার আরামের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে চাইনি।" আমার পেছনে একবার উঁকি দিলো সে। "ভেতরে এলে কিছু মনে করবে নাকি? একটু আলাপ করার ছিল।"

"নিশ্চয়ই...ঘরগুলো কয়েকদিন ধরে পরিষ্কার করা হয়নি।"

"সমস্যা নেই। এমন তো না যে, আমরা পত্রিকার জন্য ফটোশুট করছি।"

ইদানিং পত্রিকা অফিস থেকে প্রায়ই ওর বাসায় লোক আসে।

"তাছাড়া," বলল সে। "আমার মনে হল কিছু একটা বলতে চাও তুমি।"

কিছুই বললাম না জবাবে। লিভিংরুমের সোফায় মুখোমুখি বসে আছি আমরা।

আমার অ্যাপার্টমেন্টের চারদিক দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখল হিদাকা। একটু নার্ভাস লাগল, ভাবলাম হাতসুমির কোনো কিছু তার নজরে না পড়ে যায়। অ্যাপ্রনটা পরিষ্কার করে সরিয়ে রেখেছি ভেবে স্বস্তি পেলাম।

"একজন ব্যাচেলরের বাড়ি হিসেবে জায়গাটা বেশ পরিপাটি," অবশেষে বলল।

"সম্ভবত।"

"কেউ কি এসে ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে যায়?"

সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে তাকালাম ওর দিকে। এখনও শীতল হাসি ঝুলে রয়েছে ঠোঁটে। কিসের দিকে ইঙ্গিত করছে সেটা আমার কাছে পরিষ্কার।

"কী ব্যাপারে কথা বলতে এসেছ?"

"এত তাড়াহুড়ো কিসের?" সিগারেট ধরাল ও। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক কেলেঙ্কারিগুলোর ব্যাপারে টুকটাক কথা বলতে লাগলো। আমি নিশ্চিত, আমাকে অপেক্ষায় রেখে মজা পাচ্ছে, সেজন্যেই কাজটা করছে হিদাকা।

ধৈর্যের বাঁধ ভাঙার দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছি, ঠিক তখনই সে একইরকম শীতল কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, "তাহলে নিভে যাওয়া অনলের ব্যাপারে..."

সোফায় সোজা হয়ে বসে তার পরবর্তি শব্দের জন্য অপেক্ষায় থাকলাম।

"ভাবলাম, তোমার লেখার সাথে মিল থাকার কারণে ক্ষমা চাওয়া উচিত। যদিও ব্যাপারটা নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত এবং কাকতলীয়। তোমার বইটার নাম কী যেন ছিল? অগ্নিবলয়, ঠিক না?"

ওর দিকে তাকালাম। নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। ন্যূনতম লজ্জাও নেই নাকি হারামিটার? অনিচ্ছাকৃত এবং কাকতলীয়? তার লেখাটা যদি চুরি না হয় তাহলে চুরি শব্দটাই ডিকশনারি থেকে তুলে দেয়া উচিত।

বলা শুরু করল সে, "সত্যি বলতে, কিছু অংশ কাকতলীয়ভাবে লেখা যায় না। আমি অস্বীকার করবো না, উপন্যাসটা লেখার সময় তোমার বইটা আমি পড়ছিলাম। এর প্রভাব আমার লেখায় পড়তে পারে। অবচেতনভাবে কিছু জিনিস আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল, যা স্থান পেয়েছে লেখায়। তুমি হয়তো জানো, গীতিকারদের সাথেও এমনটা হয়ে থাকে। অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের সুর করা গান অন্য গানের মত শোনায়।"

হতবিহ্বল হয়ে ওর কথাগুলো শুনলাম। ও কিভাবে আশা করে আমি তার এসব কথা বিশ্বাস করবো?

"আর বইটার ব্যাপারে জানার পর তুমি টু শব্দটিও করোনি বলে আমি খুব খুশি হয়েছি। ভালোই হয়েছে। আমরা তো অপরিচিত কেউ নই। দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে আমাদের ভেতরকার সম্পর্ক। তুমি এই ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য না করে বিচক্ষনের মত কাজ করেছো। এতে আমাদের দুজনেরই মঙ্গল।"

ওর বলা কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ হল–উচ্চবাচ্য করোনি বলেই বেঁচে গেছো। মুখ বন্ধ রাখো, নাহলে সবাই জেনে যাবে তুমি আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছো।

"যাইহোক, আজকে আমি তোমার সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা প্রসঙ্গে আলাপ করতে এসেছি।"

ওর দিকে তাকালাম। ভাবলাম, হারামজাদাটা নতুন কি শয়তানী শুরু করবে এখন।

"নিভে যাওয়া অনল বইটার সাফল্যের পর অনেক কিছু মাথায় এসেছে। অসংখ্য মানুষ বইটা পড়ছে, ভবিষ্যতে আরও অনেক মানুষ পড়বে। এর জন্য যে সাহিত্য সম্মাননা পেয়েছি সেটার কথা নাহয় বাদ-ই দিলাম। আমার মতে, একটা উপন্যাসের পরই যদি আমার জনপ্রিয়তা ম্লান হয়ে যায় তবে সেটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক হবে।"

টের পেলাম রক্ত সরে যাচ্ছে আমার চেহারা থেকে। আবারও ও একই কাজ করতে চলেছে। আমার দ্বিতীয় বইটার উপরে ভিত্তি করে নিজের পরবর্তি উপন্যাস লিখতে চাইছে। ওই বইটার একটা পান্ডুলিপি ওর বাড়িতে রয়েছে। আমিই পাঠিয়েছিলাম।

"তাহলে তুমি ওই লেখাটাও চুরি করবে?"

ভ্রু কুঁচকে তাকাল হিদাকা। "এই শব্দটা তোমার মুখ থেকে শুনতে চাইনি আমি।"

"এত নাটক করে লাভটা কী? আমরা সবাই-ই সত্যি কথাটা অপরের মুখ থেকে শুনতে নারাজ। তুমি যা খুশি তাই বলতে পার কিন্তু আমার কাছে লেখা চুরির অর্থ লেখা চুরিই। যাকে সোজা কথায় প্ল্যাজিয়ারিজম বলে।"

পুরোপুরি অভিব্যক্তিহীন দেখালো হিদাকাকে, সে বলল, "আমি নিশ্চিত প্ল্যাজিয়ারিজম শব্দটার অর্থের ব্যাপারে তুমি পরিচিত নও। ডিকশনারিতে গিয়ে দেখো। এতে বলা আছে, 'কারোর লেখা অনুমতি ব্যতীত নিজের নামে চালানো।' বুঝতেই পারছ, কী বোঝাতে চাইছি আমি। যদি অনুমতি না নিই তাহলে সেটা প্লেজিয়ারিজম, আর নিলে সেটা অন্য কিছু।"

ছোটলোকের বাচ্চা, আমি তোকে কোনোদিনই অনুমতি দিইনি, মনে মনে ভাবলাম। "মানে বলতে চাইছো আমার আরেকটা লেখা তুমি নিয়ে নিলে আমি কোনো অভিযোগ করতে পারবো না?"

জবাবে কাঁধ নাচাল করল হিদাকা। "তুমি আবারও আমাকে ভুল বুঝছ। আমি একটা চুক্তির প্রস্তাব দিচ্ছি আর কি। বলা যায়, বেশ লোভনীয় প্রস্তাব।"

"আমি জানি প্রস্তাবটা কি। আমি লেখা চুরির ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখলে তুমি ওই রাতের ঘটনার ব্যাপারে পুলিশকে জানাবে না।"

"অযথা এতটা উত্তেজিত হয়ো না। 'ওই রাতের ঘটনা'র ব্যাপারে তোমাকে কবেই মাফ করে দিয়েছি। আরও ভালো প্রস্তাব দিতে চলেছি আমি।"

জানি না ওর দেয়া প্রস্তাব কতটা ভালো বা কিভাবে আমাকে স্বস্তি দেবে। তবে কিছু বললাম না, কথা চালিয়ে যেতে দিলাম। চুপচাপ বসে নড়তে দেখলাম তার ঠোঁট।

"দেখো নোনোগুচি, তোমার প্রতিভার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তবে প্রতিভাবান ও একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক হওয়া দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। আর বেস্টসেলিং লেখক হতে হলে প্রতিভার দরকার হয় না। ব্যাপারটা পুরোপুরি ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল। আর এই ভাগ্যের আশীর্বাদ কিভাবে পাওয়া যায় সেটা জানা খুবই কঠিন। সবাই এটা পেতে চায়, পৌঁছাতে যায় ওই জায়গাটাতে। কিন্তু মানুষ যা ভাবে সেটা সবসময় ঘটে না।"

ওর চেহারায় ফুটে ওঠা গম্ভীর ভাবটা আমার নজর এড়াল না। মনে হল যেন লেখক হিসেবে কাটানো কঠিন দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছে।

"তোমার কি মনে হয়? 'নিভে যাওয়া অনল' ভালো বই বলে এত সাফল্য

পেয়েছে? এটা অস্বীকার করা যাবে না। তবে ভালো বই হওয়াটাই সবকিছু নয়। একটা জটিল উদাহরণ দিই তাহলে। ধরো, বইটা আমার নামে না প্রকাশিত হয়ে তোমার নামে হল। বইয়ের প্রচ্ছদে কুনিহিকো হিদাকার পরিবর্তে ওসামু নোনোগুচির নাম থাকলে তফাতটা কী হতো, বলো দেখি? তোমার মনে হয়, বইটা বিক্রি হত?"

"এমনটা না ঘটা পর্যন্ত আমরা কিছুই বলতে পারবো না।"

"নাহ, পারবো। বইটার কোনো গতিই হত না। কারো নজরে না পড়ায় এক সময় হারিয়ে যেত। তোমার মনে হত, বিশাল সমুদ্রে এক টুকরো পাথর ফেলেছো কেবল।"

কথাগুলো আসলেও হজম করা কঠিন, তবে অযৌক্তিক কিছু বলেনি ও। প্রকাশনা জগৎটা কতটা কঠিন সেই বিষয়ে ধারণা আছে।

"তুমি কেন নিজের নামে বইটা প্রকাশ করলেন সেটাই বোঝাতে চাইছো তাহলে?" বললাম আমি। "তুমি যেটা করছো বা সামনেও করবে, সেটাকে সমর্থন করতে বলছো?"

"আমি শুধু বলতে চাইছি, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে মনে হচ্ছে বইটা আমমার নামে প্রকাশ পেয়েই ভালো হয়েছে। নতুবা এত মানুষের কাছে পৌছাত না।"

"তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে আমার বিরাট উপকার করেছো।"

"আমি কোনো ভাব-ই ধরছি না। যেটা সত্যি সেটাই শুধু বলার চেষ্টা করছি। বিশ্বাস করো, একটা বই বেস্টসেলার হওয়ার আগপর্যন্ত অনেক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় লেখককে।"

"তোমার ধারণা আমি এসব জানি না?"

"নাহ, জানো না। আর সেটা তোমার আচরণেই স্পষ্ট। যদি জানতে তাহলে বুঝতে আমি কী বলার চেষ্টা করছি। দেখো, আমি আসলে তোমাকে লেখক কুনিহিকো হিদাকা হতে বলছি।"

"দুঃখিত, মনে হচ্ছ ভুল কিছু শুনলাম। তুমি কি আমাকে তোমার নাম নিয়ে লিখতে বললে?"

"এত অবাক হওয়ার কিছু নেই। খুব বড় কোনো ব্যাপার নয় এটা। বরং

এভাবে ভাবো, কুনিহিকো হিদাকা কোনো ব্যক্তির নাম নয়। এই ট্রেডমার্কটা ব্যবহার করে বইগুলো বিক্রি করবো আমরা।"

এবারে গোটা বিষয়টা ধরতে পারলাম। "তোমার গোস্টরাইটার হওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছ আমাকে।"

"এই শব্দটাও আমার পছন্দ নয়। একটা কাপুরুষোচিত ভাব আছে এতে। যাইহোক, হ্যাঁ, অনেকটা এরকমই ধরে নিতে পার।"

ওর দিকে তাকালাম। "তোমার সাহসের প্রশংসা না করে পারছি না।"

"আমি খুব অযৌক্তিক কিছু বলেছি, তা বলতে পারবে না।"

"এর থেকে ফালতু কোন প্রস্তাবের কথা কখনো শুনিনি আমি।"

"ওহ। আচ্ছা ধরো, আমার জন্য লেখা তোমার একটা উপন্যাস পেপারব্যাক আকারে প্রকাশিত হল। আমি আমার পুরো সম্মানীর পঁচিশ শতাংশ তোমাকে দেব। এবার ভালো লাগছে তো?"

"মাত্র পঁচিশ শতাংশ? পুরো বইটা লিখে অর্ধেকও পাবো না? এটা কি ধরনের গাঁজাখুরি প্রস্তাব?"

"তাহলে তোমাকে একটা প্রশ্ন করি। ধরো, তুমি নিজের নামেই বইটা বের করলে, কতগুলো বিক্রি হত তখন? আমার নামে প্রকাশিত হলে যা বিক্রি হবে তার সিকিভাগও বিক্রি হত বলে মনে হয় তোমার? কুনিহিকো হিদাকা নামটাই সব এখানে।"

ভুল বলেনি হিদাকা। আমার নামে বই বের করলে ওর মোট বিক্রির সিকিভাগও হবে না, এই ব্যাপারে আমি মোটামুটি নিশ্চিত। হয়তো সিকিভাগেরও অনেক কম হবে।

তবুও পুরো ব্যাপারটা বিবেচনা করে বললাম, "পয়সার বিনিময়ে নিজের আত্মা বিক্রি করতে পারবো না আমি।"

"তাহলে তুমি প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করছো?"

"ঠিক ধরেছো, প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করছি আমি।"

"আচ্ছা!" বিস্মিত দেখাল হিদাকাকে। "এমনটা আশা করিনি অবশ্য।"

ওর কথা বলার ধরণে এমন কিছু ছিল যা শুনে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল আমার মেরুদন্ডের মাঝ বরাবর। ওর চোখের দৃষ্টিতে আগুন ঝরছে।

কিছুক্ষণ আগের হিদাকা আর এই হিদাকার মধ্যে অনেক তফাত।

"আমি আমাদের সম্পর্কটা ভালো রাখার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু তোমার মধ্যে কোনো চেষ্টার ছিটেফোঁটাও নেই। একহাতে কখনো তালি বাজে না।"

পাশে থাকা ব্যাগটা উঠিয়ে নিয়ে ভেতর থেকে একটা চারকোনা প্যাকেট বের করে টেবিলে রাখলো হিদাকা। "এটা এখানে রেখে যাচ্ছি। আমি চলে যাওয়ার পর দেখবে। কিছুক্ষণ পর ফোন করবো, আশা করি ততক্ষণে মত বদলাবে তুমি।"

"কী এটা?"

"দেখলেই বুঝতে পারবে।" আর কথা না বাড়িয়ে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল হিদাকা। আমার দিকে ফিরেও তাকালো না।

ও চলে যাওয়ার পর একবিন্দুও না নড়ে কাউচে বসে তাকিয়ে থাকলাম জিনিসটার দিকে। লম্বা সময় পরে অবশেষে খুললাম প্যাকেটটা। ভেতরে একটা ভিএইচএস টেপ। টেপটা ভিসিআরে ঢোকানোর সময় দুরুদুরু করতে লাগল বুকের ভেতরটা।

ডিটেক্টিভ কাগা এরইমধ্যে এই টেপের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে অবগত, কিন্তু আমার জন্যে সেবারই ছিল প্রথম। হিদাকাদের বাড়ির বাগানটা দেখতে পাই পর্দায়। নিচের দিকে ভেসে ওঠা টাইমফ্রেমের দিকে তাকিয়ে জমে যাই আমি। তারিখটা সেদিনের, যেদিন আমি হিদাকাকে খুনের চেষ্টা করি।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎই একটা লোক এসে হাজির হল পর্দায়। লোকটার পরনে কালো পোশাক, অন্ধকারের সাথে মিশে গিয়েছে একদম। কিন্তু তার চেহারাটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে!

কেন আমি মাস্ক পরার কথা ভাবিনি?

যে কেউ-ই টেপের লোকটাকে দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারবে এটা ওসামু নোনোগুচি। ক্যামেরায় একদম পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে চেহারাটা। পর্দার নোনোগুচি বাগানের দিককার জানালা ধরে উঠে গেল। টেপে শুধু এই জিনিসটাই রয়েছে। আর এটুকুই যথেষ্ট। যদি খুনের চেষ্টা চালানোর ব্যাপারটা অস্বীকারও করি, ওখানে কী করছিলাম, এর যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে পারবো না।

বিবশ হয়ে বসে রইলাম। ওই রাতে হিদাকা আমাকে যা বলেছিল সেই কথাটাই ঘুরতে লাগল মাথার ভেতর। এই টেপটাই তাহলে তার হাতে থাকা আরেকটা প্রমাণ।

বসে আছি, নিশ্চিত নই কী করবো, তখনই বেজে উঠল ফোন। হিদাকা ফোন করেছে। একেবারে নিখুঁত টাইমিং। যেন আমার প্রতিটি পদক্ষেপের উপর নজরে রাখছে ও।

"টেপটা দেখেছো?" বলা চলে ব্যাপারটা উপভোগ করছে হারামিটা।

বললাম, দেখেছি।

"তাহলে কী ভাবছ?"

"তুমি জানতে, না?" কিছু না ভেবেই বললাম।

"কী জানতাম?"

"ওই রাতে আমি তোমার বাড়িতে চুরি করবো। তাই আগে থেকেই ভিডিও ক্যামেরা লাগিয়ে রেখেছিলে।"

হাসিতে ফেঁটে পড়লো হিদাকা। "কীভাবে জানবো আমি?"

"যাইহোক, আমি..."

"দাঁড়াও!" আমাকে থামিয়ে বলল ও। "তোমার পরিকল্পনার ব্যাপারে কারোর সাথে আলাপ করেছিলে নাকি? কেউ কি জানত, ওই রাতে তুমি আমাকে খুন করতে যাবে? তাহলে হয়ত কোনোভাবে আমার পক্ষে জানা সম্ভব হত। কেন না লোকে বলে, দেয়ালেরও কান আছে।"

আমার মনে হল হিদাকা আমার কাছ থেকে হাতসুমির সহযোগিতার কথাটা বের করতে চাইছে। অথবা ও জানে, আমি হাতসুমির ব্যাপারে কখনোই মুখ খুলব না, সেজন্য আমার সাথে খেলছে। কিন্তু আমি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালাম না।

আবারও বলতে শুরু করল ও, "আসলে ক্যামেরা লাগিয়েছিলাম অন্য কারণে। বাগানের গাছগুলো তছনছ করে রেখে যাচ্ছিল কোন জন্তু। তাই দেখতে চাইছিলাম কার কাজ এসব। তবে জীবনেও ভাবিনি এই জন্তুটা তুমি, নোনোগুচি।"

কথাটা অবিশ্বাস্য কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর তর্কে গেলাম না। "তাহলে

ভিডিওটা আমাকে দেখিয়ে কী প্রমাণ করতে চাইছো? আমাকে কী করতে বলছো?"

"আবারো বলতে হবে? এখনও বুঝতে পারোনি? তুমি তো অতটাও বোকা নও। ওহ, এখনই বলে রাখি, তোমার কাছে থাকা টেপটা কপি, আর আসলটা আমার কাছে নিরাপদে রয়েছে।"

"আমাকে কি ব্ল্যাকমেইল করে তোমার গোস্টরাইটার বানাতে চাইছো? এরকম জবরদস্তি করলে আমার জন্য লেখা কঠিন। জোর করে লেখার কথা কল্পনাও করতে পারি না।" কথাটা বলেই মনে হল এটা বলা উচিত হয়নি। মনে হচ্ছে ওর টোপের দিকে পা বাড়িয়ে ফেলেছি। এছাড়া আমার আর কীই বা করার আছে?

"আসলে আমার বিশ্বাস ছিল তুমি বুঝবে ব্যাপারটা," ওর কণ্ঠস্বর শুনে বলতে পারি ও ভাবতে শুরু করেছে জয় ওরই হবে। ভেঙে পড়তে শুরু করেছে আমার রক্ষণ। "আমি দ্রুতই ফোন করবো," বলে রিসিভার রেখে দিলো।

পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে ভূতের মত জীবনযাপন করলাম। বলা ভালো, ভূত লেখকের মত। ধারণা নেই কি করতে চলেছি। কাজে যাওয়া বন্ধ করলাম না, যদিও ক্লাস নেয়া আমার জন্য সবথেকে কঠিন কাজ হয়ে উঠেছিল। নিশ্চিত কয়েকজন ছাত্র আমার ব্যাপারে অভিযোগও জানিয়েছে। কেননা হেডমাস্টার তার রুমে ডেকে আমাকে ভালোই বকাবকি করে।

এরপর একদিন একটা বইয়ের দোকানের সাহিত্য বিষয়ক ম্যাগাজিনে ব্যাপারটা দেখলাম। কুনিহিকো হিদাকার প্রকাশিতব্য নতুন উপন্যাসের সারসংক্ষেপ। কাঁপা হাতে দ্রুত ডিসপ্লে থেকে ম্যাগাজিনটা তুলে নিলাম। মাথা ঘোরাতে শুরু করে আমার। মনে হচ্ছিল যেন ওখানেই জ্ঞান হারাবো। যে ভয় পেয়েছিলাম, সেটাই। এই বইটা হিদাকাকে পড়তে দেয়া আমার দ্বিতীয় উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে লেখা।

পুরো দুনিয়া যেন আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে লাগল। সপ্তাহ জুড়ে নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে নিজেকে অভিশাপ দিতে থাকলাম। বারবার ভাবলাম কেন ওই রাতে খুনের চেষ্টা করেছিলাম ওকে। কোথাও পালিয়ে

গিয়ে নিজেকে লুকিয়ে ফেলার কথাও চিন্তা করলাম। কিন্তু এমন কিছু করার মত পর্যাপ্ত সাহস নেই আমার। হিদাকার হাত থেকে বাঁচতে চাইলে আমাকে বহুদূরে পালাতে হবে, আর রেজিস্টার করা যাবে না আমার নতুন ঠিকানা। এর অর্থ আমি আর শিক্ষকতা করতে পারবো না। তাহলে বাঁচব কিভাবে? কায়িক শ্রম করার মত অবস্থাও আমার শরীরের নেই। তখনকার মত হীনমন্যতায় আমি কখনোই ভুগিনি। আর কোনোভাবেই হাতসুমিকে ফেলে রেখে যেতে পারতাম না। ওই বাড়িতে ওই লোকটার সাথে থেকে ওর কষ্টের কথা কল্পনা করেই রাগ লাগত আমার।

পেপারব্যাক আকারে দ্রুতই বেরিয়ে গেল হিদাকার নতুন উপন্যাস, ভালোই বিক্রি হল সেটা। যতবারই বেস্টসেলারের তালিকায় বইটা দেখতাম অনুশোচনা বোধের সাগরে আছড়ে পড়তাম আমি। চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত আমার আত্মমর্যাদা। আবার পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে ঠান্ডা মাথায় মাঝেমধ্যে ভাবতাম, এই বই আমার নামে প্রকাশিত হলে হয়ত বিক্রিই হত না।

কয়েক সপ্তাহ পরে, এক রোববার আবারও এলো হিদাকা। এমনভাবে আমার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে সোফায় বসল যেন কিছুই ঘটেনি।

"কথা অনুযায়ী..." একটা এনভেলপ রাখল ও টেবিলের ওপর।

জিনিসটা তুলে দেখতে পেলাম এর ভেতরে রাখা টাকাগুলো।

"...এতে দুই মিলিয়ন ইয়েন আছে। যা অনেক লোকের এক বছরের বেতনের সমান।"

"এটা কীসের জন্য?"

"বলেছিলাম তো, বইটা চললে তোমার অংশটা তুমি পেয়ে যাবে। আমার সম্মানীর পঁচিশ শতাংশ এটা।"

খামটার দিকে আরেকবার তাকিয়ে মাথা নাড়লাম। "আমি তো তোমাকে বলেছিই, কোনোভাবেই নিজের বিবেক বিক্রি করবো না।"

"এত নাটক করো না তো। কেবল ভাব, এই বইটার পেছনে তোমার অবদানের ব্যাপারে। আজকাল যৌথভাবে উপন্যাস লেখা অপ্রচলিত কিছু নয়। নিজের পাওনা বুঝে নেয়ার অধিকার তোমার আছে।"

"এইটা যৌথভাবে লেখা কোনো উপন্যাস নয়।" হিদাকার দিকে তাকালাম আমি। "এটা একপ্রকার ধর্ষণ। তুমি নিজের ইচ্ছেমত আমাকে ব্যবহার করছো। এরপর এমনভাবে আমাকে পয়সা দিচ্ছ যেন আমি একজন পতিতা।"

"বিশ্রী ও অসভ্য চিন্তাভাবনা!"

"তাই নাকি?"

"চুপচাপ বসে থেকে কেউ কোনোদিন ধর্ষিত হয়নি, কিন্তু তুমি হচ্ছো।"

লজ্জায় পাল্টা কোনো জবাব দিতে পারলাম না।

"বলাই বাহুল্য," অনেক কষ্টে বললাম আমি। "এই টাকাটা আমি নিতে পারবো না।" খামটা ঠেলে দিলাম ওর দিকে।

জিনিসটার দিকে তাকিয়ে থাকল হিদাকা, ওটা উঠিয়ে নেয়ার কোনো ভাব দেখা গেল না ওর মধ্যে, টেবিলেই পড়ে থাকল।

"আসলে এরপর কী হবে এই ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি আমি।"

"তাহলে বল, এরপর কী হবে?" কণ্ঠে যতটা পারা যায় ব্যঙ্গাত্মক সুর এনে বললাম আমি।

"আমাদের পরবর্তি উপন্যাস...একটা মাসিক ম্যাগাজিনের জন্য ধারাবাহিক গল্প লেখার কথা আমার। আমরা কিছু আইডিয়া নিয়ে আলাপ করতে পারি।"

এমনভাবে বলল, যেন আমি ওর গোস্টরাইটার হওয়ার প্রস্তাবে রাজি হয়ে বসে আছি।

মাথা ঝাঁকালাম আমি। "তুমি একজন লেখক, তোমার বোঝা উচিত এরকম মানসিক অবস্থায় কিভাবে কোনো গল্পের আইডিয়া আমার মাথায় আসবে? ভালো গল্পের কথা বাদ-ই দিলাম। জোর করে এসব হয় না। শারীরিক ও মানসিক উভয়ভাবেই এটা অসম্ভব।"

তবুও পিছু হটল না ও, উল্টো অপ্রত্যাশিত একটা কথা বলে বসল। "আমি কিন্তু বলছি না, এক্ষুনি একটা গল্প লিখে দিতে হবে তোমাকে। কিন্তু আগেই লেখা আছে এমনকিছু তো খুঁজে দিতে পার? এটা তো কঠিন হওয়ার কথা না।"

"আমার আর কিছু লেখা নেই, যা ছিল সবই তুমি দেখেছো।"

"আমার সাথে নাটক করবে না। স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য যেগুলো লিখতে সেগুলোর কি অবস্থা?"

"হ্যাঁ?" সত্যিকার অর্থেই অবাক হয়ে বললাম। "ওসব আর নেই আমার কাছে।"

"ধ্যাৎ।"

"সত্যি বলছি। দীর্ঘদিন আগে ওগুলো ফেলে দিয়েছি।"

"দেখো, তোমার কথা বিশ্বাস করছি না আমি। লেখকেরা কখনো তাদের পান্ডুলিপি ফেলে দেয় না। তুমি না স্বীকার করলে আমি তোমার বাড়িতে খুঁজে দেখব। বেশি সময় লাগবে না। হয়তো তুমি ওগুলো ডেস্ক ড্রয়ার বা বুকসেলফের মধ্যে ফেলে রেখেছো।" উঠে দাঁড়িয়ে পাশের রুমে চলে গেল হিদাকা।

আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম আমি। আমার শুরুর দিককার লেখা গল্পগুলো সব একটা স্পাইরাল নোটবুকে রয়েছে। ওই নোটবুক বুকসেলফে রাখা।

"একটু দাঁড়াও," বলে উঠলাম আমি। "ওসব দিয়ে তোমার কোনো লাভ হবে না। ছাত্রাবস্থায় ওই গল্পগুলো লিখেছিলাম। লেখা একেবারে দুর্বল আর প্লটগুলো যাচ্ছেতাই। একজন পরিণত লেখকের কাজ নয় ওগুলো।"

"সিদ্ধান্তটা আমাকেই নিতে দাও। আর আমি কোনো সম্পূর্ণ লেখাও খুঁজছি না, শুধু কিছু কাচামাল দরকার যা আমি ঘষেমেজে ঠিক করতে পারবো। বড় কথা নিভে যাওয়া অনল কখনোই সাহিত্য জগতে ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারত না আমার তুলির শেষ আঁচড় ছাড়া।"

বুঝতে পারলাম না কিভাবে কারো লেখা চুরি করে এত গর্ব করতে পারে কেউ।

ওকে সোফায় বসতে বলে পাশের রুমে চলে এলাম। অফিসের সেলফের ওপর রাখা আছে আমার পুরাতন আটটা নোটবুক। একটা বাছাই করলাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরে ঢুকল হিদাকা।

"তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম আমি।"

কোনো কথা না বলেই সামনে এগিয়ে এসে আমার হাত থেকে

নোটবুকটা ছিনিয়ে নিয়ে পাতা ওল্টাতে থাকল সে, এরপর বুকশেলফের দিকে তাকিয়ে তুলে নিলো বাকি নোটবুকগুলোও।

"আমাকে বোকা বানাতে চাইছিলে, তাই না?" মুখ বিকৃত করে বলল। "তুমি যে নোটবুকটা হাতে নিয়েছিলে ওতে ছিল অগ্নি বলয়ের খসড়া, ঠিক না? তোমার মনে হয় ওইটা দিয়ে আমাকে বোকা বানাতে পারতে?"

ঠোঁট কামড়ে মেঝের দিকে তাকালাম।

"যাইহোক, আমি এগুলো নিয়ে যাচ্ছি। সবগুলোই।"

"হিদাকা," মাথা উঁচু করে তাকিয়ে বললাম। "তোমার কি লজ্জা করে না? তোমার প্রতিভা কি এতটাই কমে গিয়েছে যে এমন কিছু চুরি করতে হচ্ছে যা আমি ছাত্রাবস্থায় লিখেছি?"

কথা দিয়ে ওকে ঘায়েল করতে চাইলাম, অল্প হলেও। তবে এর থেকে বেশি কিছু আর বলতে পারলাম না। তবে প্রভাব পড়ল আমার বলা কথার। জ্বলে উঠল হিদাকার চোখ, কলার চেপে ধরল আমার।

"একজন লেখক হওয়ার অনুভূতি তুমি বুঝবে না।"

"ঠিক বলেছো। আমি বুঝবো না। তবে লেখক হওয়ার মানে যদি তোমার মত কিছু হয়, তবে আমি কখনোই লেখক হতে চাইবো না।"

"লেখক হওয়ার স্বপ্নের কি হল?"

"আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছে।"

আমাকে ছেড়ে দিলো ও। "এতেই বোধহয় ভালো হয়েছে।"

বিড় বিড় করে বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

"দাঁড়াও, এটা নিতে ভুলে গিয়েছ তুমি ," দুই মিলিয়ন ইয়েনের খামটা বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে। আমার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে খামটা তুলে নিলো ও।

ধারাবাহিক উপন্যাসটা শুরু হল দুই বা তিন মাস পরে। পড়ার পর টের পেলাম আমার একটা ছোটগল্পের ওপর ভিত্তি করেই লেখা এটা। ততদিনে হাল ছেড়ে দিয়েছি আমি অথবা বলা চলে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। প্রথম দুটো উপন্যাসের মত অবাক হইনি এটা দেখে। আর লেখক হওয়ার ব্যাপারেও হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম, এজন্য লেখাটা পড়ে মনে হল যাক আমার লেখা

গল্পগুলো কোনো না কোনোভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। তখনও মাঝেমধ্যে কল করত হাতসুমি। স্বামীকে তিরস্কার করে ক্ষমা চাইত আমার কাছে।

একবার সে বলল, "যা হয়েছে সেটার জন্য কখনো যদি আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নাও তবে আমার যে শাস্তিই হোক আমি সানন্দে মাথা পেতে নেবো।"

বুঝতে পারলাম, হাতসুমি এই কথাটা বলেছিল কেন না সে জানত আমাদের সম্পর্কটার ফায়দা লুটছে হিদাকা। আমাকে বাঁচার একটা পথ বানিয়ে দিতে চেয়েছিল হাতসুমি। কথাটা শুনে আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলি। আমাদের দুজনের দীর্ঘদিন দেখা না হলেও আমাদের হৃদয়ের যোগাযোগ মুছে যায়নি।

"তোমাকে এই ব্যাপারে ভাবতে হবে না," তাকে বলি আমি। "কিছু একটা করব...কোনো না কোনো উপায় বের করবই।"

"কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক কিছু সহ্য করেছো তুমি," ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে আসত হাতসুমির কান্নার আওয়াজ।

ওকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করতাম আমি, কিন্তু জানা ছিল না কী বলবো। কোনো উপায় বের করার কথাটা আমার নিজের কাছেই ফাঁপা বুলি বলে মনে হত, হতাশা ভর করত চিত্তে।

ওই সময়ের কথা ভাবলেই আফসোসে ভরে ওঠে মন। ভাবি, কেন হাতসুমির কথা মত কাজ করলাম না। কেন আত্মসমর্পণ করলাম না আমরা। যদি করতাম তাহলে অন্তত আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটা হারানো লাগত না।

দুর্ঘটনার খবরটা পত্রিকা থেকে জানি আমি। যতই হোক, একজন বেস্টসেলার লেখকের স্ত্রী ও, বেশ গুরুত্ব সহকারেই প্রতিবেদনটা ছাপা হয়েছিল। জানি না কতটা ভালোভাবে তদন্ত করেছে পুলিশ, তবে কাউকেই বলতে শুনিনি হাতসুমির মৃত্যু দুর্ঘটনা ব্যতীত অন্য কিছু। কিন্তু খবরটা শোনার মুহূর্তেই আমি জানতাম, এটা দুর্ঘটনা নয়–আত্মহত্যা করেছে ও। কেন, সেটা বলাই বাহুল্য।

এককথায় তাকে খুন করেছি আমি। আমি পাগলের মত হিদাকাকে খুন করতে না গেলে এসব কোন কিছুই ঘটত না।

ওই সময় মরার মত বেঁচে ছিলাম আমি। আমার দেহটা ফাঁকা খোলসের মত হয়ে গিয়েছিল। হাতসুমির মৃত্যুর ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার শক্তিটা পর্যন্ত ছিল না। অসুস্থ হয়ে পড়ি, কাজে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এর মাঝেও লিখতেই থাকে হিদাকা। আমার কাজগুলোর ওপর ভিত্তি করে লেখা উপন্যাস ছাড়া কিছু মৌলিক উপন্যাসও লেখে সে। আমি আর খতিয়ে দেখতে যাইনি কোনটা বেশি জনপ্রিয় হয়েছে।

হাতসুমির মৃত্যুর প্রায় ছয়মাস পর পার্সেলে একটা প্যাকেজ পাই আমি। বড় এনভেলপের ভেতরে ছিল প্রায় ত্রিশটা প্রিন্ট করা পেইজ। ভেবেছিলাম কোনো গল্প হয়ত কিন্তু পড়া শুরু করে বুঝলাম এর থেকেও ভয়াবহ কিছু। হাতসুমির লেখা একটা জার্নাল এটা, এর সাথে রয়েছে হিদাকার লেখা কিছু অংশও। জার্নাল অংশে লেখা আছে এন (আমি) নামক এক পুরুষের সাথে বিশেষ সম্পর্কে জড়ায় হাতসুমি, এই লোকটার সাথে চক্রান্ত করে খুন করতে চায় নিজের স্বামীকে। হিদাকার অংশে লেখা আছে, স্ত্রীর ভালোবাসা বঞ্চিত এক স্বামীর দুঃখগাঁথা। এরপর এসেছে হত্যাচেষ্টার ব্যাপারটা। এতদূর পর্যন্ত কমবেশি সবই সত্য। কিন্তু এরপর যা পড়লাম তার বেশিরভাগই ফিকশন, একেবারে মনগড়া। হাতসুমিকে দেখানো হয়েছে একজন অনুতপ্ত নারী হিসেবে যে স্বামীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছে। লেখা আছে, দীর্ঘ আলাপের পর তাকে ক্ষমা করে আরেকবার নতুন করে সবকিছু শুরুর সিদ্ধান্ত নেয় হিদাকা। সব ঠিকভাবেই চলছিল, তখনই এক দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয় হাতসুমি। লেখাটা শেষ হয়েছে হাতসুমির শেষকৃত্য দিয়ে। ফিকশন হিসেবে খারাপ না। পাঠকদের জন্য উপভোগ্যই।

কিন্তু পুরোটা পড়ার পর বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম আমি। কী করবো এটা দিয়ে?

সেই রাতে ফোন করল হিদাকা। "পড়েছো ওটা?"

"কী লিখেছো এসব? কেন লিখেছো?"

"আগামী সপ্তাহে আমার সম্পাদককে এটা দেয়ার কথা ভাবছি। আগামী মাসে একটা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হবে লেখাটা।"

"পাগল হয়েছ নাকি? জান কী হবে এতে?"

"ভালোভাবেই জানি," শান্তস্বরে বলল ও।

"এটা প্রকাশ করলে আমি সত্যিটা ফাঁস করে দেব।"

"কোন সত্যি?"

"যেটা তুমি আমি দুজনেই জানি...আমার লেখা চুরি করেছো তুমি।"

"এখনও করেছি?" অপ্রস্তুতভাবে বলল ও। "কেউ বিশ্বাস করবে তোমার কথা? কোনো প্রমান আছে তোমার কাছে?"

"প্রমাণ?" ঢোক গিললাম আমি। কিভাবে প্রমাণ করবো আমার লেখা চুরি করেছে হিদাকা। যে দুটো উপন্যাস চুরি করেছে তার কপি আমার কাছে রয়েছে, একটা ওয়ার্ড প্রসেসরে। কিন্তু এতে কি প্রমাণিত হয়? ঠিক তখনই উপলব্ধি হল, হাতসুমির মৃত্যুর সাথে সাথেই আমার ও হিদাকার মধ্যে যা যা ঘটেছে সেসবেরও মৃত্যু ঘটেছে।

"অবশ্য, লেখাটা এখন তোমার ভালো না লাগলে আমার সম্পাদকের কাছে পাঠাবো না। ভালো সময়ের জন্য সবসময়ই অপেক্ষা করতে রাজি আমি।" ও বলার আগেই ধারণা করতে পারলাম কী বলতে চাইছে। "আপাতত পঞ্চাশ পৃষ্ঠার একটা গল্প দাও...ওটাই সম্পাদককে দিই।"

তাহলে এটাই ওর পরিকল্পনা। এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাতে আমি ওর জন্য লিখতে বাধ্য হই। আমার বাধা দেয়ার কোনো উপায় নেই। কারণ কোনোভাবেই জার্নালটা প্রকাশ হতে দিতে পারি না আমি। হাতসুমির স্মৃতির দোহাই দিয়ে হলেও এটা প্রকাশ হতে দেয়া যাবে না।

"কখন দরকার তোমার?" নিরস কণ্ঠে বললাম।

"আগামী সপ্তাহে।"

"এবারই শেষবারের মত?" প্রশ্নটা পুরোপুরি করতেও পারিনি। কিন্তু জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না হিদাকা।

"লেখা শেষ হলে কল দিও," বলে রেখে দিলো ফোন।

ওইদিন-ই কুনিহিকো হিদাকার পুরোদস্তুর গোস্টরাইটার বনে গেলাম আমি। এযাবৎ তার হয়ে সতেরোটা ছোটগল্প ও তিনটা উপন্যাস লিখেছি।

পুলিশের পাওয়া কম্পিউটার ফাইলেই ওগুলো রয়েছে। ডিটেক্টিভ কাগা যদি এটা পড়ে থাকেন তবে আমি নিশ্চিত তিনি ভাবছেন আমি কেন আরেকটু লড়াই করলাম না। সত্যি বলতে, হিদাকার বিরুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সে যা চাইছিল সেটা লিখে দেয়াই সহজ বলে মনে হয়েছিল। এতে হাতসুমির সাথে আমার অতীতটা গোপন থাকত।

বিশ্বাস করা কঠিন হলেও এটাই সত্যি, পরবর্তি দুই-তিন বছরে আমার সাথে হিদাকার সম্পর্কটা সহযোগীর মতো হয়ে যায়। আমাকে এক শিশু সাহিত্যের প্রকাশকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় ও, কেন না এই ঘরানায় ওর আগ্রহ ছিল না। ততদিনে হয়ত একটু অনুতপ্তবোধ করতে শুরু করেছে। অবশেষে একদিন সেই কথাটা তুলল ও, যেটা শোনার অপেক্ষায় ছিলাম আমি।

"পরবর্তি উপন্যাসটা শেষ হলেই তুমি মুক্ত। আমাদের কাজের সম্পর্ক শেষ।"

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমি। "সত্যিই?"

"সত্যি। কিন্তু আমি চাই তুমি শুধু বাচ্চাদের বই লিখবে। আমি যে ধারায় লিখি সেখান থেকে দূরে থাকবে, বুঝলে?"

মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছি। আর একটা বই, এরপরই আমি মুক্ত।

অল্পসময় পরেই বুঝলাম হিদাকার মন পরিবর্তনের কারণ। রাইয়ের সাথে তার বৈবাহিক জীবন ভালো চলছে, পাকাপাকিভাবে ভ্যাঙ্কুবারে চলে যাওয়ার কথা ভাবছে ওরা। ব্যাগ গোছানোর সময় পুরাতন কিছু জিনিস ফেলে যেতে চাইছিল হিদাকা।

মনে হয়, এই নবদম্পতির চেয়ে আমিই বেশি অপেক্ষায় ছিলাম ওদের ভ্যাঙ্কুবারের উদ্দেশ্যে উড়াল দেয়ার দিনটার জন্য।

অবশেষে দিনটা এলো, একটা ডিস্কে করে 'তুষারদ্বার'-এর পরবর্তি কিস্তি নিয়ে রওনা হলাম হিদাকার বাড়ির উদ্দেশ্যে। শেষবারের মত কম্পিউটার ফাইল দিতে চলেছি তাকে। যেহেতু আমার নিজস্ব কম্পিউটার নেই, হিদাকা

কানাডা চলে গেলে পান্ডুলিপির বাকি অংশগুলো তাকে ফ্যাক্স করে পাঠাতে হবে। 'তুষারদ্বার' লেখা শেষ হলেই আমি মুক্ত।

হিদাকার হাতে ডিস্কটা দেয়ার পর তাকে বেশ চনমনে দেখাল। ভ্যাঙ্কুবারে তার নতুন জায়গার ব্যাপারে কিছুক্ষণ আলাপের পর জিজ্ঞেস করলাম, "আমার জিনিসগুলো তো আজকে ফেরত দিয়ে দেবে, নাকি?"

"কোন জিনিস?" যদিও কোনোভাবেই এগুলোর ব্যাপারে ভোলার কথা নয় ওর। তবু জল ঘোলা না করলে ওর ভালো লাগে না।

"আমার নোটবুকগুলো। ভালোমতোই জান, কী বলছি।"

"নোটবুক?" এমন ভাব করল যেন ও বুঝতে পারেনি। "আহ্? মনে পড়েছে। দীর্ঘদিন ওগুলো দেখা হয়নি।"

ড্রয়ার খুলে আটটা স্পাইরাল নোটবুক বের করল।

নোটবুকগুলো বুকের সাথে চেপে ধরলাম আমি। এবার সমতায় এলো সবকিছু। হয়তো ওর লেখা চুরির ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারবো।

"খুশি দেখাচ্ছে তোমাকে," বলল হিদাকা।

"বলতে পার।"

"আচ্ছা। আমি ভাবছি ওগুলো ফেরত পাওয়ার জন্য এত মরিয়া হয়ে উঠেছো কেন তুমি?"

"কারণটা কি স্পষ্ট নয়? তোমার বইগুলো আমার গল্পের ওপর ভিত্তি করে লেখা ওগুলো সেটার প্রমাণ।"

"এই তাহলে ব্যাপার," আবারও হাসল সে। "ঘটনাটা যদি উল্টো ঘটে? কেউ যদি ভাবে, তুমি বইগুলো পড়ে নিজের মত করে ওই নোটবুকে গল্পগুলো লিখেছো?"

"কী?" শীতল স্রোত বয়ে গেল আমার মেরুদণ্ড বেয়ে। "এভাবে ব্যাপারটা উপস্থাপন করতে চাও তুমি?"

হতবাক দেখাল হিদাকাকে। "কেন কারোর কাছে কিছু উপস্থাপন করতে যাব আমি? তুমি যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে জানাও তখন হয়ত এভাবে

আত্মপক্ষ সমর্থন করবো। কে সত্যি বলছে আর কে মিথ্যে, সেটা যাচাই করা ওই তৃতীয় ব্যক্তির মাথাব্যথা। এই ব্যাপারে এখন আমি আর তর্ক করতে চাই না। তোমাকে বুঝতে হবে, এই নোটবুকগুলো দিয়ে আমার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র সুবিধাও করতে পারবে না।"

"হিদাকা," ওর দিকে তাকালাম। "আমি আর তোমার গোস্টরাইটার নই।"

"জানি। তুষারদ্বার-ই শেষ। সমস্যা নেই।"

"তাহলে এত কথা কিসের?"

"কিছুই না। শুধু একটা বিষয় মনে রাখবে, আমাদের মধ্যেকার পরিস্থিতির কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয়নি।"

হিদাকার মুখের শীতল হাসি দেখেই বুঝতে পারলাম, আমাকে ছাড়ার কোনো বাসনা ওর নেই। দরকার পড়লে আবারও আমাকে ব্যবহার করবে।

"ওই টেপ আর ছুরিটা কোথায়?" জিজ্ঞেস করলাম।

"কোন টেপ আর ছুরি?"

"নাটক করবে না। ভালোমতোই জান কীসের কথা বলছি।"

"ওহ, ওগুলো...নিরাপদ স্থানে রাখা আছে। শুধু আমি জানি, কোথায় আছে।"

ঠিক সেই সময় দরজায় নকের আওয়াজ পাওয়া গেল। রাই উঁকি দিয়ে বলল মিয়াকো ফুজিও এসেছে।

সম্ভবত ওই মহিলার সাথে দেখা করতে চাইবে হিদাকা, কেন না এখন আমাকে অফিস থেকে বের করার একটা অজুহাত দরকার তার।

রাগ গিলে নিয়ে রাইকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। আমাকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে রাই, ডিটেক্টিভ কাগা এই তথ্যটা জানেন।

এরপর বাগান পেরিয়ে চলে যাই হিদাকার অফিসের জানালার কাছে। জানালার আড়ালে লুকিয়ে শুনতে থাকি মিয়াকো ফুজিওর সাথে কী ব্যাপারে আলাপ করছে হিদাকা। যেমনটা ভেবেছিলাম, ফুজিওর অভিযোগের

প্রতিক্রিয়ায় বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল হিদাকাকে। অভিযোগের বিষয়বস্তু ছিল তার হয়ে আমার লেখা উপন্যাস নিষিদ্ধ প্রান্তরের ব্যাপারে। এই বিষয়ে আলাপ করার মত হিদাকার জ্ঞান নেই বললেই চলে।

এক সময় চলে যায় ফুজিও, স্পষ্টতই বিরক্ত দেখাচ্ছিল তাকে। এরপর দ্রুতই হোটেলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায় রাই। বাথরুমে যাওয়ার জন্যে অফিসের বাইরে পা রাখে হিদাকা।

ভাবি, সবকিছু চিরতরে শেষ করে দেবার এটাই সুযোগ। হিদাকার পিছু নেই আমি। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে সারাজীবনেও হিদাকার হাত থেকে মুক্তি মিলবে না।

ভাগ্য ভালো জানালা খোলা ছিল। ভেতরে ঢুকে দরজার আড়ালে লুকাই আমি, হাতে ছিল পিতলের পেপারওয়েটটা। এরপর যা ঘটল সেসব আর বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। বলা বাহুল্য, হিদাকা বের হওয়ার সাথে সাথেই তার মাথার পেছনে সজোরে আঘাত হানি। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে সে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য ফোনকর্ড গলায় চেপে শ্বাসরোধ করি ওর। এরপর ডিটেক্টিভ কাগার অনুমান মতই সব ঘটেছে। হিদাকার কম্পিউটার ব্যবহার করে নিজের অ্যালিবাই তৈরি করি আমি। যে কৌশলটা খাটিয়েছি সেটা ভেবে রেখেছিলাম একটা কিশোর রহস্য উপন্যাসের জন্য। হ্যাঁ, ঠিক, এই কৌশল প্রয়োগ করে বোকা বানানো যেত বাচ্চাদের। হাসি পেলে হাসতে পারেন।

মনে মনে প্রার্থনা করতাম, সন্দেহভাজনের তালিকা থেকে আমাকে বাদ দিতে এটা যেন যথেষ্ট হয়। এটাও আশা করেছিলাম, হিদাকার ওপর প্রথমবার হত্যাচেষ্টা চালানোর ব্যাপারটা আলোর মুখ না দেখুক। এজন্যই রাইকে বলি কানাডা থেকে হিদাকার ভিডিও টেপ ফিরে এলে আমাকে জানাতে।

এতকিছুর পরও ডিটেক্টিভ কাগা দক্ষ হাতে সমাধান করে ফেললেন সব নিগূঢ় রহস্যের। তার অনুমান ক্ষমতা দুর্দান্ত, এতই দারুণ যে আমি এই

দক্ষতাকে ঘৃণা করি। তবে ডিটেক্টিভকে দোষ দেয়ার কিছু নেই।

এই স্বীকারোক্তির শুরুতে যেমনটা বলেছি, আমার কুকর্মের ভিডিও টেপটা দেখে আমি নিজেও চমকে উঠেছিলাম। কেন না টেপটা ছিল 'সমুদ্রের ডাক' বইয়ের একটা কপির ভেতরকার ফাঁকা অংশে। 'সমুদ্রের ডাক' হিদাকার নিজের লেখা নতুন উপন্যাস। উপন্যাসের প্লট ছিল মূল চরিত্রের স্ত্রী আর স্ত্রীর প্রেমিককে নিয়ে। আমার বিশ্বাস, জানালায় আমার যে প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল সেটাই ডিটেক্টিভ কাগাকে সত্যের দিকে নিয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর পরও আমাকে ধ্বংস করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল হিদাকা। অবশেষে সফল হল ও।

যা বলার ছিল বলে ফেলেছি। আমি আমার মোটিভ গোপন করেছিলাম, কারণ আমি হাতসুমির ব্যাপারে সত্যটা লুকাতে চেয়েছি। আমার জন্য যেসব অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে সেসবের জন্য আমি দুঃখিত। আশা করি এই লেখাটা আমার মনের অবস্থাটা সবাইকে বোঝাতে সাহায্য করবে।

যেকোনো শাস্তি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আমি।

অধ্যায় ৬

অতীত (প্রথম পর্ব)
কিয়োচিরো কাগার নোট
১৪ মে

মিডল স্কুলটাতে গিয়েছিলাম আজ, যেখানে চাকরী করত নোনোগুচি। কেবলই ক্লাস শেষ হয়েছে, গেটের কাছে ভিড় করে রয়েছে শিক্ষার্থীরা। খেলার মাঠের ট্র্যাকে রয়েছে কয়েকজন। ফ্রন্ট অফিসে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম এমন কারোর সাথে কথা বলা যাবে কি না যার সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল মিস্টার নোনোগুচির। অফিসের মহিলাটি ভেতরে চলে গেল আরেকজন শিক্ষকের সাথে আলাপ করতে। একটু পর দুজনেই চলে গেল টিচার্স অফিসে। অপেক্ষাটা বিরক্তিকর কিন্তু পাবলিক স্কুলগুলোতে এভাবেই চলে সবকিছু। মোটামোটি আরও মিনিট বিশেক অপেক্ষার পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হল একটা মিটিংরুমে।

স্কুল হেডমাস্টারের সাথে দেখা করলাম আমি, লোকটার নাম এতো। তার সাথে রয়েছে আরেকজন লোক, নাম ফুজিওয়ারা, প্রবন্ধ লেখা শেখায় সে। ধারণা করলাম এই লোকটাকে হেডমাস্টার এখানে ডেকেছে স্কুল বোর্ড পার্টির সদস্য হিসেবে।

প্রথমেই দুজনকে জিজ্ঞেস করলাম কুনিহিকো হিদাকার খুন সম্পর্কে তারা জানে কি না। জানে তারা। বলা ভালো, বেশ বিস্তারিতই জানে। আমাকে জানাল, ওনারা অবগত আছেন হিদাকার গোস্টরাইটার ছিল নোনোগুচি। আর হিদাকার প্রতি অসন্তোষই ছিল খুনের মোটিভ। আমার মনে হল এরা আমার থেকে বিস্তারিত জানার জন্য আগ্রহী।

জিজ্ঞেস করলাম নোনোগুচি গোস্টরাইটার হিসেবে কাজ করার সময় তার মধ্যে কোনো বিশেষ কিছু লক্ষ করেছিল কি না।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ফুজিয়ারা বলল, "আমি জানতাম সে উপন্যাস লিখছে। এমনকি বাচ্চাদের ম্যাগাজিনে তার কয়েকটা লেখা পড়েছিও, তবে আমার কোনো ধারণাই ছিল না সে একজন গোস্টরাইটার। বিশেষ করে হিদাকার মত বিখ্যাত কোনো লেখকের।"

"মিস্টার নোনোগুচিকে কখনো কিছু লিখতে দেখেছেন?"

"নাহ। স্কুলে থাকার সময় সে শিক্ষকতা নিয়েই ব্যস্ত থাকত। সম্ভবত কাজের পর অথবা সপ্তাহান্তে বাসায় বসে লিখত।"

"তাহলে বলছেন স্কুলে তার কাজের চাপ কম ছিল?"

"স্কুলে তার কাজের চাপ কম ছিল এমন কিছু বলছি না। তবে স্কুলের শিক্ষাবহির্ভুত কার্যক্রমগুলো থেকে কৌশলে নিজেকে দূরে রাখত সে। আর প্রতিদিন দ্রুতই বাসায় চলে যেত। বিশেষ করে গত বছরের শুরুর দিক থেকে। তার শারীরিক অবস্থা যদিও ভালো ছিল না, কিন্তু আমরা জানতাম কি সমস্যা ছিল তার। ফলে তার ব্যাপারে সবাই একটু ছাড়-ই দিত। আসলে ওই অতিরিক্ত সময়ে সে কুনিহিকো হিদাকার জন্য উপন্যাস লিখত। বাহ, দারুণ!"

"আপনি বললেন গতবছরের শুরুর দিক থেকে সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেত, এই ব্যাপারটার কোনো রেকর্ড আছে আপনাদের কাছে?"

"আমরা এখানে টাইম কার্ডের মত কিছু ব্যবহার করি না। ফলে এর কম কিছু নেই। তবে আমি অনেকটাই নিশ্চিত ওই সময়ের দিকেই এটা শুরু হয়। প্রবন্ধের টিচারদের প্রত্যেক সপ্তাহে দুইবার মিটিংয়ে বসতে হয়। ওই সময়ের দিকে সে মিটিংয়ে আসা বন্ধ করে দেয়।"

"কিন্তু ওই সময়ের আগে সে নিয়মিত আসত?"

"সে সক্রিয় সদস্য ছিল না, তবে...হ্যাঁ, আসত।"

ওসামু নোনোগুচির আচরণের ব্যাপারে:

"সে নিজের মত থাকত। ফলে বোঝা সম্ভব নয় সে কী ভাবছে। একাধিকবার তাকে জানালা দিয়ে আনমনে বাইরে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি। নিশ্চিতভাবেই কোনকিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিল সে। তবে কখনোই নোনোগুচিকে একজন খারাপ মানুষ বলে মনে হয়নি। সম্ভবত বুঝতে পারছি,

বছরের পর বছর এভাবে চলতে থাকার পর হঠাৎ-ই ভেঙে পড়ে। তাই বলে ওর করা খুনকে সমর্থন করছি না আমি।" হাসল ফুজিয়ারা। "আমি হিদাকার বেশ কয়েকটি উপন্যাস পড়েছি। ভালো লেগেছিল। কিন্তু ওসব মিস্টার নোনোগুচি লিখেছে জানার পর ওগুলোর প্রতি মনোভাব বদলে গিয়েছে আমার।"

দুজনকেই ধন্যবাদ দিয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে গেলাম আমি।

ফেরার পথে একটা বড় স্টেশনারি শপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ভেতরে ঢুকলাম। দোকানের মহিলাকে দেখালাম ওসামু নোনোগুচির ছবি। জিজ্ঞেস করলাম, গতবছর এই লোক দোকানে আসত কি না। মহিলা জানাল লোকটাকে চেনাচেনা লাগছে, তবে স্পষ্ট মনে নেই তার।

১৫ মে

আজ রাই হিদাকার সাথে দেখা করতে এসেছি। গত সপ্তাহ থেকে ইয়োকোহামার একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকছে রাই। যা ঘটেছে সেটার ধকল কাটাতেই জায়গা বদলেছে সে। ফোনে বড্ড বিমর্ষ শোনাচ্ছিল তার কণ্ঠস্বর। আমার মনে হল, আমি কোনো সাংবাদিক হলে আমার সাথে দেখা করতে চাইত না সে। তার অ্যাপার্টমেন্টের কাছাকাছি এক শপিং সেন্টারের ক্যাফেতে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিই আমরা। আমাকে জানায়, নিজের অ্যাপার্টমেন্ট কিংবা বিল্ডিংয়ের কাছেও আমার সাথে দেখা করা সম্ভব নয় তার। আমাদেরকে কেউ লক্ষ করতে পারে ভেবে ভয় পাচ্ছিল।

ক্যাফেটা একটা বুটিকের দোকানের পাশে। মূল্যহ্রাস চলছে বুটিক শপে। কিন্তু জায়গাটা শপিং সেন্টারের একটু কোণ ঘেঁষে হওয়ায় বাইরের কেউ আমাদেরকে দেখতে পারবে না। ক্যাফের ভেতরে রয়েছে ডিসপ্লে ও ডিভাইডার। লোকজনের নজর এড়িয়ে কথা বলার মত ভালো জায়গা এটা। পিছনের একটা টেবিলে মুখোমুখি বসলাম আমরা। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম কী অবস্থা তার।

সে ম্লান হেসে জবাব দিলো, "ভালোই। সত্যি বলতে এই সার্কাস শেষ হওয়ার অপেক্ষায় আছি।

"যেকোনো তদন্ত শুরু হলেই শেষ হতে সময় লাগে।"

বিরক্তির সাথে মাথা নেড়ে বলল সে, "কেউ কি বোঝে এখানে আমরাই ভিক্টিম? সবাই ব্যাপারটাকে সেলিব্রেটি স্ক্যান্ডাল হিসেবে নিয়েছে আর এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন আমার স্বামীই দোষী।"

কথাটা সত্যি। পত্রপত্রিকা বা টিভির খবরে কুনিহিকো হিদাকার খুনের চেয়ে তার লেখা চুরির ব্যাপারেই বেশি কথা হচ্ছে। সেইসাথে ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলো তার সাবেক স্ত্রীর পরকীয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে একেবারে।

"এগুলো মাথা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করুন।"

"বিশ্বাস করুন, সেটাই করছি। না করলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে আমার। কিন্তু মিডিয়াই একমাত্র সমস্যা নয়।"

"আর কিছু ঘটেছে?"

"শুধু কিছু না, অনেক কিছু। অসংখ্য ফোনকল আর চিঠি আসছে। হুমকি-ধামকি দিয়ে একাকার করে দিচ্ছে লোকজন। জানি না আমার বাবা-মার ফোন নম্বর ও ঠিকানা পেল কিভাবে ওরা। এখন বাবা-মার বাড়িতে ফোন করছে ও চিঠি পাঠাচ্ছে লোকে। সম্ভবত এই দুষ্কৃতিকারীরা জেনেছে আমি এখন আর পুরানো বাড়িটাতে থাকছি না।"

"পুলিশকে জানিয়েছেন?"

"পুলিশকে জানানো হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারে পুলিশ সেভাবে কিছু করতে পারবে না।"

তার কথাই ঠিক, কিন্তু সেটা স্বীকার করলাম না। "কি বলা হয়েছে ওসবে, মানে চিঠিগুলোতে আরকি?"

"ওহ, অনেক কিছু। কিছু মানুষ চায় বই থেকে পাওয়া সব সম্মানী ফিরিয়ে দেয়া হোক। আর বাকিরা ক্ষেপে গিয়েছে, ওদের মতে আমার স্বামী ওদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। অনেক মানুষ বক্সে ভরে বইগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে। কেউ কেউ আবার দাবি করেছে হিদাকার জেতা সব সম্মাননা যেন ফিরিয়ে দেয়া হয়।"

আমার মতে এসব লোকদের বেশিরভাগ-ই তার স্বামীর লেখা অথবা সাহিত্যের ভক্তই নয়। আমি নিশ্চিত, এদের অনেকে খুন হওয়ার আগে কুনিহিকো হিদাকার নাম পর্যন্ত শোনেনি। এরা অন্যদের দেখে এই মহিলাকে এভাবে উত্যক্ত করছে। বাস্তব জীবনে এই মানুষগুলো অসুখি, কারোর জীবন দুর্বিষহ করে তোলার কোনো সুযোগ এরা ছাড়ে না। ভিক্টিম হিসেবে বিবেচনা করা দূরে থাক, রাই হিদাকা কে, এটা ওদের কাছে কোনো ব্যাপারই নয়।

রাইকে এটা বললাম, একমত হল সে।

"হাস্যকর হলেও সত্যি, আমার স্বামীর বই এখনো ভালো বিক্রি হচ্ছে। সম্ভবত লোকের অসীম কৌতূহল-ই এর কারণ।"

আমিও শুনেছি হিদাকার বইয়ের বিক্রি বেড়েছে। বুকস্টোর শেলফে যে বইগুলো আছে ওগুলোই তার বইয়ের একমাত্র কপি। প্রকাশকেরা জানিয়ে দিয়েছে, হিদাকার বই আর রিপ্রিন্ট হবে না। ওই সম্পাদকের কথা ভাবলাম, যে এই গোস্টরাইটার থিওরিটা মানতে নারাজ ছিল। বর্তমানে একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছে সে।

হঠাৎ করেই একটা চমকপ্রদ খবর দিলো রাই, যদিও কথাটা স্বাভাবিকভাবেই বলল সে, "কয়েকদিন আগে মিস্টার নোনোগুচির এক আত্মীয়ের থেকে লিগ্যাল নোটিশ পেয়েছি আমি।"

"কী বলা আছে এতে?"

"আমার স্বামীর বই থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দাবি করছে ওরা। ওদের মতে, বইগুলোর জন্য অগ্রিম যা নেয়া হয়েছিল অন্তত ওটুকু ওদের প্রাপ্ত। নোনোগুচির মামা হল ওদের মুখপাত্র।"

মিস্টার নোনোগুচি বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান। তার বাবা-মা উভয়েই মৃত। এই মামাই তার একমাত্র আত্মীয়। তারপরও যে লোকটা তার স্বামীকে খুন করেছে তার পক্ষ থেকে পাওয়া এই অনুরোধটি এই বিধবা মহিলার জন্য অদ্ভুতই। স্বার্থ হাসিলের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে সবাই, ভাবলাম আমি।

"আপনি কিভাবে জবাব দিয়েছেন?"

"বলেছি আমার আইনজীবী যোগাযোগ করবে।"

"ভালো বলেছেন।"

"সত্যি বলতে আমি খুব অবাক হয়েছি। জীবনেও শুনিনি কেউ ভিক্টিমের পরিবারের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে!"

"এই কেসটাই একটু অস্বাভাবিক। আর এর আইনী বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমি নিজেও নিশ্চিত নই। তবুও ওদেরকে আপনি কিছু দিলে আমি খুবই অবাক হব।"

"আমি নিজেও...কিন্তু টাকাটা সমস্যা না। সমস্যা হল, সবাই ভাবছে আমার স্বামী খুন হয়েছে তার নিজের দোষেই। মিস্টার নোনোগুচির মামাকে একবিন্দুও অনুতপ্ত লাগেনি।"

চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল রাই হিদাকার, ঠোঁট কামড়ে ধরেছে সে। দুঃখের থেকে রাগের পরিমাণ বেশি তার চোখে, দেখে ভালো লাগল। আমি চাইনি, ক্যাফেতে কান্নায় ভেঙে পড়ুক সে।

"কথাটা আপনাকে আগেও বলেছি, মিস্টার কাগা...আমি বিশ্বাস করি না আমার স্বামী কারোর কাজ চুরি করেছে। নিজের লেখা নতুন বইয়ের ব্যাপারে কথা বলার সময় চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত তার, একেবারে বাচ্চাদের মত। আমি জানি, গল্প লিখতে সত্যি ভালোবাসত সে।"

মাথা নেড়ে সায় জানালাম। তার অনুভূতি বুঝতে পারছি।

তবে মনে হল, আমি তার সাথে একমত এই কথাটা বলা ঠিক হবে না। সম্ভবত ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরেছে। নিজ থেকেই কথা বলা বন্ধ করে দিলো এই প্রসঙ্গে। জিজ্ঞেস করল কেন দেখা করতে চেয়েছি তার সাথে।

জ্যাকেটের পকেট থেকে কিছু কাগজ বের করে টেবিলে রাখলাম। "দয়া করে কাগজগুলো একটু দেখবেন।"

"কী এটা?"

"যা ঘটেছে সেই ব্যাপারে ওসামু নোনোগুচির স্বীকারোক্তি।"

ভ্রু কুঁচকে তাকাল রাই হিদাকা, স্পষ্টতই বিরক্ত সে। "না দেখাই ভালো। নিশ্চিত আমার স্বামী তার সাথে যা করেছে সেসবেরই লম্বা ফিরিস্তি রয়েছে এতে। তাছাড়া পত্রিকায় যা এসেছে আমি সেসব পড়েছি।"

"মনে হয় গ্রেফতার হওয়ার পর মিস্টার নোনোগুচির স্বীকারোক্তির কথা বলছেন আপনি। এইটা আলাদা। এটা সে লিখেছিল খুনটা করার পর পুলিশকে তার থেকে দূরে সরানোর জন্য।"

মনে হল বুঝতে পেরেছে সে, তবুও বিরক্তির ছাপ গেল না চোখ থেকে। "আচ্ছা। কিন্তু যা কোনো কাজে আসবে না সেটা পড়ে লাভ কি?"

"আপনার সংশয় বুঝতে পারছি আমি। তবে একবার পড়ে নিলে ভালো হয়। বেশি বড় নয় লেখাটা। দ্রুতই পড়ে ফেলতে পারবেন।"

"আপনি চাইছেন এখানে বসেই পড়ি এটা?"

"হ্যাঁ, যদি সম্ভব হয়।"

মাথা নাড়ল সে, কিন্তু আর কিছু বলল না। কাগজটা উঠিয়ে পড়তে আরম্ভ করল। পনেরো মিনিট পর তাকাল সে। "আচ্ছা। এখন কী?"

"মিস্টার নোনোগুচি স্বীকার করেছে এতে লেখা তার সাথে মিস্টার হিদাকার কথোপকথনের বর্ণনাটা বানোয়াট। আসল কথোপকথনটা এত সহজ ছিল না তাদের মধ্যে, বরং উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছিল।"

"ওরকমই লাগছে।"

"সেইসাথে আপনাদের বাড়ি থেকে তার বেরিয়ে যাওয়ার বর্ণনা আসল ঘটনার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যদিও আপনি তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু এই লেখাতে সে দাবি করেছে আপনি তাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন গেট পর্যন্ত।"

"ঠিক, এই ব্যাপারে আগেও কথা হয়েছে আমাদের।"

"এই বিষয়ে বলার মত আর কিছু আছে? যা ঘটেছে সেই স্মৃতি থেকে ভিন্ন কিছু?"

"তাকে এগিয়ে দেয়া বাদে?" বিভ্রান্ত দেখাল তাকে। কাগজটার দিকে চোখ বুলালো একবার, এরপর মাথা নাড়ল। "নাহ, আর কিছু দেখছি না।"

"এমন কিছু কি রয়েছে যা সেদিন মিস্টার নোনোগুচি বলেছে বা করেছে কিন্তু সেটা এখানে লেখা নেই? মনে পড়ে কিছু? এমনকি ছোটখাট কিছুও হয়ত তদন্তে কাজে আসবে। যেমন সে বাথরুমে গিয়েছিল কি না, এই ধরনের ঘটনা।"

"ওরকম কিছু ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে মনে হয় না বাথরুম ব্যবহার করেছে সে।"

"ওখানে তাকে কোনো ফোনকল করতে দেখেছেন বা শুনেছেন?"

"আমার স্বামীর অফিস থেকে ফোন করতে পারে সে, আমার জানার কথা নয় এটা।"

রাই হিদাকার কাছে ওই দিনটা আর দশটা সাধারণ দিনের মতোই ছিল। নিশ্চিতভাবেই সবকিছু বিস্তারিত মনে নেই তার।

আলাপ শেষ করতে চাইছিলাম, ঠিক তখনই আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল রাই, "একটা ব্যাপার।"

"হ্যাঁ?"

"যদিও আমি নিশ্চিত কেসের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।"

"আপনার বলা যেকোনো কিছুই কাজে আসতে পারে।"

"আচ্ছা, ওইদিন যাওয়ার সময় মিস্টার নোনোগুচি আমাকে এক বোতল শ্যাম্পেইন দেয়। বলে এটা উপহার।"

"আপনি নিশ্চিত এটা ওইদিনের-ই ঘটনা?"

"হ্যাঁ, একদম নিশ্চিত।"

"আপনি বললেন যাওয়ার সময় দিয়েছিল সে। আরেকটু বিস্তারিত বলতে পারবেন?"

"মিস ফুজিও অফিসে ঢোকার পর সে বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই ঘটে এটা। একটা কাগজের ব্যাগে ছিল জিনিসটা, দেখে মনে হচ্ছিল কেবলই কিনে আনা হয়েছে। সে নাকি আমার স্বামীর সাথে আলাপে এতই মগ্ন ছিল, তাকে দিতে ভুলে গিয়েছে। এরপর বলে, হোটেলে রাতে যেন এইটা আমি ও আমার স্বামী মিলে পান করি।"

"জিনিসটা কি করেছেন আপনি?"

"অবশ্যই গ্রহণ করি উপহারটা, এরপর হোটেলে নিয়ে যাই।হোটেলের রেফ্রিজারেটরে রাখি। ওই ঘটনার পর আর। হোটেলে ফেরা হয়নি আমার। পরে হোটেল কর্তৃপক্ষ ফোন দেয় এটার ব্যাপারে। আমি ওদেরকে বলি, জিনিসটা নিয়ে ওরা যা খুশি করতে পারে।"

"তাহলে জিনিসটা পান করেননি?"

"আমি? নাহ। আমি ওটা ঠান্ডা করার জন্য রেখেছিলাম, রাতে হিদাকা হোটেলে ফিরলে যেন একসাথে পান করতে পারি।"

"মিস্টার নোনোগুচি কি আগে উপহার হিসেবে অ্যালকোহল এনেছে কখনো?"

"যতদূর জানি ওইবার-ই প্রথম। মিস্টার নোনোগুচি পান করে না।"

"আচ্ছা।"

স্বীকারোক্তিত নোনোগুচি বলেছে প্রথমবার হিদাকার বাড়িতে যাওয়ার সময় সাথে করে এক বোতল স্কচ নিয়ে যায় সে। অবশ্যই রাই সেসময় সেখানে ছিল না। তাকে জিজ্ঞেস করলাম ওইদিনের এমন কোনো ঘটনা মনে পড়ছে কি না যা লেখা নেই। অনেকক্ষণ ধরে ভাবল সে, কিন্তু অবশেষে জানাল বলার মত আর কিছু নেই। এরপর জিজ্ঞাসা করল কেন আমি তাকে এখন এসব জিজ্ঞেস করছি।

"একটা কেস ক্লোজ করার আগে অনেক পেপারওয়ার্ক করতে হয়। এ ধরণের সত্যতা যাচাই সেই প্রক্রিয়ারই অংশ।"

মনে হল না আমার ব্যাখ্যায় সন্দেহ করল সে।

তার সাথে আলাপ শেষ করে, তাকে আরেকবার সান্ত্বনা জানিয়ে চলে গেলাম। শপিং সেন্টার থেকে বেরিয়েই কল করলাম ওই হোটেলে। খুন হওয়ার দিন যেখানে রাত কাটানোর কথা ছিল হিদাকার। জিজ্ঞেস করলাম শ্যাম্পেনের ব্যাপারে। কিছুক্ষণ সময় লাগলেও ওই রাতে যে ম্যানেজার ডিউটিতে ছিল ডেকে দেয়া হল তাকে। একজন পেশাদারের মত স্পষ্ট কণ্ঠে কথা বলল সে। "আমার মনে হয় এটা ডন পেরিয়ন রোজের শ্যাম্পেইন ছিল। রুম রেফ্রিজারেটরে পাওয়া যায় জিনিসটা। বেশ দামি বোতল আর মুখ খোলা হয়নি এর। ফলে আমি কল করলাম ওই রুমের অতিথিকে। সে আমাকে জানালো এটা দেখা মাত্রই ফেলে দেয়া উচিত ছিল আমার।"

তাকে জিজ্ঞেস করলাম কি করেছে ওই শ্যাম্পেইন নিয়ে। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে জিনিসটা বাসায় নিয়ে গিয়েছে বলে জানাল সে। এরপর জানতে চাইলাম সেটা পান করেছে কি না।

দুই সপ্তাহ আগে পান করেছে বলে জানালো। ফেলে দেয়া হয়েছে বোতলটা। "আমার কি এমনটা করা উচিত হয়নি?"

"নাহ, কোনো সমস্যা নেই। শ্যাম্পেইনটা ভালো ছিল?"

"হ্যাঁ, খুব ভালো ছিল।"

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিলাম।

বাড়ি ফিরে ফরেন্সিকের পাঠানো ভিডিওটা দেখতে লাগলাম। হিদাকার বাড়িতে ওসামু নোনোগুচির অনুপ্রবেশের ভিডিও। অসংখ্যবার রিওয়াইন্ড করে দেখেছি ভিডিওটা। বারবার খালি ওই একই নিরস দৃশ্যই চোখে পড়েছে আমার।

১৬ মে

দুপুর একটার একটু পর ইলেবুকোরোতে অবস্থিত ইয়োকোদা রিয়েল এস্টেট ব্রাঞ্চে পৌঁছালাম। ছোট্ট অফিসটাতে দুটো ডেস্ক রয়েছে কাউন্টারের পেছনে। ডেস্ক দুটো জানালার দিকে। ওই জানালা দিয়ে রাস্তা দেখা যায়। ভেতরে গিয়ে মিয়াকো ফুজিওকে পেলাম। একাই কাজ করছে সে। মহিলা জানাল, সবাই ক্লায়েন্টকে নিয়ে বাইরে গিয়েছে। অফিস ফেলে তার পক্ষে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। ফলে কাউন্টারের সাথে থাকা টেবিলে বসেই কথা বললাম আমরা। বাইরে থেকে আমাকে দেখলে মনে হবে মলিন ধরনের এক লোক সস্তা অ্যাপার্টমেন্টের খোঁজে এসেছে।

সরাসরি প্রসঙ্গে চলে এলাম। "নোনোগুচির স্বীকারোক্তির ব্যাপারে জানা আছে আপনার?"

মাথা নেড়ে সায় জানাল সে। টানটান হয়ে গেল তার চেহারা। "পত্রিকায় যা এসেছে ওটুকু পড়েছি।"

"এই ব্যাপারে আপনার মনোভাব কি?"

"তেমন কিছু নয়। তবে আমি বেশ অবাক হয়েছি। আমার ধারণাই ছিল না 'নিষিদ্ধ প্রান্তর' অন্য কারোর লেখা।"

"নোনোগুচি আমাদের বলেছে কুনিহিকো হিদাকা আপনাকে তার ওই উপন্যাসটার ব্যাপারে বিস্তারিত বলতে পারেনি কারণ এটা তার কাজ নয়। তার সাথে এই উপন্যাস নিয়ে আপনার কথা বলার অভিজ্ঞতাটা কেমন?"

"আসলে আমি ঠিক বলতে পারবো না। আমার সাথে কথা বলার সময় এমনিতেও মিস্টার হিদাকা খুব বেশি গভীরে যেত না। তবে এটা কোনো কিছুই প্রমাণ করে না।"

"আগে কখনো মিস্টার হিদাকার সাথে আলাপের সময় কোনো কিছু অদ্ভুত লেগেছে আপনার কাছে?"

"ঠিক মনে পড়ছে না। এভাবে বলা কঠিন। তবে কখনো কল্পনাই করিনি মিস্টার হিদাকা ওই উপন্যাসটার আসল লেখক নন। ফলে আমার অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ না করার সুযোগই বেশি।"

এর জন্য তাকে দোষারোপ করা যায় না। "উপন্যাসগুলোর আসল লেখক মিস্টার নোনোগুচি, এটা জানার পর কিছু কি মনে হচ্ছে?"

"এটাও বলা কঠিন। মিস্টার নোনোগুচি আর আমার ভাই একই স্কুলে পড়ত। ফলে উপন্যাসগুলো তার পক্ষে লেখা অবশ্যই সম্ভব। এমন নয় যে মিস্টার হিদাকাকেও আমি খুব ভালো করে চিনি।"

মিস ফুজিওর কাছ থেকে নতুন তথ্য পাওয়ার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। এমন সময় সে বলে উঠল, "যদি মিস্টার হিদাকা উপন্যাসটা না-ই লিখে থাকেন, তাহলে কোনো মন্তব্য করার আগে ওগুলো আমাকে আবারও পড়তে হবে। আমার মনে হয়েছে উপন্যাসের একটা চরিত্র মিস্টার হিদাকার আদলে তৈরি।"

"কিভাবে? চরিত্রটার ব্যাপারে একটু বিস্তারিত বলতে পারবেন?"

"বইটা পড়েছেন?"

"না, পড়িনি। যদিও সারসংক্ষেপটা দেখেছি। আরেকজন ডিটেক্টিভ বইটা পড়ে আমাদের জন্য সারসংক্ষেপ লিখে দিয়েছে।"

"আচ্ছা,বইয়ের একটা অংশে মূল চরিত্রের মিডল-স্কুল জীবনের বর্ণনা রয়েছে। মূল চরিত্রটা বেশ রূঢ়। বন্ধুদের তার দলে যোগ দেয়ার জন্য জোর

করে, আর কারোর সাথে মতের মিল না হলে আক্রমণ করে বসে। এইধরনের আচরণকে আজকাল বুলিয়িং বলা হয়। যাইহোক, তার পছন্দের ভিক্টিম ছিল এক ক্লাসমেট, হামাওকা নাম ছেলেটার। আমার সবসময়ই মনে হয়েছে এই ছেলেটা মিস্টার হিদাকার প্রতিরূপ।"

"কেন আপনার মনে হল ওই ছাত্রটাই মিস্টার হিদাকা?"

"আচ্ছা, বইটা এমনভাবে লেখা হয়েছে যেন এটা হামাওকার স্মৃতিচারণ। আর যেহেতু এটা কোনো জীবনী নয় বরং ফিকশন। বলা যায়, বর্ণনাকারীই হল লেখক–মিস্টার হিদাকা।"

মাথা নেড়ে সায় জানালাম।

"সেইসাথে," একমুহূর্ত ইতস্তত করে বলল মিয়াকো ফুজিও। "আমার মনে হয়েছে কোনো নির্দিষ্ট কারণে এই উপন্যাসটা লিখেছে মিস্টার হিদাকা।"

তার দিকে তাকালাম। "কী কারণ সেটা?"

"বইয়ে মূল চরিত্রের প্রতি হামাওকার ঘৃণাটা স্বাভাবিক। প্রত্যেকটা পৃষ্ঠাতেই এটা বাস্তবিকভাবেই অনুভব করতে পারবেন আপনি। যদিও বইয়ের কোথাওই এই বিষয়ে বলা নেই কিন্তু বুঝতে পারবেন ঘৃণাটাই হামাওকাকে প্রভাবিত করে যে তাকে স্কুলে হেনস্তা করত তার আকস্মিক মৃত্যুর তদন্ত করতে। যদি হামাওকার ক্রোধ লেখকের ক্রোধ হয়ে থাকে, তবে ধরে নেয়া যায় মিস্টার হিদাকা এই বইটা লিখেছে আমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য।"

তাকালাম তার দিকে। সে বলার আগে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বই লেখার ব্যাপারটা মাথয় আসেনি আমার। সত্যি বলতে, আমাদের তদন্ত দল নিষিদ্ধ প্রান্তর বইটার দিকে বেশি নজরই দেয়নি।

"তাহলে নোনোগুচির স্বীকারোক্তি আপনার থিওরি বাতিল করে দিচ্ছে," বললাম আমি।

"হ্যাঁ। তবে বইটা মিস্টার হিদাকা বা মিস্টার নোনোগুচি যে-ই লিখুক না কেন, সেটা কোনো ব্যাপার নয়। লেখক যদি ওই ছেলেটার মাধ্যমে

নিজেকে বোঝায় তবে ব্যাপারটা একই থাকবে। আমার কল্পনায় হামাওকা বলতে কুনিহিকো হিদাকার চেহারাটাই ভেসে ওঠে। এজন্য এই জায়গায় অন্য কাউকে কল্পনা করা কঠিন। আপনার পছন্দের কোনো বই থেকে মুভি বানানো হল কিন্তু নায়ক আপনার কল্পনার চরিত্রের সাথে মিলল না, ব্যাপারটা এমনই।"

"তাহলে কুনিহিকো হিদাকা আপনার কল্পনার হামাওকার সাথে মেলে?"

"ওরকমই মনে হয়...কিন্তু বইটা প্রথম পড়ার সময় এই চরিত্রের জায়গায় তাকেই কল্পনা করেছি, এজন্যই হয়তো।"

তাকে জিজ্ঞেস করলাম যেহেতু 'নিষিদ্ধ প্রান্তর' বইটার লেখক ওসামু নোনোগুচি, এখন কী করবে।

একমুহূর্ত ভেবে শীতল কণ্ঠে সে বলল, "মিস্টার নোনোগুচির বিচারের রায় আসার আগপর্যন্ত অপেক্ষা করবো। এরপর নিজের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।"

থানায় পৌছে দেখলাম ডিটেক্টিভ চিফ আমার সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছে। তার অফিসে আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল কেন এখনো এই কেসটা বন্ধ করে সবকিছু প্রসিকিউটরের অফিসে পাঠিয়ে দিচ্ছি না। আমি এখনও কুনিহিকো হিদাকার খুনের তদন্ত করছি শোনার পর খুব বেশি সন্তুষ্ট দেখাল না তাকে। খুনির স্বীকারোক্তি পাওয়ার পরও এই কেসটার পিছে আমার ছুটে বেড়ানো নিয়ে তার সমস্যা থাকার কারণে তাকে দোষারোপ করতে পারলাম না। কেন না ওই স্বীকারোক্তিতে সব প্রমাণাদি ও মোটিভের ব্যাপারে খোলাসা করা হয়েছে। সবথেকে বড় কথা, ওটা লিখেছে স্বয়ং খুনিই।

"তাহলে কোন জিনিসটা মিলছে না?" কণ্ঠে বিরক্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করল চিফ। "আমার দৃষ্টিকোণ থেকে তো সবকিছু একেবারে পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেছে।"

কোনো এভিডেন্স বাতিল করার মত ভিত্তি আমার কাছে নেই, এভিডেন্সগুলো আমিই খতিয়ে দেখেছি। অতি সম্প্রতি, আমার মনে হয়েছিল

বেস্টসেলিং লেখকের খুনের ব্যাপারে খতিয়ে দেখার মত আর কিছু নেই। নোনোগুচির মিথ্যা অ্যালিবাই ভেঙে হিদাকার সাথে তার সম্পর্কটা প্রকাশ করতে সফল হয়েছি আমি। বরং নিজের কাজে আমি গর্বিত।

কিন্তু এতসব নিশ্চয়তার মধ্যেও সংশয় দানা বাঁধছে। হাসপাতালের বিছানায় নোনোগুচিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর রিপোর্ট লেখার সময় এর সূত্রপাত। নোনোগুচির হাতের দিকে নজর গেলে, তার আঙুলের ডগার দিকে তাকিয়ে একটা বিব্রতকর চিন্তা মাথায় আসে। ওইসময় সেটা এড়িয়ে যাই আমি। ব্যাপারটা বড়ই অবাস্তব।

কিন্তু এখনো ওই চিন্তাটা দূরে সরাতে পারিনি। মনের মধ্যে ক্রমাগত খুঁচিয়েই চলেছে ব্যাপারটা। বলা ভালো, প্রথমবার নোনোগুচিকে গ্রেফতারের সময় কোনো ভুল পদক্ষেপ নিচ্ছি কি না ভেবে আমিও শঙ্কিত ছিলাম। এখন এই শঙ্কাটা আরও বেড়ে গিয়েছে।

হতে পারে আমার সংশয়, সন্দেহ কেবলই বিভ্রম। হতে পারে ডিটেক্টিভ হিসেবে আমার একটা দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ-ই এই বিভ্রম। তবুও এরকম সংশয় মনের ভেতর নিয়ে এখনই এই কেসটা বন্ধ করে দিতে চাই না আমি।

একারণেই ডজনখানেক বারেরও বেশি ওসামু নোনোগুচির স্বীকারোক্তিটা পড়েছি। পড়ার সময় নিজেকেই কিছু প্রশ্ন করেছি, যা আগে মাথাতে আসেনি।

১. কুনিহিকো হিদাকার ওপর নোনোগুচির চালানো হত্যাচেষ্টার ব্যাপারটাকে ব্যবহার করে হিদাকা নোনোগুচিকে ব্ল্যাকমেইল করে তাকে নিজের গোস্টরাইটার বানায়, নোনোগুচি যদি কিছু না ভেবেই উল্টো গোস্টরাইটারের ব্যাপারটা ফাঁস করে দিত তাহলে কী হত? এতে তো হিদাকারও উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হত। হয়তো লেখক হিসেবে তার ক্যারিয়ারটাই শেষ হয়ে যেত। হিদাকা কেন এটা নিয়ে ভয় পায়নি? নোনোগুচির মতে, সে বিষয়টা ফাঁস করেনি কারণ সে হাতসুমির জড়িত থাকার ব্যাপারটা সামনে আনতে চায়নি। কিন্তু হিদাকার তো নিশ্চিতভাবে জানার কথা নয় নোনোগুচি এমন কিছু করবে।

২. হাতসুমির মৃত্যুর পরও কেন নোনোগুচি হিদাকার ব্ল্যাকমেইলে বাঁধা দেয়নি? স্বীকারোক্তিতে নোনোগুচি বলেছে, এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল সে। যদি সেটাই হয়, তাহলে ঘুরে দাঁড়িয়ে পাল্টা আক্রমণ চালানোই কি ভালো পন্থা ছিল না?

৩. ভিডিও টেপ আর ছুরিটা কি হত্যাচেষ্টার অভিযোগ আনার মত যথেষ্ট এভিডেন্স? টেপে শুধু ধরা পড়েছে হিদাকার অফিসের জানালা দিয়ে নোনোগুচির অনুপ্রবেশ। আর ছুরিটাতে কোনো রক্তের দাগ ছিল না। উপরন্তু, ক্রাইম-সিনে উপস্থিত থাকা দুজন ব্যক্তি হল খুনের চেষ্টা চালানো ব্যক্তি, ভিক্টিম ও হাতসুমি, অপরাধের আরেক ষড়যন্ত্রকারী। হাতসুমির সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করলে ট্রায়ালে নোনোগুচির নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ছিল।

৪. স্বীকারোক্তিতে নোনোগুচি বলেছে হিদাকার তার সাথে সম্পর্কটা সত্যিকারের সহযোগীর মতোই হয়ে গিয়েছিল। পূর্বের ব্যাপারগুলো বিবেচনা করে, আদৌও কি এমনটা হওয়া সম্ভব?

এই চারটা পয়েন্ট নিয়েই নোনোগুচিকে প্রশ্ন করি আমি। সবগুলোর জন্য একটাই মাত্র উত্তর দিয়েছে সে :

"আপনার কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে ব্যাপারটা কিন্তু আপনাকে খুশি করার জন্য যা ঘটেছে সেটা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আমি আপনাকে বলতে পারবো না কী করেছি, কেন করেছি, কখন করেছি। শুধু বলতে পারবো, আমার মানসিক অবস্থা ভালো ছিল না কয়েক বছর ধরেই।"

এরপর আমার আর কিছু বলার থাকে না। স্পষ্ট সাংঘর্ষিক কোনো ব্যাপার থাকলে সেটা তার দিকে ছুঁড়ে দিতে পারতাম, তখন হয়ত কিছু পেলেও পাওয়া যেত। কিন্তু এই বিষয়ে আমার সংশয় ও সন্দেহগুলো কেবলই কয়েকটা সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন। কোনো শক্ত ভিত্তি নেই এসবের।

যাইহোক, আমার সংশয়গুলোর পিছে আরেকটা কারণ রয়েছে, যা ঐ চারটা পয়েন্টকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। সেটা হল লোকটার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য ইনভেস্টিগেটর ও চিফের চাইতে ওসামু নোনোগুচিকে আমি বেশি

ভালো চিনি। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আর তার লেখা স্বীকারোক্তি ঠিক খাপ খায় না।

আমার বিকল্প থিওরিটা বাতিল না করার ইচ্ছা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। যেটার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে ওই সন্দেহগুলো। থিওরিটা যদি সত্যি হয় তবে সবকিছুরই ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

রাই হিকাদার সাথে দেখা করতে যাওয়ার স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল আমার। আমি যে ধারণা করেছি তা যদি সত্যি হয়, তার স্বামীর ব্যাপারে লেখা ওসামু নোনোগুচির প্রথম স্বীকারোক্তিটার নিশ্চয়ই ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য আছে।

যাইহোক, আমি প্রয়োজনীয় তথ্য বের করতে পারিনি। রাই হিদাকার কাছ থেকে পাওয়া একমাত্র তথ্য হল, নোনোগুচি ওদের জন্য এক বোতল শ্যাম্পেইন নিয়ে গিয়েছিল। নিজের স্বীকারোক্তিতে হয়ত এই ব্যাপারটা যোগ করতে ভুলে গিয়েছে নোনোগুচি। অথবা কোনো কারণে বাদ দিয়েছে এইটা। এই ব্যাপারটা অর্থপূর্ণ-ই মনে হয়েছে, সাধারণত অ্যালকোহল নিয়ে যাওয়ার মত লোক নয় নোনোগুচি। ওই দম্পতির জন্য বিদায়ী উপহার হিসেবেই সম্ভবত জিনিসটা নিয়ে যায় সে। এছাড়া অন্য কোনো কারণ থাকলে সেটা বের করতে পারিনি আমি। আপাতত শ্যাম্পেইনের বোতলটা মাথা থেকে দূরে সরিয়ে রাখলাম, পরবর্তিতে এটা নিয়ে ভাবা যাবে।

আমার মতে ওসামু নোনোগুচি ও কুনিহিকো হিদাকার মধ্যকার সম্পর্কটা আরেকবার যাচাই করে দেখা উচিত। নিশ্চিতভাবেই কোথাও না কোথাও ভুল করেছি আমি, আবারও প্রথম থেকে শুরু করতে হবে আমাকে।

তবে, মিয়াকো ফুজিওর সাথে মিটিংটা কার্যকরী হয়েছে। তার সাথে কথা বলার সময় বুঝতে পেরেছি আমার পরবর্তি পদক্ষেপ কি হবে। এই দুই ব্যক্তির ভেতরকার সম্পর্কের ব্যাপারে পরিস্কার ধারণা পেতে আমাকে ফিরে যেতে হবে ওদের একসাথে কাটানো মিডল-স্কুলের দিনগুলোতে। এই গবেষণায় উপন্যাস ও ডকুমেন্টারি 'নিষিদ্ধ প্রান্তর'কে বেশ ভালো রিসোর্স বলা যেতে পারে।

মিস ফুজিওর সাথে মিটিং শেষ করে সরাসরি বুকশপে গিয়ে কিনে ফেলি

এই বইয়ের একটা কপি। বাড়ি ফেরার ট্রেনে বসেই পড়া শুরু করে দিই। দ্রুতই পড়ে ফেলতে পেরেছি, কেন না জানতাম কোনদিকে যাচ্ছে কাহিনী। স্বাভাবিকভাবেই উপন্যাসের সাহিত্যগুণ বিচারের মত কেউ নই আমি।

ফুজিও যেমনটা বলেছে, এই বইটা লেখা হামাওকা চরিত্রটির দৃষ্টিকোণ থেকে। গল্প শুরুই হয় হামাওকাকে দিয়ে, একটা নামবিহীন কোম্পানিতে চাকরী করে সে। সকালবেলা পত্রিকা পড়ে জানতে পারে এক কাঠ খোদাই শিল্পীর খুনের ব্যাপারে। বুকের ওপর ছুরি মেরে খুন করা হয় ওই শিল্পীকে। শিল্পীর নাম কাজুয়া নিশিনা। স্কুলে হামাওকাকে যে দলটা উত্যক্ত করত, সেই দলের নেতা ছিল এই নিশিনা।

মিডল স্কুলের শেষ বর্ষে এই উত্যক্তের মাত্রা চরমে ওঠে। বেশ কয়েকবার পেটানো হয় হামাওকাকে। জীবনে একটা দাগ কেটে দিয়েছে এই ব্যাপারটা।। একবার তাকে নগ্ন করে, সেলোফেনে মুড়িয়ে ফেলে রাখা হয়েছিল জিমনেশিয়ামের কোণায়। আরেকবার জানালার পাশ দিয়ে হাঁটার সময় তার মাথায় ফেলে দেয়া হয় এক কাপ হাইড্রোক্লোরিক এসিড। এসব বখাটে ছেলেদের হাতে তার মার খাওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। গালি, মার ও কিশোর-কিশোরীদের ভষায় 'প্র্যাঙ্কের' শিকার হতে থাকে প্রতিদিনই।

বইয়ে বেশ বিস্তারিতভাবেই এসবের বর্ণনা দেয়া আছে। পাঠকের মনে প্রভাব ফেলার মত যথেষ্ট। বুঝতে পারি, কেন ফুজিও এটাকে ফিকশন কম জীবনী বেশি বলে দাবি করেছে।

কিন্তু কেন হামাওকাকেই এভাবে টার্গেট বানিয়ে উত্যক্ত করা হয়েছে সেটা পরিষ্কার করা হয়নি। তার মতে হুট করেই একদিন শুরু হয় ব্যাপারটা, যেন "ভুল কবরে পা রেখে শয়তানকে খেপিয়ে দিয়েছিল।" এই নির্যাতনের বর্ণনা পড়ে এর সাথে আমার শিক্ষকতা জীবনে দেখা অন্যান্য নির্যাতনগুলোর বেশ মিল পেয়েছি। প্রথমদিকে মাথা উঁচু রেখে নির্যাতন প্রতিহত করার চেষ্টা করে টার্গেট। কিন্তু আস্তে আস্তে আতঙ্ক ও হতাশায় ঝিমিয়ে পড়তে হয়।

"নির্যাতনটা সবথেকে জঘন্য দিক নয়। জঘন্য দিকটা হল, যে ছেলেরা

তাকে ঘৃণা করে তাদের থেকে ধেঁয়ে আসা নেতিবাচক প্রভাব। কখনোই সে কল্পনা করেনি এরকম বিদ্বেষ এই দুনিয়ায় থাকতে পারে।"

আমার মতে নিষিদ্ধ প্রান্তর বইয়ের এই লাইনটা দিয়েই একজন ভিক্টিমের অনুভূতি সবথেকে ভালোভাবে প্রকাশ করা যায়। শিক্ষক থাকাকালীন দেখেছি, এইধরনের ভিক্টিমরা একনাগাড়ে নির্যাতনের ফলে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে পড়ত।

সৌভাগ্যজনকভাবে, এই দলটার নেতা অন্য স্কুলে বদলী হয়ে গেলে হামাওকার হয়রানী বন্ধ হয়ে যায়। কেউ জানত না কোথায় গেছে নিশিনা, তবে গুজব ছিল একটা মেয়েকে যৌন হয়রানী করার কারণেই বদলী করা হয় তাকে।

হামাওকার মিডল স্কুলের কাহিনী এখানেই শেষ। কয়েকটা নাটকীয় কাহিনীর পর (এই কেসের সাথে যা অপ্রাসঙ্গিক) নিশিনার ট্রেইল অনুসরণ করতে থাকে হামাওকা।

বইয়ের বাকি অংশ বিভক্ত হয়েছে হামাওকার স্মৃতিচারণ ও তার তদন্তের ফলাফল দিয়ে। প্রথম অংশে পাঠক জানতে পারবে স্কুল থেকে নিশিনার চলে যাওয়ার পিছনের প্রকৃত ঘটনা। যে মেয়েকে হয়রানী করেছিল নিশিনা, ওই মেয়েটা ছিল কাছের এক ক্যাথলিক স্কুলের ছাত্রি। আড়ালে নিয়ে গিয়ে নিশিনার সাঙ্গপাঙ্গরা মেয়েটাকে চেপে ধরে, এরপর মেয়েটাকে ধর্ষণ করে নিশিনা। আর পুরো ঘটনাটিকে বন্দি করে ভিডিওতে। একটা লোকাল গ্যাংয়ের কাছে ভিডিওটা বিক্রি করার মতলব ছিল তার, যারা এইধরনের ভিডিওর পরিবেশক।

এসবের কোনকিছুই পত্রিকায় আসেনি, কেন না মেয়েটার পরিবার প্রভাবশালী ছিল। পুরো ব্যাপারটাকে আড়াল করে ফেলতে সক্ষম হয় তারা।

বইয়ের প্রথমার্ধেই এই বিষয়টা প্রকাশ পেয়েছে। যা থেকে কাজুয়া নিশিনার হিংস্রতার ব্যাপারে ধারণা পাওয়া যায়। বইয়ের দ্বিতীয়ার্ধে দেখা যায় হুট করেই পরিবর্তন এসেছে নিশিনার জীবনে। নিজেকে একজন কাঠ খোদাই শিল্পী হিসেবে গড়ে তোলে সে। গল্পের শেষ ঘটে নিশিনার প্রথম

প্রদর্শনীর ঠিক আগে এক পতিতা রাস্তাতে তার বুকে ছুরি বসিয়ে খুন করার মাধ্যমে। বোঝাই যাচ্ছে, ছুরি মারার ঘটনাটা বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করেই লেখা।

বুঝতে পেরেছি, কেন ফুজিওর কাছে স্বয়ং লেখককেই গল্পের হামাওকা বলে মনে হয়েছে। এটা সাধারণ কোনো উপন্যাস হলে ফুজিওর এই ধারণাটা হাস্যকর হত। কিন্তু বাস্তব ঘটনার ওপর ভিত্তি করে লেখা কোনো কিছুর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা থাকে।

ফুজিওর মতে এই বইটা লেখা হয়েছে নিজের উত্যক্তকারীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। তার দাবি অনুযায়ী, এই বইয়ে কাজুয়া নিশিনা চরিত্রটা পুরো বই জুড়েই লেখকের কোনো সহানুভূতি পায়নি। বলা যেতে পারে শৈশবে এত নির্যাতন ও হয়রানির শিকার না হলে কেউ এত নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করে নির্যাতনকারীর নিষ্ঠুরতা ও মানবিক দুর্বলতা নিয়ে লিখতে পারত না। এজন্যই হয়ত মিয়াকো ফুজিও দাবি করেছে, এই উপন্যাসে আবর্জনা খুঁড়ে টেনে আনা হয়েছে তার পরিবারের নাম।

ধরে নেয়া যাক, হামাওকা চরিত্রটা হচ্ছে ওসামু নোনোগুচি, তাহলে এক্ষেত্রে কাহিনীতে কুনিহিকো হিদাকা কোনটা? (আর হিদাকা যদি লেখক হয়ে থাকে তাহলে নোনোগুচি কোনটা?)

আপাতদৃষ্টিতে এই বইটা পুরোপুরি ফিকশন। চরিত্রগুলোকে হয়ত তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এই জিনিসটা আমাকে খোঁচাচ্ছে না। আমি ভাবছি মিডল-স্কুলে থাকাকালীন ওসামু নোনোগুচি হয়রানীর শিকার হলে কুনিহিকো হিদাকা তখন কি করছিল? বসে বসে চুপচাপ তার নির্যাতন হওয়া দেখছিল?

এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি একটা নির্দিষ্ট কারণে। খুনের ঘটনার বিবরণ দিয়ে লেখা স্বীকারোক্তিতে নোনোগুচি বারবার 'বন্ধু' বলে অভিহিত করেছে হিদাকাকে।

দুর্ভাগ্যজনক হলে সত্যি, অভিভাবকের নজরদারি কিংবা শিক্ষকের হস্তক্ষেপেও এসব বুলিয়িং বা নির্যাতন দমানো যায় না। কিন্তু একটা শিশুর সবথেকে বড় সহযোগী তার বন্ধু। হামাওকা চরিত্রটার কোনো বন্ধু থেকে

থাকলেও পুরো ঘটনায় তার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। আর বন্ধুর বিপদে যে এগিয়ে আসে না আদৌ সে কোনো বন্ধু নয়।

ওসামু নোনোগুচির স্বীকারোক্তিতেও এই সাংঘর্ষিক ব্যাপারটা লক্ষ করেছি। এক বন্ধু কখনোই অপর কোনো বন্ধুর স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। বন্ধু কখনোই বন্ধুর স্ত্রীর সাথে মিলে বন্ধুকেই হত্যার পরিকল্পনা করতে পারে না। আর কোনো বন্ধু তার বন্ধুকে ব্ল্যাকমেইল করে বানাতে পারে না নিজের গোস্টরাইটারও।

তাহলে কেন কুনিহিকো হিদাকাকে নিজের বন্ধু বলে বিবেচনা করেছে নোনোগুচি?

আমি যে নতুন থিওরিটা নিয়ে কাজ করছি সেটাতে এই সবকিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

যে থিওরিটা মাথায় এসেছে কলম ব্যবহারের কারণে কড়া পড়ে যাওয়া নোনোগুচির মধ্যাঙ্গুলিটা দেখে।

অধ্যায় ৭

অতীত (দ্বিতীয় পর্ব)
পূর্ব-পরিচিত লোকজন (কাগার জিজ্ঞাসাবাদ)
জিজ্ঞাসাবাদ: জুনিচি হায়াশিদা

জানি না কাজে আসবে এমন কিছু আপনাকে জানাতে পারবো কি না। মিডল-স্কুল দীর্ঘদিন আগের ঘটনা! বিশ বছরেরও বেশি সময় আগের, ঠিক না? আমার স্মৃতি মন্দ নয়, তবে এসব তো পুরনো ইতিহাস। ০০০০০০

হিদাকা প্রসঙ্গে:

আপনাকে মিথ্যে বলবো না, সত্যি বলতে কয়েক সপ্তাহ আগেও আমার জানা ছিল না কুনিহিকো হিদাকা নামে কোনো লেখক আছে। দীর্ঘদিন কোনো উপন্যাস পড়িনি। জানি, আমার অনেক পড়া উচিত। আমি একজন নাপিত, সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে কথা বলতে হয় আমার খদ্দেরদের সাথে। কিন্তু পড়ার মত সময়টা পাই না। যাইহোক, পত্রিকা পড়ে কী ঘটেছে সেটা জানার পরই হিদাকার পরিচয় পেলাম। আমি পত্রিকা পড়ি অন্তত। সে আমার ক্লাসমেট ছিল সেটা বুঝতেই পারতাম না, যদি না পত্রিকায় নোনোগুচি ও হিদাকার অতীতের ওপর সামান্য আলোকপাত না করত। হ্যাঁ, ব্যাপারটা অবশ্যই অবাক করার মত, একসময় আমি একজন বেস্টসেলিং লেখক ও খুনি, উভয়ের সাথেই স্কুলে যেতাম!

নোনোগুচি প্রসঙ্গে:

গুচের কথা আমার অপরজনের থেকে বেশি ভালোভাবে মনে আছে। আমার মনে হয় না স্কুলে হিদাকা ওরকম বিশেষ কেউ ছিল; সে ওরকম

ধরনের মানুষ যে আপনার মনে কোনো ছাপ ফেলতে পারবে না। ওরা দুজন বন্ধু ছিল, এটাও জানতাম না।

'গুচ?' হ্যাঁ, ওকে এই নামেই ডাকতাম আমরা। জানি না কেন, তবে নামটা মিলে গিয়েছিল। ও অনেকটা গুচের মতই ধীরস্থির। সবসময়ই পড়ত। মাঝেমধ্যে ক্লাসে তার পাশে বসতাম বলে মনে আছে আমার। জানি না কী পড়ত। তখনও আমার পড়াশোনার ব্যাপারে তেমন একটা আগ্রহ ছিল না। শুধু জানি ওগুলো কমিক্স বই ছিল না। কম্পোজিশন ক্লাসেও দারুণ করত ও। আমাদের হোমরুম টিচার শেখাত কম্পোজিশন। বলা চলে ওই টিচারের প্রিয় পাত্র ছিল নোনোগুচি।

হয়রানি প্রসঙ্গেঃ

হ্যাঁ, ওরকম কিছু হত। আজকাল খবরে বুলিয়িং নিয়ে অনেক আলোচনা হয়, তবে এগুলা সবসময়ই ছিল। আর যারা বলে ওসব ছিল না, ওরা জঘন্য। তখন পুরোদমে চলত এসব। পুরো ব্যাপারটাই তো জঘন্য তাই না?

আর নোনোগুচি, অনেক সময় সে-ও টার্গেটে থাকত। হ্যাঁ, বেশ বাজেভাবে মার খেয়েছে। ছেলেপেলে ওর লাঞ্চবক্স, টাকা কেড়ে নিত। দুই একবার দারোয়ানের ক্লোজেটেও বন্ধ করে রাখা হয়েছিল ওকে। ও ওরকম-ই ছিল, বখাটে ছেলেদের পছন্দের টার্গেট।

সেলোফোনে মোড়ানোর ঘটনাঃ

ওই যে রান্নাঘরে জিনিসপত্র মোড়ানোর কাজে ব্যবহৃত জয় ওই পেপার? হ্যাঁ, এরকম কিছু শুনেছিলাম আমি। কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে, এসব জিনিস সবসময়ই ঘটে।

হাইড্রাক্লোরিক এসিডের ঘটনা প্রসঙ্গেঃ

এই ব্যাপারে আমি শুনিনি, এমনটা ঘটে থাকতে পারে। অন্তত বলা যায়, নামী কোনো মিডল-স্কুল ছিল না ওটা। তবে মারপিটের জন্য ছিল বিখ্যাত।

"আপনি কখনো এসবে জড়িত ছিলেন?"

ব্যাপারটা নিয়ে আমি লজ্জিত, কিন্তু হ্যাঁ। মাঝেমধ্যে দুয়েকবার আমিও তাল মিলিয়েছি। যদিও অনেক অল্প। সত্যি বলতে সিরিয়াস কিছু নয়। সমস্যাটা হল, ঝামেলাবাজ ছেলেরা চাইতো আমাদের মত সাধারণ ছাত্ররাও যেন এসবে জড়িত হয়। এড়িয়ে চললে এদের পরবর্তি টার্গেট আপনিই হবেন। ফলে ওদের সাথে তাল মেলাতে হত। ভয়াবহ লাগত আমার। মানে, দুর্বল, যাদের পাল্টা জবাব দেয়ার ক্ষমতা নেই, তাদের গায়ে হাত তুলতে কে-ই বা চায়? সবাই জানত কী চলছে। মনে আছে একটা ছেলের ব্যাগে একবার কুকুরের গু রেখে দিয়েছিলাম। আমাদের ক্লাস ক্যাপ্টেন ওই ছেলেটার পাশেই বসেছিল, সে দেখেও না দেখার ভান করে। ক্লাস ক্যাপ্টেন মেয়েটার নাম ছিল মাসুওকা। ওদেরকে সাহায্য না করলেও, অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ঠিকই করে দিত। হ্যাঁ, এরা মানুষের পিছে লাগতে পছন্দ করত ঠিকই, কিন্তু আরও বেশি পছন্দ করত অন্যের হাত নোংরা করাতে। এসব বিষয়ে তখন ভাবিনি আমি।

ফুজিওর প্রসঙ্গে:

ওহ হ্যাঁ, ফুজিওকে ভোলার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নিশ্চিতভাবেই আমি একমাত্র মানুষ ছিলাম না যে চাইত সে উধাও হয়ে যাক। বাজি ধরে বলতে পারি, শিক্ষকরাও চাইত দূরে কোথাও চলে যাক সে।

শালা ছিল একটা আস্ত ঘেড়েল। সরল-সোজা ছেলেদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারত না। বয়সে বড় ছেলেদের চেয়েও লম্বা-চওড়া আর শক্তিশালী ছিল ফুজিও। ফলে কে আটকাতে যাবে তাকে? হেনস্থার শিকার ছেলেরা এটা বোঝার পর তার সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলত। নিজেদের নিরাপদে রাখার জন্য শিকারীদের দলেই থাকতে চাইত। আমার মতে এই ব্যাপারটাই আরও উৎসাহিত করত ফুজিওকে, বুঝলেন? বখাটে ছেলের কথা উঠলেই সবাই ফুজিওর কথা বলত।

ফুজিও-ই কি নেতা ছিল?

হ্যাঁ, অবশ্যই। সে-ই সব হুকুম দিতো। আমি শুনেছি, ফুজিওর

নির্দেশেই ছেলেপেলের থেকে লাঞ্চের টাকা কেড়ে আনতো তার সাঙ্গপাঙ্গরা। প্রথমে ফুজিওর হাতেই যেত টাকাগুলো, সে-ই ভাগ-বাটোয়ারা করত।

ইয়াকুজাদের থেকে কোনো অংশে কম ছিল না শালারা।

ফুজিওর প্রস্থান প্রসঙ্গেঃ

ভাই, আমরা কী যে খুশি হয়েছিলাম! শান্তি পেয়েছিলাম অবশেষে। সে চলে যাওয়ার পর অনেক কিছুতে পরিবর্তনও আসে। যেন সবার মনোভাবে বড় ধরণের পরিবর্তন এসেছিল। হ্যাঁ, কয়েকটা পচা ডিম থেকে গিয়েছিল যদিও, কিন্তু ফুজিও থাকাকালীন সময়ের মত কিছু ঘটেনি। যদিও কখনো জানতে পারিনি কি হয়েছিল ফুজিওর। গুজব ছিল অন্য স্কুলের ছাত্রদের সাথে মারামারি করার পর কিশোর সংশোধনাগারে পাঠানো হয় তাকে। তবে এত বড় কিছু ঘটেছিল কি না সন্দেহ, এরকম কিছু ঘটলে তো অন্তত স্থানীয় পত্রিকায় আসত।

আপনার কেসের সাথে কি ফুজিওর কি কোনো সম্পর্ক আছে, ডিটেক্টিভ? হিদাকাকে বই চুরির জন্যই খুন করেনি নোনোগুচি?

ফুজিও গ্যাংয়ের অন্যান্য সদস্য প্রসঙ্গেঃ

ওদের ব্যাপারে ধারণা নেই। সম্ভবত ওরা সবাই এখন সমাজে বেশ ভালো পর্যায়েই রয়েছে। সম্ভবত এখানেই কোথাও একটা ক্লাস রোস্টার আছে। যদিও ওটাতে থাকা নম্বর ও ঠিকানা পুরনো। দাঁড়ান, আমি নিয়ে আসছি...

জিজ্ঞাসাবাদঃ হারুমি নিতা

মিস্টার হায়াশিদার কাছ থেকে আমার নাম জেনেছেন? জুনিচি হায়াশিদা? এমনকি, আমার ক্লাসে হায়াশিদা নামের কেউ ছিল বলে মনে পড়ছে না। না, না ছিল একজন। ভুলে গিয়েছিলাম আমি।

তো কোথায় থেকে শুরু করবো? আমার কুমারী নাম মাসুওকা, হ্যাঁ, আমি ক্লাস ক্যাপ্টেন ছিলাম। প্রত্যেক বছর একটা ছেলে ও একটা মেয়েকে

ক্যাপ্টেন নির্বাচিত করত ওরা। এমন কোনো দায়িত্ব ছিল না আমাদের কাঁধে। আমাদের শুধু নিশ্চিত করতে হত সবাই হোমওয়ার্ক বুঝে নিয়েছে কি না, সেইসাথে শিক্ষকদের দেয়া মেসেজ পৌঁছে দিতে হত সবাইকে। ওহ, হোমরুমে স্টুডেন্ট মিটিংয়ের ব্যবস্থা করতে হত আমাদেরকে। ভাই, এই শব্দগুলো অনেকদিন পর উচ্চারণ করছি। আমার কোনো সন্তান নেই।

হিদাকা ও নোনোগুচির প্রসঙ্গে:

দুঃখিত, ওই দুজনের ব্যাপারে কিছুই মনে নেই বললেই চলে। আমি শুধু মেয়েদের সাথেই মিশতাম। মিডল-স্কুলে এরকমই হয় আরকি।

হয়রানী প্রসঙ্গে:

ছেলেদের মধ্যে সম্ভবত বুলিয়িং চলত, কিন্তু আমি ওরকম কিছু লক্ষ করিনি। লক্ষ করলে কী করতাম সেটা বলা কঠিন। সম্ভবত টিচারকে জানানো ভালো একটা পদক্ষেপ হতে পারত।

দুঃখিত...কিছুক্ষণের মধ্যে আমার স্বামী চলে আসবে। যা জানতে চেয়েছেন সেটা পেয়ে গেলে আমরা এই আলাপ শেষ করতে পারি কি? মনে হয় না আমি খুব একটা বেশি সাহায্য করতে পারবো। আর আমি যে ওই মিডল-স্কুলে পড়তাম সেটা আপনি যদি কাউকে না বলেন তাহলে খুশি হব। ব্যাপারটা একটু জটিল। আমি আমার স্বামীকেও জানাইনি। ধন্যবাদ।

জিজ্ঞাসাবাদ: মাসাতোশি সুবুরায়া

আসার জন্য ধন্যবাদ। ভেতরে আসছেন না কেন? আপনি চাইলে ভেতরে হলে বসে কথা বলতে পারি আমরা।

হিদাকা ও নোনোগুচি প্রসঙ্গে:

নিশ্চিতভাবেই ওদের কথা মনে আছে আমার, যদিও আমি রিটায়ার্ড। দশ বছর হল অবসর নিয়েছি আমি। কিন্তু আমার ক্লাসের প্রত্যেকটা ছাত্রের কথাই মনে আছে। বাচ্চাদের সাথে অনেক সময় কাটালে এদেরকে বেশ

ভালোভাবে চেনা যায়। ওই স্কুলে আমি শিক্ষকতা শুরুর পর আমার প্রথম ক্লাসের ছাত্র ছিল ওরা দুজন। প্রথম ব্যাচের ছাত্রদের তো ভোলা যায় না। কম্পোজিশনে বেশ ভালো ছিল নোনোগুচি। প্রত্যেক পেপারে হয়ত ১০০ পেত না, কিন্তু ওই বিষয়টাতে দক্ষতা ছিল ওর। আর হিদাকা, নাহ, স্কুলের কাজে ও আমার মনে খুব একটা বেশি ছাপ ফেলতে পারেনি। ভালো মন্দ কিছুই ছিল না ও।

হয়রানীর প্রসঙ্গেঃ

আমার মনে হয় না হিদাকা খুব বেশি বুলিয়িং বা হয়রানীর শিকার হয়েছে। নোনোগুচি তো হয়নি-ই। অনেক খারাপ ছেলে ছিল ঠিকই কিন্তু তার ব্যাপারে আমি কিছুই শুনিনি।

হায়াশিদা বলল সে নির্যাতিত হত...

আচ্ছা, ব্যাপারটা শুনে অবাক হলাম! সত্যিই আমার কোনো ধারণা নেই! আর আমার দিকে ওভাবে তাকানোর দরকার নেই, ডিটেক্টিভ। সত্যিই বলছি আমি। এখন তো এসব নিয়ে মিথ্যে বলে লাভ নেই, ঠিক না?

দেখুন, আমি বলেছি নোনোগুচির সাথে হয়রানীর ঘটনা ঘটেনি। উল্টো নোনোগুচি সমীকরণের বিপরীত দিকে থেকে থাকতে পারে। একসময় বাজে ছেলেদের সাথে মেশা শুরু করে ও। আমি তখন ওকে নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম। এমনকি ওর বাবা-মা এসেও আমার সাথে আলাপ করে যায়। আমার মনে আছে ওকে আলাদা ডেকে এই ব্যাপারে কথা বলি আমি।

নিশ্চিতভাবেই একটা বাচ্চা যখন বাজে সঙ্গের পাল্লায় পড়বে তখন ভালো পথে ফিরিয়ে আনা মুশকিল, যদি না সে কারোর কাছ থেকে সহযোগিতা পায়। বলছি না, আমি, ওর বাবা-মা অথবা অন্য কেউ ওকে সহায়তা করেছে। ওর বন্ধু হিদাকাই ওকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনে। হিদাকাকে দেখলে বোঝা যায় না, কিন্তু মানসিকভাবে বেশ শক্ত ছিল সে। মানুষের বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায় চুপচাপ সহ্য করত না। এমনকি আমরা শিক্ষকরা ক্লাসে কঠোর আচরণ করলে আমাদেরও ছেড়ে কথা বলত না।

সম্ভবত একবার নিউ ইয়ারের দিকে এই দুজন আমার বাড়িতে বেড়াতে

এসেছিল। মনে হয় হিদাকাই সাথে নিয়ে এসেছিল নোনোগুচিকে। বেশি কিছু বলেনি ওরা, তবে মনে হয় ক্লাসে আমার ওপর খেদ দেখানোর জন্য আমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছিল।

ভেবেছিলাম এই দুজন সারাজীবন বেস্ট ফ্রেন্ড থাকবে। কিন্তু দুজনকে ভিন্ন হাইস্কুলে চলে যেতে দেখে অবাক হই আমি। দুজনই ক্লাসে মোটামোটি ভালোই করত। আমার মনে হয় না চাইলে একই হাইস্কুলে ভর্তি হওয়া ওদের জন্য কঠিন কিছু হত।

যা ঘটেছে সেটা লজ্জাজনক। জানি না সমস্যাটা কোথায় ছিল। ওদের কারোর কাছ থেকেই আমি এমনকিছু আশা করিনি।

জিজ্ঞাসাবাদঃ তোমোয়ো হিরোশাওয়া

নোনোগুচি ছেলেটা? হ্যাঁ, অবশ্যই মনে আছে তাকে।আমাদের প্রতিবেশি ছিল ওরা। প্রায়ই ব্রেড কিনতে আসত আমাদের দোকানে। দশ বছর আগের ঘটনা এটা।

খুন প্রসঙ্গেঃ

এবার অবাক হলাম। ওই দুজন ছেলে? ওরা এমনকিছু করেছে? অবাক হওয়ার জন্য যথেষ্ট এই তথ্য।

নোনোগুচির শৈশব প্রসঙ্গেঃ

তার ব্যাপারে খারাপ কিছু বলতে চাই না আমি। তবে ছোট্ট ওসামুর...একটা অন্ধকার দিক ছিল বলা চলে। মাঝেমধ্যে প্রাপ্তবয়স্কদের মত আচরণ করত, মাঝেমধ্যে খুবই বিষন্ন থাকতো।

সম্ভবত এটা তার এলিমেন্টারি স্কুলে পড়ার সময়কার কথা। তখন ঠিকমত স্কুলেও যেত না সে। একদিন তাকে তার বাড়ির দুই তলায় দেখতে পেয়ে ডাক দিই।

"ওসামু, অসুস্থ নাকি? ঠান্ডা লেগেছে?"

কিন্তু ডিটেক্টিভ, কোনো জবাব দেয়নি সে। তার মত একটা বাচ্চা!

মাথাটা ঘুরিয়ে পর্দা টেনে দিয়েছিল শুধু। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত-ই ছিল সত্যি বলতে। রাস্তায় মাথা নিচু করে একমনে হেঁটে যেত, কোনদিকে তাকাত না।

একবার শুনি সে একটানা দীর্ঘদিন স্কুলে যায়নি। কারণটা জানতাম না আমি, কিন্তু সবাই বলত দোষটা বাপ-মা'র। দুজনেই কাজ করত, ভালোই ছিল ওরা, তবে কোনকিছুই যথেষ্ট মনে করত না। জানেন তো মাঝেমধ্যে মানুষ কেমন হয়। বাচ্চার ওপর যত্ন নিতে গিয়ে অতিরিক্ত করে ফেলত। মনে আছে, একবার ওর মা ওকে প্রাইভেট এলিমেন্টারি স্কুলে পাঠানোর প্রসঙ্গে বলেছিল–"আমাদের ভালো যোগাযোগ নেই, এজন্য ওসামুকে স্থানীয় ওই নিম্নমানের স্কুলেই দেব।"

অদ্ভুত! নিম্নমানের? আমার ছেলে-মেয়ে দুজনেই ওই স্কুল থেকে ভালোভাবেই পাশ করেছে। এজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

ওদের পরিবারটা এখানে মানিয়ে নিতে পারেনি। আমার মনে হয় মিস্টার নোনোগুচির কাজের কারণেই এই এলাকায় আসে ওরা। যদি ওরা এই মফস্বলকে খাটো করেই দেখে থাকে, তাহলে সম্ভবত ওরা এখানে কোনো অভিজাত এলাকা থেকেই এসেছিল।

যাইহোক, বোঝাই যায় কেন ওদের সন্তান স্কুলে যেত না। স্কুল সম্পর্কে বাবা-মার মনোভাব এমন থাকলে তো এমনই হবে। গাছ যেমন ফলও তেমন। তবে ছেলে একেবারে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে ওরা। কখনো স্কুলে পাঠানোর জন্য জোর করতে দেখিনি ওদেরকে।

ওসামুর আবারও স্কুলে যাওয়ার একমাত্র কারণ কুনিহিকো। হ্যাঁ, হিদাকা ছেলেটা। যে খুন হয়েছে। প্রতিদিন সকালে সে ওসামুর বাড়িতে এসে ওকে নিয়ে স্কুলে যেত। জানি না এই ব্যবস্থাটা কে করেছিল। যেহেতু ওরা একই ক্লাসে পড়ত সেহেতু কোনো শিক্ষক হয়ত হিদাকাকে এটা করতে বলে।

প্রতিদিন সকালেই ওদেরকে দেখতাম আমি। আমার বাসার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উচ্চকণ্ঠে 'হ্যালো' বলত হিদাকা। মনে মনে বলতাম, ছেলেটা ভদ্র। একটু পর দেখতাম বিপরীত দিক থেকে ওসামুর সাথে হেঁটে আসছে সে। অবাক হতাম, কুনিহিকো আবারও হাই বললেও ওসামুর মুখ দিয়ে

একটা শব্দও উচ্চারিত হত না। মাথা নিচু করে নিজমনে হাটত। প্রতিদিনই।

ভাবতাম,হঠাৎ করে কি কারণে স্কুলে নিয়মিত যাওয়া শুরু করল ওসামু। তাকে কলেজে ভর্তি হতে দেখে মনে হত ছেলেটার কুনিহিকোর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। যা ঘটেছে এরপর আবারও নতুন করে ভাবতে বাধ্য হচ্ছি।

"ওরা কি আসলেও দুজন বন্ধু ছিল?"

প্রায়ই ওদের দুজনকে খেলতে দেখতাম। ফুটন শপের ছেলেটার সাথে মিশত ওরা। আমি অনেকটাই নিশ্চিত, ওদের আড্ডার মধ্যমণি ছিল কুনিহিকোই। কিন্তু সবকিছু ভালোই চলছিল।

শুধু ওসামুর সাথেই ভালো ব্যবহার করত না কুনিহিকো, সব ছেলেদের সাথেই ওর ব্যবহার ভালো ছিল। বিশেষ করে বাচ্চাদের সাথে। এজন্যই যা ঘটেছে সেটা বিশ্বাস করতে খুবই কষ্ট হচ্ছে।

জিজ্ঞাসাবাদঃ ইউকিও মাতসুশিমা

জানি না কী বলবো। খবরটা শুনে জ্ঞান হারাতে বসেছিলাম। নাম দুটো শুনে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ি। এলিমেন্টারি স্কুলে ওদের সাথে খেলতাম, কথাটা সত্যি। আমার বাবা-মা একটা ফুটন শপ চালাত। ওয়্যারহাউজ থেকে ফুটন নিয়ে আসতে সমস্যা হত সবসময়ই।

তবে সত্যি বলতে, আমরা বেস্টফ্রেন্ড টাইপ কিছু ছিলাম না। ওই এলাকাতে আমাদের বয়সি আর কেউ ছিল না বলে একসাথে খেলতাম আরকি। এলিমেন্টারি স্কুলের শেষের দিকে আমার অন্যান্য বন্ধুদের সাথে বেশি মেশা শুরু করি। ওদের কেউ কেউ দূরেও থাকত।

হিদাকা ও নোনোগুচির মধ্যকার সম্পর্ক প্রসঙ্গেঃ

আচ্ছা, এদের দুজনকেও ভালো বন্ধু বলতে পারবো না আমি। নিশ্চিত নই, ওদেরকে কি বলা যেতে পারে।

রাস্তার ধারের দোকানী মিসেস হিরোশাওয়া বলতেন ওরা বন্ধু। আসলে প্রাপ্তবয়স্করা ছোটদের ব্যাপারে যেমনটা ভাবে আর কি।

ব্যাপারটা হল ওদের মধ্যকার সম্পর্ককে ঠিক 'সমতা' বলা যাবে না। হিদাকা সবসময়ই নিজেকে বড় ভাবত। নোনোগুচিকে স্কুলে সাহায্য করার পর থেকেই সম্ভবত হিদাকার মধ্যে এই মনোভাব তৈরি হয়। ওর ওপর কোনকিছু চাপিয়ে দিত না হিদাকা, তবে তার আচরণ দেখেই আঁচ করা যেত এমনকিছু। হিদাকা ছিল সবসময়ই নেতা আর নোনোগুচি তার অনুসারী। মাঝেমধ্যে ব্যাঙ ধরতে যেতাম আমরা। সবসময়ই নোনোগুচিকে নির্দেশনা দিত হিদাকা, বলে দিত কি করতে হবে। যেমন: জায়গাটা বিপজ্জনক, ধরার আগে ভালোমত পজিশন নাও, জুতো খুলে নিও এসব। অনেকটা মা মুরগীর মত আচরণ ছিল তার কিংবা বড় ভাইয়ের মত। যদিও দুজনের বয়স সমান।

আমার মতে এই ব্যাপারটা মানতে পারত না নোনোগুচি। হিদাকার অগোচরে কথা বলত নোনোগুচি। সরাসরি মুখের ওপর কিছু বলত না যদিও।

সত্যি বলতে, আমি অনেকটাই নিশ্চিত, ওদের সাথে আমি খেলা বন্ধ করে দেয়ার পর ওরাও একে অপরের সাথে আর খেলত না। এর অন্যতম কারণ নোনোগুচি স্কুলের পর আরেকটা প্রোগ্রামে ভর্তি হয়। এর কারণে খেলার সময়টা বাদ পড়ে। আমার এটাও মনে হয়, নোনোগুচির মা হিদাকাকে পছন্দ করত না। নোনোগুচির সাথে ওর মায়ের আলাপ আড়াল থেকে একবার শুনে ফেলি আমি। "আশা করছি ওই ছেলেটার সাথে তুমি মিশছ না।" বলেছিল সে। বিরক্ত দেখাচ্ছিল তার চেহারা। ওরকম চেহারা রাতে দুঃস্বপ্ন দেখার জন্য যথেষ্ট। ছোট ছিলাম, বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম হিদাকার সাথে খেললে কি হবে? পরিবারের সমস্যাটা কোথায়? এমনকি আমি আজও জানি না, কেন ওই কথাটা বলেছিল ওর মা।

নোনোগুচির স্কুল না যাওয়া প্রসঙ্গে:

আমি ঠিক নিশ্চিত নই, তবে আমার মতে ওই স্কুলে ঠিক মানিয়ে নিতে পারত না। মনে হয় কখনোই তার খুব বেশি বন্ধু ছিল। একবার শুনেছিলাম অন্য একটা ভালো স্কুলে ট্রান্সফার হওয়ার কথা ভাবছে ও। কিন্তু সেটা আর ঘটেনি। এরপর এই প্রসঙ্গে আর কথা বলেনি। আপনার জন্য এটুকুই বলার ছিল আমার। আর কিছু মনে করতে পারছি না আমি। কয়েক দশক আগের ঘটনা এসব।

খুন প্রসঙ্গে:

কী শুনতে চান আমার কাছ থেকে? আমি অবাক হয়েছি, ভাই। যদিও ওদেরকে ছোটবেলায় চিনতাম, একারণে পুরো ঘটনা জানি না। কিন্তু এমন কিছু ঘটবে আশা করিনি। নোনোগুচিকে গোস্টরাইটার হিসেবে ব্যবহার করত হিদাকা, এটাও না। হয়তো নোনোগুচির সাথে একটু প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করত সে, কিন্তু কখনোই জোরজবস্তি করেনি। আর একটু হলেও হিদাকার ন্যায়বিচার জ্ঞান ছিল। অবশ্যই মানুষ বদলায়, সেটা বেশিরভাগ খারাপের দিকেই।

জিজ্ঞাসাবাদ: জুনজি তাকাহাশি

কখনোই কল্পনা করতে পারিনি এখানে একজন ডিটেক্টিভ এসে আমাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। সত্যি বলতে পত্রিকায় ঘটনাটা পড়ার আগপর্যন্ত ওই দুজনকে আমার সেভাবে মনে ছিল না। সেরকমও বন্ধু তো দূরে থাক কিছুই ছিলাম না আমরা। তাহলে আমার সাথে এর কী কাজ? আর ওই গোস্টরাইটিংয়ের ব্যাপারটা? ভাই, সাহিত্য থেকে আমি এক শ' হাত দূরে থাকা মানুষ। একই পৃথিবীতে বসবাস করার পরও সাহিত্যের কাছাকাছি যাওয়ার কোনো খায়েশ আমার নাই। (হাসি)

মিডল স্কুল প্রসঙ্গে:

ভাই, ওই জায়গা থেকে বের হওয়ার পরই ওটার কথা ভোলার চেষ্টা করেছি! আর হায়াশিদা আপনাকে আমার কথা বলেছে? শালা জানেও না কোথায় থামা উচিত। (হাসি)

হয়রানির প্রসঙ্গে:

আজকাল এই ব্যাপারে লোকে এমনভাবে কথা বলে যেন এটা বিশাল কোনো সামাজিক সমস্যা। আমিও এই কাজ টুকটাক করেছি ওইসময়। আরে ভাই, বাচ্চা ছিলাম আমরা। আর আমার মতে টুকটাক এসব করা মন্দ নয়। এমন নয় কোনো অজুহাত দিচ্ছি। কিন্তু বড় হয়ে বাস্তব জগতে পা

রাখলে অনেক বাজে জিনিস-ই অপেক্ষা করে আমাদের জন্য, ঠিক না? তো স্কুল হল ওসবের জন্য প্রস্তুত হওয়ার মঞ্চ। কঠিন ব্যাপার-স্যাপারের মধ্যে দিয়ে গেলে মানুষ একটু শক্ত ও জ্ঞানী হয়। এমনটাই আমার ধারণা। আজকাল মানুষ বুলিং ব্যাপারটা নিয়ে খুব উচ্চবাচ্য করে। আরে ভাই, এটা তো বাচ্চাদের মামলা।

ওইসময়ে কি ঘটত এই ব্যাপারে যদি সত্যি কথা বলতে চান, তবে আমার সাথে আলাপ করার থেকেও ভালো উপায় আপনার হাতে আছে।

আমার কথা বলতে সমস্যা নাই, কিন্তু আমি অনেক কিছু ভুলে গিয়েছি। সবকিছু মনে রাখা মাঝেমধ্যে কঠিন। গতকালকে যা ঘটেছে সেই ব্যাপারে কথা বলতে গিয়েও মাঝেমাঝে খেই হারিয়ে ফেলি ভাই! (হাসি)

সবথেকে ভালো হয় আপনি যদি ওই হিদাকার নামে বের হওয়া ওই বইটা পড়েন। কি যেন নাম বইটার? নিষিদ্ধ শিকারী না কি যেন?

নিষিদ্ধ প্রান্তর?

হ্যাঁ, এটাই। আপনি এই বইটার নাম শুনেছেন, ডিটেক্টিভ? বইটা পড়লে এত ঝামেলা করে আমার কাছে আসার কোনো প্রয়োজন পড়ত না আপনার। যাইহোক, বই-টই পড়ি না আমি। কিন্তু খুনটার কথা জানার পর ভাবলাম বইটাতে একটু চোখ বুলাই। সেবারই প্রথম লাইব্রেরিতে যাই আমি। লাইব্রেরিতে গিয়ে নার্ভাস লাগছিল, যেন কোনো ঝামেলায় পড়তে চলেছি। (হাসি)

তো বইটার ব্যাপারে শোনার পরই বইটা পড়লাম। বিশেষ করে, ফুজিওর আদলে যে চরিত্রটা বানানো হয়েছে সেই অংশটুকু পড়ে মনে হল এটা আমাদের মিডল-স্কুলের ওপর ভিত্তি করেই লেখা। তো ভাবলাম, বইয়ের কোনো জায়গায় আমিও হয়তো আছি।

আপনি বইটা পড়েছেন, ডিটেক্টিভ?

যাইহোক, বইয়ে লেখা সবকিছুই সত্যি। এই ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবেন না আশা করি। মনে হতে পারে উপন্যাসের কাহিনীর খাতিরে সবকিছু বানানো, কিন্তু প্রত্যেকটা ঘটনাই একেবারে নিরেট সত্য, কোনো ভেজাল নাই। অবশ্যই পরিবর্তন করা হয়েছে নামগুলো। কিন্তু বাকিসব

যেভাবে ঘটেছে সেভাবেই লেখা। পড়লেই বুঝবেন। এমনকিছু ঘটনাও আছে এতে যা আমি ভুলে গিয়েছি।

"একটা ছেলেকে সেলোফেনে পেঁচিয়ে জিমের কোণায় ফেলে রাখার ঘটনাটা কি মনে আছে আপনার?"

ভাই, এই অংশটা পড়ার সময় পাগলের মত ঘামছিলাম। (হাসি) দেখেন, পুরো ব্যাপারটার দায়িত্বে আমিই ছিলাম। এমন নয় এটা নিয়ে আমি গর্বিত। কিন্তু একটা বাচ্চার জন্য তো ব্যাপারটা বেশ মজার-ই ছিল, ঠিক না?

যাইহোক, পরিকল্পনাটা ছিল ফুজিওর। ব্যাটা নিজে বেশি কিছু করত না, শুধু নির্দেশ দিত। এমন না সে আমাদের লিডার ছিল। কিন্তু ওর সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে থাকলে ভালো সময় কাটত। এজন্য থাকতাম। (হাসি)

ধর্ষণ প্রসঙ্গে:

এই ব্যাপারে তেমন জানি না আমি। সত্যিই জানি না। শুধু জানতাম ওর নজর পড়ে এক মেয়ের ওপর। মেয়েটা উচ্চতায় খাটো, লম্বা চুল কিন্তু দেখতে সুন্দর ছিল। আর ফুজিওর চেহারা ছিল গরিলার মত। কিন্তু ওই ছোটখাটো মেয়েটাকে মনে ধরেছিল ওর। এমন মেয়েই পছন্দ করত শালা। বইয়েও এই ব্যাপারে লেখা আছে। পড়ে অবাক হয়েছি। লেখক নিজের কাজে দক্ষ। গুচ যদি লেখে সেক্ষেত্রে ঠিক আছে।

এরপর ফুজিওর মাঝেমধ্যেই উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা?

বইয়ে লেখা আছে প্রায়ই ষষ্ঠ পিরিয়ডের মাঝে বেরিয়ে যেত সে, মানে স্কুল শেষ হওয়ার আগেই। কিন্তু কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। ষষ্ঠ পিরিয়ডের মাঝামাঝি সময়ে নয়, যেত ওই পিরিয়ডটা শেষ হলে। এজন্য দিনের শেষে কখনোই হোমরুমে দেখা যেত না ওকে। কোথায় যেত এই ব্যাপারে বইয়ে ঠিকই লেখা হয়েছে। একটা রাস্তা দিয়ে ওই সুন্দরি মেয়েটা প্রতিদিন একা হেঁটে বাড়ি ফিরত। সেখানেই যেত ফুজিও। কখনোই আমাদের কাউকে সঙ্গে নেয়নি। একাই যেত। ফলে বলতে পারলাম না কি করত গিয়ে। শুধু বলতে পারি, বইয়ে যা বলা হয়েছে ওরকম কিছুই করত হয়তো। কোনো

গাছের আড়ালে লুকিয়ে, মেয়েটাকে দেখে নিজের পরিকল্পনা সাজাত। ভাবলেই বোঝা যায় ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর।

মেয়েটার সাথে ওই কাজটা করার সময় ছাড়া একা ছিল না ফুজিও। সাথে করে কাউকে নিয়ে যেত সে। জানি না কাকে। সত্যিই জানি না। এমন নয় কাউকেই বাঁচানোর চেষ্টা করছি। কেন চেষ্টা করবো? ওটা তো আর আমি নই। দেখেন, কিছু খারাপ কাজ করেছি আমি। তাই বলে কাউকে ধর্ষণ করতে সাহায্য করিনি। বিশ্বাস করতে হবে আপনাকে এটা।

"মাত্র একজন-ই ছিল?"

জানি বইয়ে কী লেখা আছে। কয়েকজন মিলে নজরদারী করা, ভিডিও ক্যামেরায় ব্যাপারটা ধারণ করা। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে এমন নয়। মাত্র একজন-ই ছিল, যে চেপে ধরেছিল মেয়েটাকে। আর কোনো ভিডিওটেপ নয়, ছিল কেবল একটা ছবি। যা শুনেছি, ছবিটা ফুজিও নিজেই একটা পোলারয়েড ক্যামেরা দিয়ে তোলে। জানি না ছবিটার কী হয়েছে। তবে ইয়াকুজার কাছে ভিডিওটেপ বিক্রির কাহিনী পুরোটাই বানোয়াট। ছবিটাও কখনো দেখিনি। যদিও ওইসময় দেখতে চেয়েছিলাম। (হাসি) কিন্তু এটা আমার হাত পর্যন্ত এসে পৌছায়নি।

আসলে যদি কেউ কিছু জেনে থাকতে পারে তাহলে সে হল নাকাতসুকা। ফুজিওর ডান হাত ছিল সে। আর ফুজিও নিজের জিনিসপত্র তার কাছে রাখত। যদি কখনো ওকে পুলিশ সার্চ করে এই ভয়ে। ফুজিও যদি কাউকে ছবিটা দিয়ে থাকে তবে নাকাতসুকাকেই দিয়েছে। যদিও আমার সন্দেহ তার কাছে এখনও ওটা আছে নাকি।

তার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা নেই আমার কাছে। তবে তার প্রথম নাম আকিও। আকিও নাকাতসুকা।

নোনোগুচি আপনাকে এই ব্যাপারে কিছু বলেনি? আমি নিশ্চিত, ও তো এসবের বেশিরভাগ-ই জানে। এজন্যই তো বইটা লিখতে পেরেছে। হয়তো এসব ব্যাপারে কথা বলা কঠিন এখনো।

কেন কঠিন?

ভাই, কে চাইবে ছোটবেলায় ঘটানো সব বাজে ঘটনা টেনে আনতে? বেশিরভাগই ওসব ভুলে গিয়ে সামনে এগোতে চায়।

নোনোগুচিও কি হেনস্তাকারী ছিল?

হ্যাঁ, তবে বেশিদিন নয়। ফুজিও ওকে কখনো সিরিয়াসলি নেয়নি, অন্তত প্রথমে নয়। ফুজিওর নজর ছিল হিদাকার ওপর। ভাবত, ছেলেটা নিজেকে বড় ভাবে। সবকিছু দিয়ে চেষ্টা করত হিদাকাকে শায়েস্তা করতে। কিন্তু হিদাকা পিছু হাটার পাত্র ছিল না। ফলে আরও খারাপ হয়ে ওঠে ফুজিও, শিক্ষা দিতে চায় হিদাকাকে। আর এই ব্যাপারগুলোই বইয়ে লেখা হয়েছে।

হিদাকাই তাহলে সেই ভিক্টিম?

হ্যাঁ, ঠিক। হিদাকাকেই আমরা সেলোফেনে পেঁচিয়ে রেখেছিলাম। জানালা দিয়ে এসিডটাও তাকে লক্ষ করেই ফেলা হয়েছিল।

নোনোগুচি নয়?

না না, গুচ আমাদের সাথেই থাকত তখন। আমাদেরই একজন ছিল। ওর মত আর কোনো চ্যালা ফুজিওর ছিল না। যেকোনো ছোটখাটো কাজ ওকে দিয়েই করাতাম আমরা।

হিদাকা ও নোনোগুচি বন্ধু ছিল না?

সেরকম নয়। জানি না গ্র্যাজুয়েশনের পর ওদের সম্পর্ক কেমন ছিল। সব পত্রিকায় ওদেরকে ভালো বন্ধু বলা হয়েছে। ওরা ভালো বন্ধু হলেও সেটা মিডল-স্কুলের পর হয়েছে। ওদেরকে যে সময় আমি চিনতাম তখন ওরা মোটেও ভালো বন্ধু ছিল না। সত্যি বলতে, নোনোগুচি সবসময়ই ফুজিওর কাছে হিদাকার ব্যাপারে কথা লাগাত। বলত, হিদাকা নাকি তার পিঠ পিছে কথা বলে। এসব না শুনলে আমার মনে হয় না হিদাকাকে শিক্ষা দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগত ফুজিও।

হামাওকা প্রসঙ্গে:

হ্যাঁ, এই চরিত্রটা হিদাকার আদলেই বানানো। কোনো সন্দেহই নেই। জানি, বইটা লিখেছে নোনোগুচি। যেহেতু হামাওকা নামটা ব্যবহার করতে হয়েছে তাকে, এটাই কি বইয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র?

বইয়ের কোন চরিত্রটা নোনোগুচি?

বলা কঠিন। নিপীড়নকারীদের মধ্যে একজন হবে হয়তো।

যদিও ব্যাপারটা ঠিক যৌক্তিক নয়, ঠিক না? একজন নিপীড়নকারীর নিজের ভিক্টিমের নামে বই প্রকাশ করা? এর কারণ কি?

জিজ্ঞাসাবাদঃ কোইচি মিতানি

দ্রুত আলাপ সারলে খুশি হবো। আমার একটা মিটিং আছে।

আমি ঠিক জানি না, আমার সাথে আলাপ করে কি জানার চেষ্টা করছেন আপনি। জানি আপনারা ডিটেক্টিভরা সন্দেহভাজনের অতীত ভালোমত খুঁটিয়ে দেখেন। কিন্তু নোনোগুচির সাথে আমার শেষ দেখা হয়েছে হাইস্কুলে।

আমি তার এলিমেন্টারি স্কুলের বন্ধুদের সাথেও কথা বলেছি।

ওয়াও, এত পেছনে গিয়েছেন আপনি? জানি না কি বলবো।

এতকিছুর আসলেই দরকার ছিল কি? আপনাকে কিন্তু আপনার কাজের ব্যাপারেই জ্ঞান দিচ্ছি না আমি। (হাসি)

তো, নোনোগুচি খুবই সাধারণ একজন হাইস্কুল ছাত্র ছিল। বিশেষ কিছু ছিল না ওর মধ্যে। আমরা অনেক কথা বলতাম। কেননা আমাদের বই ও মুভির পছন্দে মিল ছিল।

লেখক হওয়ার ব্যাপারে কিছু বলত সে?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমাকে বলেছিল এটাই ওর জীবনের লক্ষ্য।

মনে আছে নোটবুকে কিছু ছোটগল্প লিখে ওগুলো আমাকে দেখায় ও। ওগুলোর বেশিরভাগের কথাই আমার মনে নেই। তবে যতদূর মনে পড়ে, সায়েন্স ফিকশন বেশি লিখত। বেশ ভালো ছিল গল্পগুলো, অন্তত একজন হাইস্কুলের ছাত্রকে বিনোদন দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

নোনোগুচির হাইস্কুল নির্ধারণ প্রসঙ্গেঃ

ঠিক জানি না। তবে সম্ভবত ওর মিডল-স্কুলের গ্রেড আমাদের স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল?

দাঁড়ান, আপনার কথাতে মনে পড়ল, একবার ও বলেছিল ওর বাসার ওখানে ভর্তি হওয়ার মত আরেকটা হাইস্কুল ছিল, কিন্তু কিছু কারণে সেখানে ভর্তি হয়নি ও।

কি কারনে সেটা বলেছিল?

সম্ভবত স্কুল নয়, এলাকাটাই মূল কারণ ছিল। পুরো এলাকাটার প্রতিই বিতৃষ্ণা কাজ করতো ওর।

মিডল স্কুলের কথা কিছু বলেছিল আপনাকে?

শুধু বলেছিল ওখানকার ছেলে-মেয়েরা খুব নিম্নমানের ছিল। বিশ্বাস করতে পারেন? নিম্নমানের মফস্বলের নিম্নমানের স্কুল, নিম্নমানের ছাত্রছাত্রি। এরকম কিছুই বলেছিল। এমনিতে বেশ ভালো ছিল ও। কিন্তু কোথায় থেকে এসেছে এই প্রসঙ্গ উঠলেই অনেক কথা বলত। স্পষ্ট মনে আছে বিরক্ত হয়ে যেতাম আমি। মানে একাধিকবার এই একই কথা বলেছে ও। হ্যাঁ, তখন বেশ অদ্ভুত এক ছেলে ছিল ও। শৈশবের বেড়ে ওঠা শহরকে অনেকেই সেরা মনে করে, ঠিক না?

আমার মনে হয়, ওর মনে হত বাবার কাজের কারণে অন্য জায়গায় চলে যাওয়াটা খারাপ হয়েছিল ওর জন্য। আমাকে বলত ওই এলাকার অস্থায়ী বাসিন্দা ওরা, এজন্য ওখানকার কাউকে চেনে না। আর এলাকার কোনো বাচ্চার সাথে খেলতও না। অবশ্যই এসবে বিষয়ে আমার কিচ্ছু যায় আসত না। আমাকে এসব বলত ও, এই যা। যেন এসব বলে কোনো অজুহাত দিত আমাকে। তবে ওই এলাকা ছাড়েনি ওরা। অন্তত যখন ওকে চিনতাম তখন পর্যন্ত।

আরেকটা ব্যাপার আছে...যতদূর জানি একটা সময় গিয়ে কোনো একটা কারণে এলিমেন্টারি স্কুল বদলানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওরা ওকে স্কুল বদলাতে দেয়নি কারণ স্কুলে নিয়মিত ছিল ও। ওর মতে ব্যাপারটা ছিল দুর্ভাগ্যজনক। "দিনের পর দিন ওই জঘন্য জায়গায় যাওয়া আর শাস্তি পাওয়া একই কথা।" বলেছিল এলাকায় একটা ছেলে ছিল যে প্রত্যেক সকালে ওর বাসায় আসত ওকে নিতে। ওই ছেলের সাথে হেঁটে স্কুলে যেত ও। ব্যাপারটা পছন্দ ছিল না ওর। যেন ওকে টেনে নিচে নামানোর জন্য এটা ছিল ওই এলাকার কোনো ষড়যন্ত্র।

আমি ভাবতাম, ইশ! আমাকে যদি কেউ প্রতিদিন সকালে এসে স্কুলে নিয়ে যেত, সুন্দরভাবে কথা বলত! কিন্তু নোনোগুচি তো নোনোগুচি।

স্কুলে যাওয়ার জন্য নিতে আসা ওই ছেলেটা কি হিদাকা?

কখনো সেটা বলেনি ও। সত্যি বলতে কুনিহিকো হিদাকার নাম কখনোই উল্লেখ করেনি। খবরেই প্রথম তার ব্যাপারে শুনি আমি।

হিদাকার উপন্যাস প্রসঙ্গে:

আসলে একটাও পড়া হয়নি। আমার বই পড়া হয় তবে বেশিরভাগই রহস্য উপন্যাস। হালকা জিনিসপত্র, যেমন ভ্রমন রহস্য। যেসব উপন্যাসে কয়েকজন বেড়াতে যাওয়ার পর ওদের মধ্যে কেউ খুন হয়, ওই ধরনের। জটিল ধরনের কাহিনী পছন্দ না আমার। কোনো বই পড়তে গিয়ে যদি মাথা ঘামানো লাগে তাহলে সেটা খুব একটা সুখকর হয় না।

যাইহোক, খুনটার ব্যাপারে শোনার পর একটা বই পড়ার জন্য নিই আমি। বইয়ের লেখক নোনোগুচি এটা ভাবার পর থেকেই মেরুদন্ডে শীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছিল।

কোন বইটা পড়েছেন?

সমুদ্রের ডাক। যেটাতে একজন শিল্পীকে তার স্ত্রী ধোঁকা দেয়। অনেক কিছুই বুঝতে পেরেছি।

কিভাবে?

বলা চলে বইটার লেখক নোনোগুচি। বইয়ের প্রত্যেকটা পৃষ্ঠাতেই ওর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটেছে। ছোট থেকেই মানুষের যেসব ব্যাপার কখনোই পরিবর্তন হয় না ওগুলো।

আসলে সমুদ্রের ডাক হিদাকার লেখা।

কি, সত্যিই? দেখলেন জটিল উপন্যাসে আমার অবস্থা!

হালকা ধাঁচের উপন্যাস পড়েই মরে যাওয়া উচিত আমার। (হাসি)

জিজ্ঞাসাবাদ: ইয়াসুশি ফুজিমুরা

আমি ওসামুর মামা। ওসামুর মা আমার বোন। শুধুমাত্র টাকার লোভে বইগুলো লভ্যাংশ দাবি করেছি বলে মনে করবেন না। এমনটা ভাবা অপমানজনক। নিজেদের অধিকার জানান দিতেই এই কাজটা করেছি আমরা। বিষয়টা সবার কাছে পরিষ্কার করা জরুরি ছিল। এটাই আরকি।

কিন্তু মিস্টার হিদাকাকে খুন করেছে ওসামু

অবশ্যই এর জন্য শাস্তি হওয়া উচিত তার। সমাজের কাছে তার ঋণ শোধ করা উচিত, এই মনোভাব থেকেই হয়ত স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

আর সবকিছুর থেকে এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বুঝলেন। নিশ্চিতভাবেই জঘন্য একটা কাজ করেছে, কিন্তু কারণ ছাড়া এই কাজটা করেনি সে। হিদাকার সাথে তার সম্পর্কের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক কি না? গোস্ট রাইটিংয়ের ব্যাপারটা–মিস্টার হিদাকার জন্যই উপন্যাসগুলো লিখত ওসামু। একসময় গিয়ে ব্যাপারটা আর নিতে পারছিল না সে। এটাই হল কথা।

অন্যভাবে দেখলে কিছু দায় মিস্টার হিদাকারও আছে। সব ভুল ওসামুর একার নয়। সে একা কেন শাস্তি ভোগ করবে? এখানে মিস্টার হিদাকার অংশটা কোথায়?

সাহিত্যের বাজার সম্পর্কে ধারণা নেই আমার, তবে যতদূর জানি হিদাকার উপন্যাস বেশ ভালো বিক্রি হয়েছে। সর্বোচ্চ আয় করা অন্যতম একজন লেখক সে। কিন্তু অর্থগুলো আসলে কে আয় করেছে? বিক্রি হওয়া উপন্যাসগুলোর লেখক কি ওসামু নোনোগুচি নয়? একদিকে ওসামু শাস্তি ভোগ করবে আর অন্যদিকে টাকাগুলো আরেকজনের পকেটে যাবে, এটা কি যৌক্তিক? আমার মনে হয় না। আমি হলে পুরো টাকা ফেরত দিয়ে দিতাম। এটাই প্রকৃত ন্যায়বিচার।

আমার মনে হয় না মৃতের পরিবার এতে রাজি হবে।

ওহ্, আমি নিশ্চিত ওরা হবে না। এজন্যই সবকিছু সহজ করতে আইনজীবী নিয়োগ দিয়েছি আমরা। আমি শুধু ওসামুকে সাহায্য করতে চাইছি। কোনো টাকার দরকার নেই আমার। আর টাকাগুলো আমারও না। ওটা ওসামুর কাছেই যাবে।

এটা দেওয়ানী আদালতের মামলা নয়, ডিটেক্টিভ?

আসলে আমি আপনার সাথে আপনার বোন আর তার পরিবার যে এলাকায় থাকত সেটার ব্যাপারে আলাপ করতে চাই।

ওহ...তাহলে সম্মানীর ব্যাপারে কথা বলতে আসেননি আপনি? আচ্ছা ওসামুর জন্মের পরই আমার বোন ওই এলাকাতে চলে যায়। একটা বাড়ি বানায় ওখানেই। ওর স্বামীর আত্মীয়রা ওদের কাছে একটা জায়গা বিক্রি করে, ওই জায়গাতেই বানায় বাড়িটা।

ওই জায়গাটা কি পছন্দ করত আপনার বোন?

খুব একটা না। একবার আমাকে বলেছিল, যদি আগে জানত এলাকাটা কেমন তাহলে কখনোই ওখানে বাড়ি বানাত না।

আসলে কি কারণে জায়গাটা পছন্দ করত না সে?

আমি ঠিক জানি না। কখনো এই প্রসঙ্গে কথা হয়নি। আচ্ছা, আপনি এসব কেন জানতে চাইছেন, ডিটেক্টিভ? কেসের সাথে কি এসবের কোনো সম্পর্ক আছে? বুঝতে পারছি আপনার কাজের ধরন, কিন্তু আমার বোন কেন ওই এলাকা পছন্দ করত না, এটা নিয়ে ভাবা একটু অতিরিক্ত-ই হয়ে যাচ্ছে না!

আমাদের তো লুকানোর কিছু নেই।

জিজ্ঞাসাবাদ: আকিও নাকাতসুকা

নোনোগুচি? এই নামের কাউকে আমি চিনি না।

মিডল স্কুলে আপনার ক্লাসমেট ছিল সে।

সত্যি? আচ্ছা মনে পড়েছে।

খুন প্রসঙ্গে:

দুঃখিত, কয়েকদিন পত্রিকা পড়া হয়নি। আর কোনো লেখকের ব্যাপারে জানি না আমি।

সে-ও আপনার ক্লাসমেট ছিল।

আচ্ছা জানতাম না। তো ডিটেক্টিভ, এসবের সাথে আমার কি লেনাদেনা? আমি কাজে ব্যস্ত এখন। অফিসে যেতে হবে। ফলে হাতে সময় নেই।

হিদাকা নামের কাউকে চেনেন?

কি? হ্যাঁ, হিদাকা নামটা মনে আছে। সে-ই খুন হয়েছে? ইয়ার্কি না। কখন, কে, কিভাবে মরে জানার কোনো উপায় নেই।

তো তার স্কুলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে এই তদন্তে কী লাভ হবে? কেবল-ই না বললেন কে খুন করেছে আপনি সেটা জানেন? তাহলে আর কী জানার আছে?

আমরা শুধু সব দিকগুলো একটু নিশ্চিত করতে চাইছি।

খুনের রহস্য সমাধান হওয়ার পরও সবকিছু খতিয়ে দেখা নিশ্চয়ই আপনার জন্য ঝামেলার!

হয়রানীর প্রসঙ্গেঃ

আরে ভাই, নিশ্চয়ই ভাবছেন না...

আচ্ছা, হ্যাঁ আমি কয়েকবার হিদাকাকে ফেলে দিয়েছিলাম। কোনো নির্দিষ্ট কারণে নয়। ওকে একটু ঠিক রাখার জন্য আরকি, বুঝলেন।

কিন্তু ওই হিদাকাও বেশ শক্ত ছিল। কখনোই তার কাছ থেকে পয়সা বের করতে পারিনি আমরা। বেশিরভাগ পোলাপানকে একটু ভয় দেখালেই হাজারখানেক ইয়েন বের করে দিত। তো হ্যাঁ, হিদাকাকে একটু বিশেষ নজর দিতাম আমরা। এখন ভাবলে মনে হয়, সাহস ছিল শালার। যদিও ওই সময় বিরক্ত হয়েছিলাম খুব।

নোনোগুচি প্রসঙ্গেঃ

ভাই দেখেন, বললাম-ই তো কোনো নোনোগুচিকে চিনি না আমি। দাঁড়ান, গুচের কথা বলছেন? ওহ আচ্ছা, ঠিক, ওর নামই নোনোগুচি। মনে পড়েছে এবার। ফুজিওর মানিব্যাগ ছিল শালা। মানে যেটাতে লোকে টাকা নিয়ে ঘুরে সেটাকেই তো মানিব্যাগ বলে, তাই না? ফুজিওর টাকা দরকার হলেই সেটা দিত গুচ। আর সবসময়ই ফুট ফরমায়েশ খাটাতো গুচকে দিয়ে। ভাইরে ভাই, কি যে আবাল ছিল শালা। দুঃখিত এভাবে বলার জন্যে।

ফুজিও স্কুল ছাড়ার পর কি হয়েছিল?

আমরা সবাই আলাদা হয়ে যাই, গুচকে আর দেখিনি এরপর।

যৌন হয়রানীর প্রসঙ্গেঃ

হ্যাঁ আমি শুনেছি। মেয়েটা ক্যাথলিক স্কুলের ছিল, ঠিক না? কিন্তু সত্যিটা হল আমি এই ব্যাপারে খুব বেশি জানি না। ফুজিওর সাথে আমার সম্পর্ক ভালো ছিল ঠিকই, কিন্তু এসব বিষয়ে আমাকে কিছু বলত না। ও চলে যাওয়ার পর আর দেখিওনি ওকে। কয়েক মাস ওকে আটক করে রাখা হয়।

ওই কাজে আপনি কি তাকে সহায়তা করেছিলেন?

ভাই, কি বলেন এসব? আমি শুনেছি ওর সাথে কেউ একজন ছিল। কিন্তু ওটা আমি নই। এসব পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে কী হবে?

দেখুন, একটা কথা বলতে পারি। আপনি বললেন খুন হওয়া লোকটার নাম হিদাকা, তাই না? চলে যাওয়ায় পর ফুজিওকে আর দেখিনি আমি। কিন্তু হিদাকাকে একবার দেখেছিলাম, তিন কি চার বছর আগে। আমার বাসায় এসে ফুজিও আর ওই যৌন হয়রানির ব্যাপারে জানতে চায় সে।

আমাকে বলে ফুজিওর ওপর একটা উপন্যাস লিখছে। বিশ্বাস করতে পারেন? তাকে খুব বেশি সিরিয়াসলি নেইনি আমি, এজন্য ব্যাপারটা নিয়ে ভাবিওনি। ভেবেছিলাম উপন্যাসটা বেস্টসেলার হলে, শালার কাছে টাকা চাইবো। (হাসি)

কি বলেছিলেন তাকে?

যতটুক জানি। দেখে মনে হয়নি আমার ওপর কোনো রাগ আছে হিদাকার। তো বলতে সমস্যা কোথায়?

আপনি আসলে কতটুকু জানেন?

সত্যি বলতে তেমন কিছুই না। কিন্তু সে ছিল নাছোড়বান্দা। জানতে চাইছিল কোনো কিছুর খুঁটিনাটি মনে আছে নাকি। পরে বুঝলাম, সে মনে করেছিল আমিই ওই ঘটনায় ফুজিওর সহযোগী ছিলাম।

ছবিটার প্রসঙ্গেঃ

কোনো ছবির ব্যাপারে জানা নেই আমার।

শুনেছি ছবিটা আপনার কাছে থাকতে পারে।

কোন বোকাচোদা এসব বলেছে? পাগল নাকি! আচ্ছা, ধরা খাওয়ার

আগে ফুজিও একটা ছবি দিয়েছিল আমাকে। কিন্তু ছবিটা একেবারেই ঝাপসা।

ছবিটা আপনি নিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। এতে সমস্যা কোথায়? এর মানে তো এই না আমি কিছু করেছি। অথবা কোনো বিশেষ কারণেও আমি ওটা নেইনি। শুধু তখন ফেলে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি নিশ্চিত আপনার বাড়িতে খুঁজলেও আপনার ছোটবেলার অনেক ছবিই পাওয়া যাবে।

ওটা আছে এখনো আপনার কাছে?

নাহ। হিদাকা দেখা করতে আসার কয়েকদিন পরই ফেলে দিয়েছি।

ছবিটা হিদাকাকে দেখিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, দেখিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল তার জন্য ওটুকু করা যেতেই পারে। ছোটবেলায় অত্যাচার করেছি তাকে। আর এতদূর থেকে দেখা করতে এসেছিল সে। ছবিটা ধার চেয়েছিল, কয়েকদিনের জন্য ধার দিই। কয়েকদিন পর একটা এনভেলপে করে ছবিটা পাঠিয়ে দেয় হিদাকা। একটা নোট ছিল এর সাথে, ছবি জমা করে না সে এই টাইপ কিছু লেখা ছিল ওতে। যাইহোক, এরপরই এনভেলপ সহ ফেলে দিই ছবিটা।

এরপর হিদাকার সাথে দেখা হয়েছে আর?

নাহ।

আর কোনো ছবি ছিল?

ওই একটাই। আমার জানা নেই ফুজিও ওই একটার বেশি ছবি তুলতে পেরেছিল কি না। আপনার কথা শেষ হয়েছে?

জিজ্ঞাসাবাদ: হেইকিচি সুজিমুরা

নোট: এই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমি মিস্টার সুজিমুরার নাতনির সাথে কথা বলেছি। মিস্টার সুজিমুরার নাতনী তার দোভাষী হিসেবে কাজ করে, কেননা তিনি ঠিকমত কথা বলতে পারেন না।

আপনার দাদার বয়স কত?

উম, একানব্বই সম্ভবত, কিন্তু তার হার্ট এখনো ঠিক আছে। তবে

হাঁটাচলা করতে পারে না। সবকিছু বুঝতে পারলেও, শোনার সমস্যা আছে।

কবে রিটায়ার করেছেন উনি?

প্রায় পনেরো বছর আগে আতশবাজির ব্যবসা বন্ধ করেছেন তিনি। সময়ের আগেই অবসর নিয়েছেন, কারণ চাহিদা কমে গিয়েছিল জিনিসটার। নদীর পাড়ে আতশবাজির খেলা দেখানো বন্ধ করে দেয় ওরা, ফলে ব্যবসায় ভাটা পড়ে। আর আমার বাবা এই ব্যবসায় জড়িত নয়, সেজন্যই আমরা ভাবি এই জিনিস চালিয়ে যাওয়ার কোনো মানে নেই।

এই বইটা দেখেছেন?

নিভে যাওয়া অনল? ওহ, কুনিহিকো হিদাকার লেখা। নাহ শুনিনি এর নাম। মনে হয় না আমার পরিবারের কেউ এই বই পড়েছে।

আপনার দাদাকে একটু জিজ্ঞেস করবেন?

চেষ্টা করছি, কিন্তু আমি উত্তরটা জানি মনে হয়।

...নাহ, সে-ও এর নাম শোনেনি। দীর্ঘদিন কোনো বই পড়েনি সে। কি হয়েছে এই বইটার?

আপনার দাদার কাজের ওপর ভিত্তি করে লেখা এই বইটা।

সত্যিই? বইটা আতশবাজি কারিগরদের নিয়ে?

...দাদা বলছে বেশ অদ্ভুত বিষয়ের ওপর লেখা হয়েছে বইটা। তার কাজের ব্যাপারে খুব কম মানুষই জানে, বলল সে।

হিদাকা প্রসঙ্গে:

আমার দাদার ওয়ার্কশপ শহরে মন্দিরের পাশেই। ফলে ছোটবেলায় হয়তো মিস্টার হিদাকা দাদার কাজ দেখে থাকতে পারেন। সেটা দিয়েই হয়ত উপন্যাস লিখেছেন?

...দাদা বলল, এলাকার কিছু বাচ্চা মাঝেমধ্যে খেলতে আসতো। দাদা ওদেরকে তাড়িয়ে দিত, কারণ কাজটা ছিল বিপজ্জনক। কিন্তু এদের কয়েকজন এতোই নাছোড়বান্দা ছিল, দাদা ওদেরকে ভেতরে ঢুকিয়ে কাজ দেখতে দিত।

অনেকগুলো বাচ্চা আসতো নাকি?

খুব বেশি না, বলল সে। তবে একজনের কথা মনে আছে।

কারোর নাম মনে আছে তার?

...দুঃখিত, না। বলল, সে ওই ছেলেটাকে ভোলেনি। তবে কখনোই নাম জানতো না তার।

ছবি দেখলে কি ছেলেটাকে চিনতে পারবে সে?

ঠিক নিশ্চিত নই, দীর্ঘদিন আগের ঘটনা। জিজ্ঞেস করি দাঁড়ান।

...আচ্ছা, সে বলল তার মনে আছে ছেলেটা দেখতে কেমন ছিল। আপনার কাছে ছেলেটার কোনো ছবি আছে? থাকলে দেখান।

...বলল, যে ছেলেটার কথা মনে আছে সে অন্যদের তুলনায় ছোটখাটো গড়নের ছিল। এটা কি? মিডল-স্কুল ইয়ারবুক? তাহলে ছেলেটা এই গ্রুপের মধ্যের কেউ? কিন্তু ওয়ার্কশপে যখন আসতো তখন তো আরও ছোট ছিল না? ঠিক, এমনটাই মনে হচ্ছে আমার। আচ্ছা আমি তাকে বলার চেষ্টা করছি...

অধ্যায় ৮

অতীত (তৃতীয় পর্ব)
কিয়োচিরো কাগার গল্প

আমার বিশ্বাস, আমি এমন সবার সাথেই দেখা করেছি যারা ওসামু নোনোগুচি ও কুনিহিকো হিদাকার অতীতের ব্যাপারে কিছু না কিছু জানাতে পারবে, বিশেষ করে ওদের মিডল-স্কুলে পড়াকালীন সময়ের ব্যাপারে। আমি নিশ্চিত, আরও অনেকেরই খোঁজ পাইনি, কিন্তু যা পেয়েছি আমার মনে হয় আপাতত ওটুকুই যথেষ্ট। যদিও সকল এভিডেন্স ও সাক্ষ্য পুরো ব্যাপারটাকে বিশাল এক ধাঁধার অসংখ্য টুকরায় পরিণত করেছে।

সবকিছুর কেন্দ্রে রয়েছে হিদাকা ও নোনোগুচির মিডল-স্কুল জীবনে হওয়া ওই বুলিয়িংয়ের ঘটনাগুলো। আর এটাই ব্যাখ্যা করে ওদের ভবিষ্যত সম্পর্ককে। ওই ঘটনাগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করার পর টের পেলাম গল্পের বাকি অংশ মিলে যাচ্ছে। এখন একটা ব্যাপার নিশ্চিত, এই বিভ্রান্তিকর অতীত ইতিহাসটুকু না বুঝলে হিদাকার মৃত্যুর দিন কী ঘটেছিল সেটা বোঝা প্রায় অসম্ভব।

* * *

বুলিয়িংয়ের ব্যাপারে কিছুটা হলেও ধারণা আছে আমার, যদিও প্রত্যক্ষভাবে নয় (ভিক্টিম বা নির্যাতনকারীর সম্পর্কে, অন্তত একটু হলেও এদের ব্যাপারে অবগত)। আমার অভিজ্ঞতা পরোক্ষ। দশ বছর আগে মিডল-স্কুলের হোমরুম টিচার থাকাকালীন নবম গ্রেডের দায়িত্বে ছিলাম আমি। প্রথম সেমিস্টারের শেষের দিকে প্রথমবারের মত বুলিয়িংয়ের আভাস নজরে আসে। সেমিস্টার শেষের পরীক্ষা থেকেই পাই প্রথম সূত্র। ইংলিশ শিক্ষকের

মতে, হোমরুমের পাঁচজন ছাত্র একটা প্রশ্নের উত্তর একইভাবে ভুল করেছিল।

ওই ইংলিশ টিচারকে ঠাণ্ডা মাথার একজন বিবেচক লোক হিসেবেই জানতাম। কখনোই তাকে কোনো ব্যাপারে রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখিনি।

"এটাকে একপ্রকার নকল-ই বলা চলে। এরা সবাই ক্লাসরুমের পিছে একইসাথে বসে পরীক্ষা দিয়েছে। ওদের সাথে গিয়ে কথা বলতে পারতাম, কিন্তু ভাবলাম প্রথমে তোমার সাথে আলাপ করি।"

কয়েকমুহূর্ত বিবেচনা করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপারটা আমি খতিয়ে দেখব কি না?যদি সত্যি নকল হয়ে থাকে, তবে সেটা শুধু ইংলিশ ক্লাসেই সীমাবদ্ধ নয়।

"দ্রুত ব্যবস্থা নাও," বলে সে। "একবার ওদেরকে ছাড় দিলে বাকিরাও পেয়ে বসবে।"

তার কথাটা গুরুত্বের সাথেই নিই আমি।

বাকি শিক্ষকদের কাছে যাই আমি, যাদের সাবজেক্ট ওই ছাত্রগুলোর ছিল, ওদের জিজ্ঞাসা করি পরীক্ষার খাতায় সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়েছে নাকি। আমি যে বিষয়টা পড়াতাম: সামাজিক বিজ্ঞান ও ভূগোল–সেটার টেস্টের খাতাও আরেকবার চেক করি।

কেবল ওই পাঁচজনের উত্তরপত্রেই কিছু মিল ছিল। কম্পোজিশন, সায়েন্স ও আমার সাবজেক্টে আর কোনো ছাত্রের নকলের কোনো আলামত পাইনি।

বিজ্ঞান শিক্ষকের মতামত:

"ওরা বোকা নয়। ধরা পড়ে যাবে, এমন কিছু করবে না ওরা। বাচ্চারাও মাথা খাটালে ধূর্ত হতে পারে।"

কিন্তু গণিতে কাজ করল না ওদের চালাকি।

গণিত শিক্ষকের মতামত:

"কোনো ছাত্র প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ষে অংক না বুঝলে তৃতীয় বর্ষে

সাধারণত কিছুই ধরতে পারে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো টেস্টের আগে আমি বুঝতে পারি কে কোন প্রশ্নটার উত্তর করতে পারবে। যেমন আমি জানি সর্বশেষ টেস্টে শেষ উপপাদ্যের প্রমানটা করা ইয়ামাওকার ক্ষমতার বাইরে। তার উত্তরটা দেখো : 'A, D, E, F' কিন্তু সঠিক উত্তর হল : △, D, E, F। ছেলেটা অন্যের খাতা দেখে লিখেছে নিশ্চিত, আর ডেল্টার স্থানে A বসিয়েছে।"

একজন গণিতবিদের কাছ থেকে এমন যুক্তিই আশা করা যায়।

স্পষ্টতই এই পরিস্থিতিতে আশাবাদী হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এই বিষয়ে আমার প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে বিবেচনা করতে হত। স্কুলের বাচ্চাদের হাতেনাতে না ধরে নকলের জন্য শাস্তি দেয়া স্কুল পলিসির বাইরে। তবুও ছাত্রদের নকল করার বিষয়টা আমাদের চোখে পড়েছে এটা ওদের জানানো আমাদের কর্তব্য। সোজা কথায় সাবধান করতে হবে ওদেরকে। তো একদিন ক্লাস শেষে জড়িত ছাত্রদের সাবধান হয়ে যেতে বললাম।

প্রথমে জানালাম, নকলের অভিযোগে সন্দেহ করা হচ্ছে ওদেরকে। এরপর বলি সন্দেহের পেছনের কারণ–ইংলিশ পরীক্ষায় একই রকম ভুল করেছে ওরা সবাই।

"তোমাদের কি বলার মত কিছু আছে?" জিজ্ঞেস করি আমি।

কেউই কোনো জবাব দেয় না। ইয়ামাওকার দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করি এরপর।

মাথা নাড়ে সে, "আমি নকল করিনি।"

এরপর একে একে প্রত্যেককেই জিজ্ঞেস করি, সবাই-ই অস্বীকার করে।

প্রমাণ ছাড়া কিছুই করার নেই আমার। কিন্তু নিশ্চিত ওরা মিথ্যে বলছিল।

কথা বলার সময় নিচু ছিল সবার মাথা, কিন্তু মেইনো নামের একজনের চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল আমি কথা শেষ করার সময়। ছাত্রদের অবস্থা ও আগের বছরের রেজাল্টের ওপর ভিত্তি করে আমি অনেকটাই নিশ্চিত ছিলাম এই ছেলেটার খাতা-ই বাকিদের নকলের উৎস। স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী, যে নিজের খাতা দেখিয়ে অন্যদের নকল করতে দেবে সে-ও বাকিদের মতই দোষী। ওই রাতে মেইনোর মায়ের কল পাই আমি। মহিলা জানায়, তার

ছেলে উদ্ভট আচরণ করছে, স্কুলে কিছু ঘটেছে কি না। নকলের ঘটনাটা তাকে বলি, ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে শুনতে পাই দীর্ঘশ্বাস।

"আমার সন্দেহ আপনার ছেলেই বাকিদেরকে তার উত্তরপত্র দেখিয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটাও অপরাধ। যাইহোক, আমাদের হাতে নিরেট প্রমাণ নেই বলে এবার কিছু করছি না। ওই পাঁচজনকে এবার সাবধান করেই ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার ছেলে কী রকম উদ্ভট আচরণ করছে বললেন?"

"পোশাকে কাদামাখা অবস্থায় বাসায় এসেছে ও," কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে ওই মহিলা। "এরপর ঘরে দরজা লাগিয়ে বসে আছে, এখনো বের হয়নি। ওর চেহারার দিকে একঝলক তাকিয়েছিলাম। চেহারা ফুলে আছে, মিস্টার কাগা। আমার মনে হয়, আহত হয়েছে ও, রক্তও ঝরেছে।"

পরেরদিন অসুস্থতার কারণে স্কুলে আসেনি মেইনো। একদিন পর সে স্কুলে এলে লক্ষ করলাম তার একটা চোখের ওপর কাটা দাগ। ফোলা মুখ আর কালশিটে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল কেউ পিটিয়েছে তাকে। কার কাজ হতে পারে এটা আমার ধারণা ছিল।

ঠিক তখনই বুঝতে পারি যারা মেইনোর খাতা নকল করেছিল ওরা তার বন্ধু নয়। জোর করে তার খাতা দেখে লেখে ওরা। খাতায় ভুল ছিল বলে এভাবে ওকে শাস্তি দিয়েছে। আমি জানতাম না, এই নকলের ঘটনার আগে থেকেই স্কুলে বুলিং চলত নাকি পরে শুরু হয়েছে।

এরপরই গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরু হয়ে যায়, কী বাজে টাইমিং ছুটি শুরু হওয়ার! যখনই ভাবলাম ব্যবস্থা নেবো তখনই ওদেরকে আর পেলাম না ছুটির কারণে। ভেবেছিলাম ছুটি শেষ হলে ওদেরকে ধরব। কিন্তু পারিনি, ব্যস্ত হয়ে পড়ি। পরবর্তি বছরে আমার ছাত্ররা যেন ভালো হাইস্কুলে ভর্তি হতে পারে এজন্য ওদেরকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। স্কুলের প্রসপেক্টাস সংগ্রহ, রিকমেন্ডেশন তৈরি, ফর্ম পূরণ আরও কত কাজ। কিন্তু এগুলো কেবলই অজুহাত। এরইমধ্যে ইয়ামাওকা ও তার বন্ধুরা প্রায় দশ হাজার ইয়েনের মত ছিনিয়ে নেয় মেইনোর কাছ থেকে। একজন স্কুলবালকের জন্য টাকার অঙ্কটা বেশ বড়ই। আরও বড় কথা হল দিনে দিনে ওদের মাস্তানি, জোরজবস্তি, হেনস্তা বাড়তেই থাকল। ব্যস্ততার কারণে এসব ব্যাপারে পরে জানতে পারলাম। দ্বিতীয় সেমিস্টারের শুরুর দিকে মেইনোর নিম্নগামী গ্রেড আর

বখাটে ছেলেগুলোর মাস্তানি উভয়ের ব্যাপারেই অবগত হলাম। প্রতিদিনই কাউকে না কাউকে হেনস্তা করত ওরা। খারাপ হয়ে উঠছিল পরিস্থিতি। কিন্তু কতটা খারাপ সেটা আমার কল্পনারও বাইরে। পরে জানতে পারি, মেইনোর মাথার চুলের আড়ালে ছিল ছয়টারও বেশি সিগারেটের ছ্যাকার দাগ।

আমার কয়েকজনের কলিগের মতে কয়েকদিন পরেই যেহেতু এরা গ্র্যাজুয়েট হয়ে স্কুল ছাড়বে সেহেতু এই বুলিংয়ের ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়াই উত্তম। অপর কথায় গ্র্যাজুয়েশনকেই এই সমস্যার সমাধান ভাবা হয়েছিল। কিন্তু আমার মতে এটা কোনো সমাধান নয়। আমি শিক্ষক হিসেবেও তুলনামূলক নতুন ছিলাম। ওই বছরই প্রথমবারের মত সিনিয়র ক্লাসের হোমরুমে নিয়োগ দেয়া হয় আমাকে। চাইতাম না, আমার অধীনে থাকার কারণে কোনো ছাত্র আফসোস করুক।

প্রথমে মেইনোর সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিই, জানতে চাই এই হয়রানীর শুরুটা কিভাবে আর এযাবৎ কী ঘটেছে।

কথা বলতে রাজি হয় না মেইনো। ভয় পাচ্ছিল, কথা বললে যদি বুলিয়িং বেড়ে যায়। ওর কপাল দিয়ে বেয়ে পড়া ঘাম আর কাঁপতে থাকা আঙুল দেখে বুঝতে পারি ছেলেটা আতঙ্কিত। মেইনোর আত্মবিশ্বাস কিভাবে বাড়ানো যায় সেটা ভাবি। কেন্ডো চর্চা আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর ভালো উপায় হতে পারে বলে মনে হয়েছিল আমার। সেসময় স্কুলের কেন্ডো ক্লাবের দায়িত্বে ছিলাম আমি। অনেক ভীতু ছেলেকেও এই খেলাটা খেলে সাহসী হয়ে উঠতে দেখেছি।

বছরের মাঝামাঝি হওয়ায় কেন্ডো ক্লাবে নতুন সদস্য নেয়া হচ্ছিল না, এজন্য প্রত্যেকদিন সকালে স্কুল শুরুর আগে মেইনোকে ব্যক্তিগতভাবে চর্চা করাতে থাকি আমি। আমি কি করার চেষ্টা করছি সেটা বোঝার মত যথেষ্ট বিচক্ষণ ছিল মেইনো। কেন্ডোর নিয়মগুলো বেশ ভালোই রপ্ত করছিল সে, কিন্তু তার আগ্রহ ছিল অন্য কিছুতে : ছুরি নিক্ষেপ।

ছুরি নিক্ষেপের খেলাটা আমি শেখাতাম খেলোয়াড়দের মনযোগ বাড়ানোর জন্য। খেলাটা ছিল সহজ : দেয়ালের তাতামির দিকে লক্ষ্য করে ছুরিটা নিক্ষেপ করা। মাঝেমধ্যে চোখ বন্ধ করে এমনকি উল্টো ঘুরেও লক্ষ্যভেদ করতে পারতাম আমি। এই খেলাটাতে অধিক মনযোগের দরকার

হত। চারপাশে সবকিছুর ওপর সজাগ থেকে লক্ষ্য ও ছুরির দিকেই নিবদ্ধ করতে হত সকল মনযোগ। দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য জিমে কেউ আসার আগেই এই অনুশীলনটা করতাম আমি। কিন্তু একদিন আগেভাগেই চলে এসে আমাকে এই অনুশীলন করতে দেখে মেইনো। আমাকে বলে, এই খেলাটা চেষ্টা করতে চায় সেও। কোনো ছাত্রের হাতে ধারালো অস্ত্র দেয়া স্কুলের নিয়মনীতির বহির্ভূত ছিল। এজন্য আমি রাজি হইনি। কিন্তু আমার অনুশীলন দেখতে দিতাম তাকে। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে, মনযোগ দিয়ে আমার চর্চা লক্ষ করত। একদিন এই খেলার ট্রিকের ব্যাপারে আমার কাছে জানতে চায় সে।

"শুধু বিশ্বাস রাখতে হবে, তোমার দ্বারা এটা করা সম্ভব," তাকে বলি আমি।

এর কয়েকদিন পরেই বখাটেদের নেতা ইয়ামাওকা অ্যাপেন্ডিসাইটের কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়। যেহেতু বুলিংয়ের বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়ার পক্ষে ছিলাম না আমি, সেহেতু এই ঘটনাটিকে মেইনোর মন থেকে ইয়ামাওকার ভয় অপসারণের সুযোগ হিসেবে দেখলাম।

ওকে বললাম প্রতিদিনের ক্লাসনোট কপি করে হাসপাতালে পাঠাতে। চোখে জল নিয়ে কাজটা করতে রাজি হল না ও। কিন্তু আমি শুনলাম না। আমি চাইনি হতাশা নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হোক ছেলেটা।

জানি না হাসপাতালে কি হচ্ছিল। তবে আমার মনে হয় মেইনো হাসপাতালে গিয়ে চুপিচুপি নোট রেখে চলে আসত। সম্ভবত ওদের দুজনের দেখাও হয়নি হাসপাতালে। আমার অবশ্য কিচ্ছু যায় আসে না। মনে হয়েছিল, ইয়ামাওকা যতই মেইনোর কাছে ঋণী হবে ততই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে মেইনো। এটুকুই যথেষ্ট।

ইয়ামাওকা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে জানতে পারি যেমনটা ভেবেছিলাম ঠিক তেমনটাই হয়েছে। কয়েকজন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করি ওই বখাটেদের গ্যাং আর মেইনোর মধ্যকার অবস্থা সম্পর্কে। ওরা জানায়, পুরোপুরি থেমে গিয়েছে বুলিয়িং। ছেলেরা মিথ্যেও বলে থাকতে পারে, তবে মেইনোকে আগের থেকে আনন্দিত দেখাত। আমার মনে হয় সব হয়ত ঠিক হয়ে গিয়েছে।

গ্র্যাজুয়েশনের পর টের পাই কতটা ভুল ছিল আমার ধারণা।

গ্র্যাজুয়েশনের দিন আমি খুব খুশি ছিলাম। আমার ছাত্ররা সব হাইস্কুলে পা রাখবে, নিজের সাথে করে কোনো সমস্যাও নিয়ে যাচ্ছে না ওরা এটা ভেবে। এই সাফল্যের জন্য নিজেকেও একটু আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল। ভেবেছিলাম, অন্তত পেশা নির্বাচনে ভুল করিনি আমি।

ঠিক ওই রাতেই পুলিশের কাছ থেকে একটা ফোনকল পাই। জুভেনাইল অ্যাফেয়ার্সের দায়িত্বে থাকা অফিসার এমন কিছু বলে যা শুনে রক্তে ভয়ের শীতল স্রোত বয়ে যায়। অস্ত্রসমেত গ্রেফতার করা হয়েছে মেইনোকে, মারামারির অভিযোগে।

প্রথমে মনে হয়েছিল ভুল হয়েছে অফিসারের। এর উল্টোটাই হওয়ার কথা নয়?

জানা যায় দুজনেই আহত। গ্রেফতারের সময় ছেড়া ছিল মেইনোর কাপড়। ফুলে ছিল চেহারা, আর পুরো শরীরে কালশিটে।

বিদায় অনুষ্ঠানের পর ইয়ামাওকা ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা মেইনোকে একা পেয়ে ইচ্ছামত পিটায়। মিস্টার কাগা নামক এক শিক্ষকের কড়া নজরে থাকার কারণে এতদিন কিছু করেনি ওরা। কিন্তু আমার নজরের বাইরে যেতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে মেইনোর ওপর। পিটিয়ে পাল্টে দেয় ওর চেহারা।

জানি না মার খাওয়ার পর কতক্ষণ ওভাবে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল মেইনো। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েই প্রথমে জিমের কেন্ডো রুমে চলে যায় ও। ওখানে গিয়ে আমার লকার ভেঙে বের করে থ্রোয়িং নাইফ।

মেইনো জানত ইয়ামাওকাকে কোথায় পাওয়া যাবে, কেননা ওখানে গিয়েই ওদের চাঁদাবাজির টাকাটা ওকে বারবার দিয়ে আসতে হত। আড্ডাখানায় ইয়ামাওকাকে পেয়ে আর ইতস্তত করেনি মেইনো। তার কাছে গিয়ে বারবার ছুরি চালাতে থাকে ও। আড্ডাখানার মালিক কল করে পুলিশকে। পুলিশ এসে দেখে ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে মেইনো, তখনো ওর হাতে আমার ছুরি।

তখনই পুলিশ স্টেশনে যাই আমি, কিন্তু আমার সাথে দেখা করতে রাজি হয়নি মেইনো। পরে শুনেছি সুস্থ হয়ে গিয়েছে ইয়ামাওকা, আঘাত গুরুতর ছিল না।

পরেরদিন কেসের দায়িত্বরত অফিসার আমাকে বলে, "জানেন মেইনো ওই জায়গায় ছেলেটাকে ছুরি মারার পর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিল। বাকি ছেলেদের জিজ্ঞেস করি, কেন ওরা প্রথমে মেইনোকে মেরেছে। ওরা বলে, ওদের নাকি তাকে পছন্দ নয়। কেন পছন্দ নয় জিজ্ঞেস করার পর কী বলেছে, জানেন?

"এমনিই।"

ব্যাপারটা আমাকে চরমভাবে হতাশ করে।

এরপর ইয়ামাওকা বা মেইনো কারোর সাথেই আর কথা বলিনি আমি। ঘটনার কয়েকদিন পর মেইনোর মা আমাকে জানায়, আমিই 'দুনিয়ার একমাত্র ব্যক্তি' যার সাথে কখনোই দেখা করতে চায় না মেইনো।

এপ্রিল মাসে স্কুলের নতুন বর্ষ শুরু হয়। আর ক্লাসরুমে ফিরে যাইনি আমি। একপ্রকার পালিয়েই বেঁচেছি। আজ পর্যন্ত আমার বিশ্বাস, এটাই আমার জীবনের সবথেকে জঘন্য ব্যর্থতা।

অধ্যায় ৯

সত্য

কিয়োচিরো কাগার সমাধান

কেমন বোধ করছেন?

আমি এখানে আসার আগে ডাক্তারের সাথে আলাপ করেছি, সে জানাল আপনি সার্জারি করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শুনে খুশি হয়েছি। আপনি সবধরণের কাগজপত্রে স্বাক্ষর করে দিয়েছেন। ওরা এখন কাজটার জন্য প্রস্তুত। ফেরার কোনো পথ নেই। আর অপারেশন সফল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আপনাকে ভালো বোধ করানোর জন্য বলছি না আমি। সত্যিটাই বলছি।

"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কখন টের পেলেন আপনি অসুস্থ? এই শীতেই? এই বছরই?

"নাহ, আমার মনে হয় আপনি গত বছরের শেষদিকে টের পান আবারও নতুনভাবে ক্যানসার ফিরে আসতে শুরু করেছে। আপনি ভাবেন, এবারই শেষ। আর সুস্থ হওয়ার বা বাঁচার কোনো সুযোগ নেই। ঠিক বলছি না? এজন্যই আর হাসপাতালে যাওয়ার চিন্তা করেননি।

"আমার এমনটা মনে হওয়ার পেছনে কারণ আছে। আমার মতে তখনই আপনি কুনিহিকো হিদাকার খুনের পরিকল্পনা করেন।

"অবাক হচ্ছেন? হওয়া উচিত নয়। আমার এই ধারণার পেছনে যৌক্তিক কারণ আছে। এমনকি এভিডেন্সও আছে আমার হাতে। এটা নিয়েই কথা বলতে চেয়েছি আপনার সাথে। হয়তো অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু বেশি সময়ই থাকবো আজকে। চিন্তা নেই, আপনার ডাক্তার আমাকে অনুমতি দিয়েছে।

"এটা দেখুন। ছবিটা চিনতে পারছেন? হিদাকার বাড়িতে আপনার অনুপ্রবেশের ভিডিও থেকে নেয়া এটা। হিদাকার বাগানে লাগানো হিডেন ক্যামেরা, যাতে ধরা পড়ে আপনার কার্যক্রম। আপনার স্বীকারোক্তিতে যেমনটা বলা আছে আর কি।

"আপনি চাইলে একটা প্লেয়ার এনে পুরো ভিডিওটা আরেকবার রিভিউ করতে পারি আমরা। তবে আমার মনে হয় না সেটার আর প্রয়োজন আছে। এই একটা ফ্রেম-ই যথেষ্ট। তাছাড়া, ফুটেজটা বারবার দেখতে দেখতে নিশ্চয়ই বিরক্ত আপনি। যতই হোক ব্যাপারটা আপনারই সাজানো। এই অভিনয়টাও আপনার করা, এমনকি ভিডিওটা আপনিই ধারন করেছেন। এটাই ছিল অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে আপনার অভিষেক।

"হ্যাঁ, আমি দাবি করছি ভিডিওটা ভুয়া। এই টেপের সবকিছু মিথ্যে। এই ছবিটা দেখিয়ে এখন সেটারই প্রমাণ দেব আপনাকে। দেখুন, এই ভিডিওটা সাত বছর আগে ধারণ করা নয়, নিচের তারিখটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

"দাঁড়ান, ব্যাখ্যা করছি। ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। এখানে আমরা হিদাকার বাগানটা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক না? গাছগুলো লক্ষ করুন। বোঝাই যাচ্ছে ছবিতে বেশি গাছ নেই। বিখ্যাত চেরি গাছটা ফ্রেমের ঠিক বাইরে। আর লনটা শুষ্ক। এক পলক দেখেই বোঝাই যাচ্ছে এটা শীতকাল। আর যেহেতু এটা মাঝরাতে তোলা সেহেতু বাকিসব খুঁটিনাটি বোঝা কঠিন। এ কারনেই হয়তো ভেবেছিলেন এটা দিয়ে আমাদের বোকা বানাতে পারবেন।

"মিস্টার নোনোগুচি, দুর্ভাগ্যবশত বড় একটা ভুল করে ফেলেছেন আপনি। নাহ, মিথ্যে বলছি না আমি। সত্যিই বড় একটা ভুল করেছেন আপনি। লনের ওপাশে দাগটা দেখতে পাচ্ছেন? ওটা ওই চেরি গাছের ছায়া। যা রাস্তার ধারের স্ট্রিট ল্যাম্পের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। হ্যাঁ, এটা আবছা কিন্তু আপনার কারসাজি ধরে ফেলার জন্য যথেষ্ট।

"জানি, জানি ভিডিওর কোয়ালিটি আর বাগানের ওপর পড়া আলোর কারণে বোঝা কষ্টকর চেরি গাছটা সাত বছর নাকি মাত্র আধা বছর পুরানো। এক্ষেত্রে আপনি একবারে নিখুঁত। কিন্তু আমি এটা নির্দেশ করতে চাইছি না।

গাছের ছায়ার আকৃতি এক্ষেত্রে সমস্যা নয়, সমস্যাটা হল এখানে মাত্র একটা গাছ রয়েছে।

"আপনাকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। ব্যাখ্যা করি বিষয়টা। ভিডিওটা যদি সত্যিই সাত বছর আগে ধারণ করা হয়ে থাকে, তবে হিদাকার লন জুড়ে দুটো গাছের ছায়া থাকতো। কেন জানেন? কারণ, সাত বছর আগে হিদাকার বাগানে পাশাপাশি দুটো চেরি গাছ ছিল, সুখি দম্পতির মত।

"তো ভিডিওটা স্পষ্টভাবেই অত বছর আগের নয়। সম্প্রতি ধারন করা হয়েছে এটা, আর করেছেন আপনি। রাই হিদাকার মতে গত বছরের শেষের দিকে আপনার পক্ষে ভিডিওটা ধারন করা কঠিন ছিল না। কুনিহিকো হিদাকা তখনও অবিবাহিত ছিল, রাই হিদাকা তার বাড়িতে এসে ওঠেনি। আপনি অপেক্ষায় ছিলেন এমন এক রাতের যেদিন কুনিহিকো হিদাকা সম্পাদকের সাথে বসে মদ গিলে মাতাল হয়ে থাকবে।

"অবশ্যই বাড়ির একটা চাবি দরকার ছিল আপনার, অফিসের জানালাটা যেন আনলক থাকে সেটা নিশ্চিত করার জন্য। জানালা দিয়ে লাফ না দিলে আপনার 'হত্যা চেষ্টার' ভিডিও তো দুর্দান্ত হত না। ওহ, আমি জানি আপনার কাছে হিদাকার বাড়ির চাবির সেট ছিল না। রাইয়ের মতে এতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। প্রায়ই শহরের বাইরে গিয়ে চাবি হারিয়ে ফেলত হিদাকা, এজন্য সদর দরজার বাইরে থাকা ফুলের টবের আড়ালে চাবি রেখে যেত সে। এটা জানলে আপনার চাবির সেটের প্রয়োজন হওয়ার কথাও নয়। রাই অনেকটাই নিশ্চিত আপনি চাবির বিষয়ে জানতেন।

"জানি, আপনি এখন কী ভাবছেন মিস্টার নোনোগুচি। ভাবছেন, কোন ডিটেক্টিভ ভিডিওর প্রত্যেকটা ছায়া পর্যন্ত খতিয়ে দেখে সাত বছর আগে পরে কি ছিল সেটা খুঁজে বের করে! আপনার ভাবনাটা যৌক্তিক। কেউই এমনটা করে না। এমনকি আমিও করতাম না। দেখুন, শুধুমাত্র বাগানে অতিরিক্ত গাছের অনুপস্থিতি দেখেই ভাবিনি ভিডিওটা ভুয়া। বরং ভিডিওটা ভুয়া জানতাম বলেই বারবার ওটা দেখেছি। যে এভিডেন্স খুঁজছিলাম সেটা পাওয়ার জন্য হিদাকার বাগানের দুয়েকটা আগের ছবিও খুঁজে বের করা লেগেছে। কিন্তু কিভাবে জানলাম ভিডিওটি ভুয়া? আপনার স্বীকারোক্তি থেকে

পাওয়া আরেকটা এভিডেন্স ছিল প্রশ্নবিদ্ধ : যেমন, আপনার অ্যাপার্টমেন্টে বিশাল স্তূপাকারে থাকা পান্ডুলিপি। আমি নিশ্চিত, যা হিদাকাকে খুন করার পেছনে আপনার মোটিভের সাথে সম্পর্কিত।

"গ্রেফতারের পর যে স্বীকারোক্তিটা লিখেছেন আপনি, ওটা পড়তে গিয়ে বেশ কিছু জিনিসে খটকা লাগে আমার। এর সবকিছু আলাদাভাবে হয়ত ব্যাখ্যা করা সম্ভব, কিন্তু একত্রিত করে ভাবলে আমার মনে হচ্ছিল কিছু একটা কাজ করেছে আপনার মাথায়, মিস্টার নোনোগুচি। পুরো লেখাটাতে ছিল এক ধরনের কপটতা, যেটা দেখে আপনি যা লিখেছেন সেটা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে কষ্ট হচ্ছিল।

"ঠিক তখনই প্রথম বড় ক্লু'টা পেলাম। ভেবে অবাক হলাম, আপনার সাথে অনেকবার দেখা করলেও ঐ ব্যাপারটা আগে কখনোই লক্ষ করিনি আমি। কিন্তু সবসময়ই ওটা আমার সামনেই ছিল।

"মিস্টার নোনোগুচি, দয়া করে আপনার ডান হাতটা তুলে ধরুন, যেন আপনার আঙুলগুলো দেখা যায়। আপনার মধ্যাঙ্গুলিতে কলম ধরার কারণে কড়া পড়েছে। বেশ পুরুই সেটা।

"কিন্তু ব্যাপারটা অদ্ভুত, তাই না? আপনি হাতে লেখেন না, গল্প লেখার জন্য ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করেন। শিক্ষক হিসেবে চাকরী করার সময়ও ওয়ার্ড প্রসেসরের সাহায্যেই রিপোর্ট বা অন্যান্য দরকারী জিনিস লিখতেন। তাহলে আপনার হাতে ওই কলমের কড়া পড়ল কিভাবে? এখন হয়ত বিশ্বাস করাতে চাইবেন কলম ধরার কারণে ওই কড়া পড়েনি। তাহলে ওটা কি? আপনিও কি জানেন না? নাকি মনে পড়ছে না আপনার আঙুলের ওই দাগটা কিভাবে এলো?

"এটা নিয়ে বেশি চিন্তা করবেন না। ওই জিনিসটা আপনার আঙুলে আছে, আমার কাছে এটাই গুরুত্বপূর্ণ। ওটা কলম ধরার কারণে সৃষ্ট কড়া-ই। আর ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহারকারী কারোর আঙুলে কলমের কড়া পড়ার অর্থ সম্প্রতিই সে বিশাল বড় কিছু হাতে লিখেছে।

"এই ব্যাপারটাই আমাকে ভাবিয়েছে। আপনাকে বলি, যা জানতে পেরেছি সেটা ভাবলেই আমার মেরুদন্ডে শীতল স্রোত বয়ে যায়। আমার

নতুন থিওরি যদি সত্যি হয় তবে এই তদন্ত পুরো একশো-আশি-ডিগ্রি ঘুরে যাবে।

"সরাসরি প্রসঙ্গে আসা যাক : আপনার অ্যাপার্টমেন্টে যেসব পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে ওসব গত কয়েক দশকে লেখা নয়। ওগুলো আপনার হাইস্কুল বা কলেজে পড়াকালীন সময়েও লেখা নয়, ওসব লেখা হয়েছে অতি সম্প্রতি, তাড়াহুড়ো করে। অবিশ্বাস্য শোনাচ্ছে, আমি জানি। কারণ এর মানে দাঁড়ায়, মিস্টার হিদাকা আসলে আপনার কোনো লেখা বা ওই পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে কোন আইডিয়া চুরি করেনি।

"কিন্তু প্রমাণ ছাড়া কোনো থিওরি তো যথেষ্ট নয়। প্রমাণ করার তো কোনো উপায় দরকার, এজন্য আমি কয়েক জায়গায় এর খোঁজ করি।

"মিস্টার নোনোগুচি, আপনি কি হেইচি সুজিমুরা নামের কোনো লোককে চেনেন? চেনেন না? আমার মনে হয় না।

"স্বীকারোক্তিতে আপনি লিখেছেন ছোটবেলায় আপনি আর নোনোগুচি এলাকার আতশবাজি কারখানায় কাজ দেখতে যেতেন। আপনি বলেছেন ওই কারখানায় কাজ দেখার স্মৃতি থেকে আপনি 'অগ্নিবলয়' গল্পটা লেখেন। সেটার ওপর ভিত্তি করেই মিস্টার হিদাকা লিখেছে 'নিভে যাওয়া অনল' উপন্যাসটা।

"আতশবাজির কারিগরের নাম মিস্টার সুজিমুরা। হ্যাঁ, অবশ্যই নামটা ভুলে গিয়ে থাকতে পারেন আপনি। এটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। আমার মনে হয় কুনিহিকো হিদাকাকে জিজ্ঞেস করতে পারলে জানা যেতো সে-ও হয়তো ভুলে গিয়েছে।

"কিন্তু মিস্টার সুজিমুরা এখনো বেঁচে আছেন। বয়স নব্বই, তিনি এখন হুইলচেয়ারে। তবে স্মৃতিশক্তি এখনও তীক্ষ্ণ। যে ছেলেটা কারখানায় যেত তাকে ভোলেননি তিনি। একজন ছেলেই যেত, দুজন নয়। আমি আপনার মিডল-স্কুল ইয়ারবুকের ছবি তাকে দেখাই, সে একজনের দিকে ইঙ্গিত করে। ওই একজন কুনিহিকো হিদাকা।

"ওহ্, তাকে আপনার ছবি দেখানোর পর সে বলে আপনাকে কখনোই দেখেনি।

"তার সাক্ষ্যই আমার শেষ সন্দেহের ছাপটাও মুছে দিয়েছে। মিস্টার হিদাকা আপনার কাজ চুরি করেননি, তার কোনো উপন্যাস-ই আপনার লেখার ওপর ভিত্তি করে নয়। আপনার ওই গল্প, উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিগুলোই বরং তার উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে বানানো। ঠিক তখনই উল্টো দিক থেকে বিষয়গুলো দেখতে আরম্ভ করি আমি। সত্যিটা হল, মিস্টার হিদাকা একটা শব্দও আপনার থেকে চুরি করেননি। কোনো প্ল্যাজিয়ারিজম-ই হয়নি, আর প্ল্যাজিয়ারিজম হয়নি মানে কোনো ব্ল্যাকমেইল বা হত্যাচেষ্টার ঘটনাও ঘটেনি।

"তাহলে কী পেলাম আমরা? হাতসুমি হিদাকার সাথে আপনার অবৈধ সম্পর্ক-ই ওই তথাকথিত হত্যাচেষ্টার পেছনে আপনার মোটিভ ছিল? আপনার দাবির কি আদৌও কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা আছে? চলুন এভিডেন্সগুলো আবার খতিয়ে দেখা যাক।

"প্রথমে আপনার অ্যাপার্টমেন্টে পাওয়া গেল অ্যাপ্রন, নেকলেস ও ট্র্যাভেল ডকুমেন্ট। এরপর পাওয়া গেল একটা ছবি, পরবর্তিতে জানা গেল যেটা হাতসুমির। ছবিটা তোলা ফুজি নদীর পার্শ্ববর্তি রেস্ট এরিয়ার দিকে। একই জায়গা থেকেই মাউন্ট ফুজির ছবি তুলেছেন সেটা আর বললাম না।

"এসবই। আর কিছুই নেই। কোনো সাক্ষীও নেই যে আপনাদের দুজনকে একসাথে দেখার সাক্ষ্য দিতে পারে, আপনাদের সম্পর্কের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার কথা দূরে থাক।

"ওই ট্র্যাভেল ডকুমেন্টগুলো যেকোনো সময়ই বানানো যায়। ওগুলো কোনো কিছু প্রমাণ করে না। আবার যে নেকলেস হাতসুমির উপহার বলে দাবি করেছেন ওটা অন্য কারোরও হতে পারে, আবার কারোর-ই নাও হতে পারে। তবে অ্যাপ্রনটা হাতসুমিরই। আগে যেমন বলেছি, একটা ছবিতে হাতসুমিকে পরে থাকতে দেখা গিয়েছে ওই অ্যাপ্রন।

"হিদাকার বাড়ি থেকে একটা অ্যাপ্রন চুরি করা আপনার জন্য কঠিন কিছু না। হয়তোবা যখন হিদাকা সম্পাদকের সাথে মদ গিলে মাতাল হয়ে ছিল কিংবা তার মৃত স্ত্রীর জিনিসপত্র পরিষ্কার করার জন্য তাকে সাহায্য করতে গিয়েই চুরি করেছেন ওটা।

"তখনই হয়তো একটা ছবিও চুরি করে নিয়েছিলেন। ছবি চুরির সময় মাথায় রেখেছিলেন কয়েকটা বিষয় : ছবিতে হাতসুমিকে একা থাকতে হবে, ওই একই স্থানের কোনো ছবিতে যেন কুনিহিকো না থাকে। সেইসাথে লাগবে আরেকটা ছিমছাম ছবি, সেটা হতে পারে কোনো দৃশ্যের, যা পুরো ব্যাপারটায় আলাদা মাত্রা নিয়ে আসবে। এই সবগুলো শর্ত পূরণ করে ফুজি নদীর পার্শ্ববর্তি রেস্ট এরিয়াতে তোলা ছবিটা।

"নাহ, আপনি কিছু চুরি করেছেন এমন কোনো প্রমাণ আমার কাছে নেই। আমি শুধু বলছি এমন কিছু করা সম্ভব। কিন্তু আপনার লেখা আমাকে অসংখ্যবার ভুল পথে পরিচালিত করেছে। ফলে আপনার সাথে হাতসুমির অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপারটা শুধু কানে শুনেই বিশ্বাস করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এজন্য ওই সব সম্ভবনার ওপরই ভরসা করতে হচ্ছে।

"অবশ্যই কোনো হত্যাচেষ্টার ঘটনা না ঘটে থাকলে কোনো ব্ল্যাকমেইল বা গল্প নকলের ঘটনাও ঘটেনি। আর এসব ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল হাতসুমির পরকীয়া দিয়ে। কিন্তু বাস্তবে সেটাও ঘটেনি। যা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় হাতসুমির মৃত্যুটা নিছকই দুর্ঘটনা। তার আত্মহত্যার কোনো মোটিভ ছিল না।

"তাহলে আমরা কি পেলাম একটু দেখা যাক–বিশেষ করে গতবছরের শুরু থেকে কি করেছেন আপনি। ক্রমানুসারে বলার চেষ্টা করি ঘটনাগুলো।

"প্রথমে আপনি কিছু অব্যবহৃত কিন্তু পুরানো স্পাইরাল নোটবুক সংগ্রহ করলেন। আমি নিশ্চিত, আপনি যে স্কুলে পড়াতেন ওখানকার কোথাও থেকেই ওগুলো নিয়েছেন। এরপর আপনি কপি করা শুরু করলেন কুনিহিকো হিদাকার প্রকাশিত লেখাগুলো। ঠিক সরাসরি কপি নয়, এমনভাবে ওগুলো কপি করলেন যেন মনে হয় আপনার লেখাগুলোই আসল আর উপন্যাসগুলো ওগুলোর ওপর ভিত্তি করেই লেখা। আমার মতে একেকটা উপন্যাসের পেছনে প্রায় মাসখানেকের মত সময় দিয়েছেন আপনি। বেশ ঝক্কির কাজ। কেন না, সাধারণত ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করেই অভ্যস্ত আপনি।। কাগজে লেখা যেসব গল্পগুলোর হিদাকার গল্পের সাথে কোনো মিল নেই, ওগুলো লিখেছেন কলেজ জীবনে আপনার লেখালেখির প্রমাণ তৈরির জন্য।

"তুষারদ্বার উপন্যাসেই আমরা আসল মাস্টার প্ল্যানারের হাতের কাজের ছাপ পাই। কী ঘটতে পারে সেটা উপলব্ধি করে, আপনার মনে হয়েছিল আপনাকে এমন কিছু লিখতে হবে যা কাজ করবে হিদাকার খুনে আপনার অ্যালিবাই হিসেবে। আর নিশ্চিত করতে হবে সেটা যেন অবশ্যই ডিটেক্টিভের নজরে পড়ে।

"এরপরই আসে ভিডিওর ব্যাপারটা। আগেই বলেছি ওটা ধারণ করা হয়েছে গতবছরের শেষ দিকে। এরপর নতুন বছরের শুরুতেই আপনি চুরি করেন হাতসুমির অ্যাপ্রন ও ছবি। সন্দেহ নেই, আপনিই ওই ট্র্যাভেল ফর্মগুলো পূরণ করেছেন ও কিনেছেন নেকলেসটা। আগে থেকেই কি আপনার কাছে ফাঁকা ট্র্যাভেল ফর্ম ছিল? মনে হয় ওগুলোও স্কুল থেকেই চুরি করেছেন। আপনার ড্রেসারে পাওয়া বিশেষ নকশার নেকটাই ও কাপবোর্ডে থাকা চায়ের কাপ, আপনার দাবি যেগুলো আপনাকে হাতসুমি উপহার দিয়েছে, আসলে ওগুলো আপনিই কিনেছেন। সম্ভবত সম্প্রতিই ওই দুটো জিনিস একসাথেই কিনেছেন আপনি নিজে।

"এরপর আমরা আসি সর্বশেষ ধাপে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুনেছি সবকিছু গোছগাছ করে কানাডাতে পাঠানোর জন্য সপ্তাহখানেক সময় লাগে হিদাকার। ওই সময়ের মধ্যে একবার তার বাড়িতে গিয়েছিলেন আপনি। আমার বিশ্বাস তখন আপনার লক্ষ্য ছিল গোপনে দুটো জিনিস ওদের লাগেজে ঢুকিয়ে দেয়া–ছুরি আর ভিডিওটেপ। ভিডিওটেপটা আপনি রাখেন হিদাকার একটা বইয়ের ভেতরে গর্ত করে, যেন মনে হয় গোপন কিছু লুকাতে চেয়েছে সে।

"এরপর ষোলো এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করেন আপনি, ওদিনই খুন করেছিলেন হিদাকাকে। স্পষ্টতইওটা মেজাজ হারিয়ে করা কোনো খুন নয়। ওটা পূর্বপরিকল্পিত, ঠান্ডা মাথার ভয়াবহ এক খুন। খুনটার পিছে ছিল দীর্ঘদিন ধরে বুনে আসা বিশাল পরিকল্পনা। এমনভাবে চিন্তা করে পরিকল্পনাটা করেছিলেন যেন আর দশটা খুনের সাথে এই খুনের পার্থক্য না বোঝা যায়। স্বীকার করতেই হবে, যে টুইস্ট দিয়েছেন এতে, সেটা দুর্দান্ত। জিনিয়াস! সাধারণত পূর্বপরিকল্পিত খুনগুলো করা হয় অ্যালিবাই বানাতে,

গ্রেফতার এড়াতে অথবা দোষ থেকে বাঁচতে। কিন্তু আপনার প্ল্যান ছিল একেবারে অনন্য। আপনার লক্ষ্য ছিল একেবারেই ভিন্ন। গ্রেফতার হতেই চেয়েছেন আপনি। পারফেক্ট ক্রাইম করার কোনো খায়েশ আপনার ছিল না। আপনি তৈরি করতে চাইছিলেন পারফেক্ট মোটিভ।

"জানি, ব্যাপারটা চমকপ্রদ। আপনি হয়ত দুনিয়ার প্রথম খুনি যে অপরাধ করার আগেই মিথ্যা মোটিভ বানিয়েছে। বিশ্বাস করুন, সত্যিটা জানার পর আমারও বিশ্বাস হচ্ছিল না। যে সত্যিটা উন্মোচন করেছি সেটা বিশ্বাস করতে দীর্ঘসময় লেগেছে। তদন্তের প্রত্যেকটা পদক্ষেপে সংশয় তৈরি হয়েছে আমার মধ্যে। এমনকি যে ব্যাপারগুলো সত্যির পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছিল, ওগুলাও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়নি।

"অবশ্যই, এভিডেন্সগুলো, যেমন ধরুন ভিডিওটেপটা, যদি আগে থেকেই ভালোমত খতিয়ে দেখতাম তাহলে হয়তো আরও আগেই সমাধান করা যেত এই ব্যাপারটার। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ এভিডেন্স প্রভাবিত করার দায়ে কে-ই বা একজন খুনিকে সন্দেহ করবে, যেখানে এভিডেন্সটা তার বিরুদ্ধেই যায়। সত্যিই, দুর্দান্ত খেল দেখিয়েছেন।

"আপনার বানানো জাল পান্ডুলিপিগুলো আর আপনার সাজানো ওই আলামতগুলো, যা নির্দেশ করে আপনার সাথে হাতসুমি হিদাকার অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপারে, ওগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এই এভিডেন্সগুলো যদি আপনাকে বাঁচাতে সাহায্য করত, তাহলে অবশ্যই ওগুলো মাইক্রোস্কোপের নিচে নিতাম আমরা। যদিও আমরা কিছুই করিনি কারণ এগুলো শুধুমাত্র আপনার মোটিভের সাথে সম্পর্কিত ছিল বলেই। দুর্ভাগ্যবশত, পুলিশ এমন সব এভিডেন্স নিয়ে ব্যস্ত থাকে যেগুলো সন্দেহভাজনকে সুবিধা দিতে পারে, এমনটা না করে বরং সেই এভিডেন্সগুলো খতিয়ে দেখা উচিত যা অপরাধের সাথে ভালোমত জড়িত করে সন্দেহভাজনকে। এই ব্যাপারটার-ই ফায়দা লুটেছেন আপনি।

"সতর্কতার সাথে জাল বিছিয়ে আমাদের তদন্তকে ভুল পথে পরিচালিত করেছেন। প্রথমটা হল আপনার বানানো নোটবুকগুলো। দ্বিতীয়টা হল অ্যাপ্রন, এরপর নেকলেস, ট্র্যাভেল ডকুমেন্ট ও হাতসুমি হিদাকার ছবি।

এগুলোর কথা ভেবে মনে হচ্ছে, আমাদের ছবিটা খুঁজে বের করতে দেরি হচ্ছে দেখে নার্ভাস হয়ে পড়ছিলেন। তখনই হয়ত 'গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের' ওই ইশারা আমাদের দেয়ার প্রয়োজনবোধ করেন আপনি। টোপটা আমি গিললে নিশ্চয়ই খুব স্বস্তি পেয়েছিলেন।

"তৃতীয় ফাঁদে পা দেয়ার জন্যও আমাকে একটু নির্দেশনা দেয়ার প্রয়োজন ছিল আপনার। আপনি যদি কুনিহিকো হিদাকার কানাডা পাঠানো টেপটার কথা রাইকে জিজ্ঞাসা না করতেন তাহলে ধরতেই পারতাম না এর গুরুত্বটা। নিশ্চয়ই সমুদ্রের ডাক বইয়ের ভেতরে টেপটা লুকানোর ব্যাপারটা নিয়ে খুবই আত্মতুষ্টিতে ভুগছিলেন আপনি। কেন না জাল মোটিভ বানানোর বুদ্ধিটা পেয়েছেন এই বইটা থেকেই। এমনকি আপনি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যেন এই বইটার ব্যাপারে অবগত থাকি আমি। এজন্যই প্রথম যেদিন দেখা হয় সেদিনই এর প্রসঙ্গ তোলেন আপনি। এগুলো সবই আপনার পরিকল্পনার অংশ ছিল, ঠিক না? বলতে বাধ্য হচ্ছি আমি মুগ্ধ।

"যেদিন কুনিহিকো হিদাকাকে খুন করেছেন সেদিনের প্রসঙ্গে আরেকটু ফেরা যাক। খুনটা বেশ সুপরিকল্পিতভাবেই করা, যদিও সেটা কাউকেই কোনোভাবে বুঝতে দেননি আপনি। দেখাতে চেয়েছেন, মুহূর্তের উত্তেজনার বশে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খুনটা করা হয়েছে। যেন কোনোভাবেই আপনার জাল মোটিভ ধরা না পড়ে। ছুরি বা বিষ এক্ষেত্রে কাজে আসত না, এই ক্ষেত্রে ওগুলো ব্যবহার করলে পূর্বপরিকল্পিত বলেই মনে হত ব্যাপারটাকে। শ্বাসরোধ? আপনার শারীরিক গড়ন বিবেচনায় নিলে ওটা একটু কঠিনই আপনার জন্য।

"নাহ, আপনার জন্য সেরা পন্থা ছিল ভোঁতা কোন অস্ত্র : যা দিয়ে পিছন থেকে আক্রমণ করা যায়। সে মেঝেতে পড়ে গেলে আরামে শ্বাসরোধ করা যাবে। তারপরও খুনের জন্য একটা ভালো অস্ত্রেরই দরকার ছিল আপনার। এমনকিছু যা সিনেই খুঁজে পাওয়া যাবে। হিদাকার পেপারওয়েট কাজটা সহজ করে দিয়েছে আপনার জন্য। কী দিয়ে শ্বাসরোধ করলেন? টেলিফোন কর্ড! আমি জানি, প্রত্যেকটা জিনিসের ব্যাপারে আপনি মাথার ভেতরে আগে থেকেই হিসাব করে রেখেছিলেন।

"কিন্তু সমস্যাটা হল, বাড়ির সব জিনিস প্যাক করা হয়ে গিয়েছিল ওদের। যদি পেপারওয়েটটা ওখানে না থাকত? ফোনকর্ডের মত, পেপারওয়েটটা অতটা প্রয়োজনীয় ছিল না। তবুও ওটা কোনো কার্ডবোর্ড বক্সে প্যাক করে রাখা থাকতেও পারত। এজন্য আপনি একটা বিকল্প জিনিস সাথে করে নিয়ে যান। ডম পেরিয়নের বোতল। বোতলটা আপনি বিকল্প অস্ত্র হিসেবে নিয়ে যান। এজন্য গিয়েই উপহারটা ওদের হাতে দেননি আপনি। দিলে ওরা হয়ত জিনিসটা আপনার নাগালের বাইরে অন্য কোথাও রেখে দিত। এজন্যই প্রথমে আপনাকে অফিসটা চেক করতে হয়েছে। পেপারওয়েটটা ওখানে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন আপনি। এরপর ওদেরকে শ্যাম্পেইনের বোতলটা উপহার হিসেবে দিতে আর কোনো বাঁধা থাকল না আপনার।

"প্রথমে যখন শ্যাম্পেইনের বোতলটার কথা শুনি, ভেবেছিলাম ওটাতে হয়ত বিষ মেশানো ছিল। এমনকি হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেছি এর স্বাদের ব্যাপারে। বলেছে বেশ ভালো। এখন অবশ্য জানি, আপনি কোনোদিনও বিষ ব্যবহার করতেন না।

"নিজের অ্যালিবাই বানানোর জন্য ওই কম্পিউটারের ফ্যাক্স সফটওয়্যারটা ব্যবহার করেন আপনি–দারুণ আইডিয়া। বয়স্ক ডিটেক্টিভকে বোকা বানানোর জন্য যথেষ্ট। আমি নিশ্চিত, এখনো ব্যাপারটা ধরতে পারেনি চিফ, যদিও ত্রুটি ছিল এতে। অন করা মনিটর ও বাড়ির ফোনে থাকা ভুল রিডায়াল নম্বর দেখে নিশ্চিত যে কেউই বুঝে যেত।

"ভাবছি, যদি আমরা না বুঝতে পারতাম তাহলে আপনি কী করতেন। যদি আপনাকে সন্দেহভাজন হিসেবেই না ধরতাম? দেখতে পাচ্ছি ইতস্তত করছেন আপনি। দুশ্চিন্তার কিছু নেই, আপনার ট্রিক আমরা দেখেছি, আর আপনার পরিকল্পনামত আপনাকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।

"আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। এতক্ষণ ধরে একটানা কথা বলার জন্য দুঃখিত। আর কিছুক্ষণ সহ্য করেন আমাকে। যতই হোক, আপনিই আমাকে এসবের মধ্যে এনে ফেলেছেন। একটু যন্ত্রণা তো আপনাকেও সহ্য করতেই হবে।

"তাহলে চলুন, কোটি টাকার প্রশ্নটা করা যাক...আপনার যেহেতু গ্রেফতার হওয়ারই ইচ্ছা ছিল, সেহেতু কেন এত ঝামেলা করে এই মিথ্যে, জাল মোটিভটা বানাতে গেলেন? ব্যাপারটা আসলেই অস্বাভাবিক।

"কুনিহিকো হিদাকাকে খুনের পিছে অবশ্যই আপনার একটা মোটিভ ছিল, সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মোটিভ। খুনের দায়ে গ্রেফতার হওয়ার থেকেও সত্যিকারের মোটিভ ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয় বেশি ছিল আপনার।

"মোটিভ যেটাই হোক না কেন, আমি জানি আপনার মোটিভ কি ছিল, কিন্তু এটা আমি আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাইছি। আচ্ছা? বলবেন না কেন? নীরব থাকার মত তো কোনো কারণ আমি আর দেখছি না।

"নাহ? ঠিক আছে। যেহেতু কথা বলার কোনো ইচ্ছাই আপনার নেই, সেহেতু আমিই বলি।

"জানেন এটা কি, মিস্টার নোনোগুচি? ঠিক, এটা একটা সিডি। কোনো মিউজিকের নয়। এটা সিডি রম, যার একটা পুড়িয়ে ফেলেছে হিদাকা। জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগে নিজের রিসার্চ ম্যাটেরিয়াল, ছবি সবকিছু সিডিতে রাখা শুরু করে সে। পুরনো ছবিগুলো স্ক্যান করে নেয় আর নতুন ছবি তোলার জন্য ব্যবহার করে নতুন একটা ক্যামেরা।

"কেন আমি হিদাকার সব রেফারেন্স ছবিগুলো দেখতে গেলাম? কারণ আমি অতীত ঘাঁটতে চেয়েছি। তার ও আপনার অতীত। একটা নির্দিষ্ট ছবি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে। আমি যা ভেবেছি সেটা যদি ঐ ছবিতে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে হঠাৎ-ই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা একটা জিনিসে খুব একটা নজর দেয়া হয়নি। আর এতে আপাত অসম্পর্কিত ব্যাপারগুলো সুন্দরভাবে মিলে যাবে।

"জানতে পারি আসল ছবিটা এরইমধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি জানতাম, মিস্টার হিদাকার কাছে এই ছবিটা একসময় ছিল। আর ওটা কপি করার মত যথেষ্ট সময় সে পেয়েছে। এই সিডিতেই সেটা কপি করা আছে। দুঃখিত, জানি খুবই নাটকীয় আচরণ করছি। কিন্তু এই জিনিসের কোনো দরকার নেই। আপনি এরইমধ্যে জানেন কোন ছবির কথা বলছি আমি। একটা পুরনো পোলারয়েড ছবি। ছবিটা মিডল স্কুলের এক মেয়েকে মাসায়া ফুজিওর যৌন হয়রানির।

"ছবিটা বেশ পরিষ্কার। ভাবছিলাম আপনার জন্য প্রিন্ট আউট করে নিয়ে আসব। পরে ভাবলাম, এর কোনো দরকার নেই। আপনি ভালোমতই জানেন ছবিতে কী দেখেছি আমি। যা ধারণা করেছিলাম ঠিক সেটাই। মেয়েটাকে আপনিই চেপে ধরেছিলেন, মিস্টার নোনোগুচি। ওই মেয়েটাকে ধর্ষণ করতে আপনিই ফুজিওকে সহায়তা করেছেন।

"আপনার স্কুল জীবনের ব্যাপারগুলো খতিয়ে দেখতে গিয়ে একেক মানুষের মুখে একেক কথা শুনি। বুলিয়িং বা হয়রানির প্রসঙ্গ বেশ কয়েকবার-ই উঠে এসেছে। কেউ কেউ বলেছে আপনি ছিলেন ভিকটিম, বাকিরা বলেছে আপনিও হয়রানকারীদের একজন। আমার মতে ওই দুই পক্ষের কথাই ঠিক। আপনি হয়রানির শিকার হয়েছেন, এমনকি ফুজিওর গ্যাংয়ে যুক্ত হওয়ার পরও আপনার ওপর হয়রানি চলমান ছিল। খালি বদলে গিয়েছিল আপনার ওপর হওয়া হয়রানির ধরন।

"শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দুজনেই জানি, বুলিং বা হয়রানির কোনো শেষ নেই। একটা স্কুলের বুলিংয়ের সাথে জড়িত ছেলেরা এসব চালাতেই থাকে। যদি কোনো শিক্ষক বলে, 'আমার ক্লাসে আর কোনো বুলিং বা হয়রানি নেই,' তবে ধরে নিতে হবে সে বলতে চাইছে, 'আমি বিশ্বাস করতে চাই আমার ক্লাসে আর কোনো বুলিং বা হয়রানি নেই।'

"বুঝতে পারছি, মেয়েটার সাথে যা ঘটেছিল সেটা আপনার হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। আমি বিশ্বাস করি না, আপনি যা করেছেন সেটা স্বেচ্ছায় করেছেন বা কাজটা করে মজা পেয়েছেন। আপনি জানতেন মাসায়া ফুজিওর কথার অমান্য করলে আবারও আপনার জীবন জাহান্নাম হয়ে যাবে। আমার মতে, নিশ্চয়ই নিজের কাজের জন্য অনুশোচনা হয় আপনার, ঘৃণা হয় নিজের প্রতি। ঐ জায়গায় আমি উপস্থিত না থাকলেও, এই যন্ত্রণাটা অনুভব করতে পারি, মিস্টার নোনোগুচি। ওইদিন-ই আপনি শেষবারের মত হয়রানির শিকার হয়েছিলেন, সম্ভবত সবথেকে বাজেভাবে।

"আপনি খুব করে চাইতেন অতীতের ওই দুঃসহ স্মৃতিটা কবর দিতে। এটা ভোলার জন্য এতই মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, আপনি খুন করতেও পিছ পা হননি।

"দাঁড়ান। কেন এই গূঢ় সত্যটা বিব্রত করছে আপনাকে? নিষিদ্ধ প্রান্তর বইটা লেখার আগেই হিদাকার হাতে এসেছিল ওই ছবিটা। এটা সে অন্য কাউকে দেখিয়েছে এমন কোনো আভাস আমরা পাইনি। কেন নিশ্চিত হতে পারলেন না, আপনার গোপন রহস্য নিরাপদ-ই ছিল হিদাকার কাছে?

"দয়া করে এখন বলবেন না হিদাকা এই ছবিটা দিয়ে ব্ল্যাকমেইল করত আপনাকে। একই মিথ্যা দ্বিতীয়বার কাজ করবে না। আর এরকম শৈল্পিক একটা অপরাধের নেপথ্যে থাকা মানুষের মুখে এই কথাটা মানাবেও না।

"আমার মতে আগুনে ঘি ঢেলেছিল মিয়াকো ফুজিও। বইটা লেখার কারণে কুনিহিকো হিদাকাকে কোর্টে তোলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল সে। বিশেষ করে বইয়ে তার ভাইকে আবছাভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল বলেই। হিদাকা সম্ভবত ধরেই নিয়েছিল এই সমস্যাটা এড়ানো যাবে না। এটাই মূলত দুশ্চিন্তায় ফেলে আপনাকে। ভেবেছিলেন, ছবিটা কোর্টে এভিডেন্স হিসেবে দেখানো হলে কী হবে আপনার।

"আমার ধারণা, আপনার দুশ্চিন্তার শুরু হিদাকার ওই উপন্যাসটা লেখা শুরু করার পর থেকে। মিস ফুজিও হিদাকাকে চাপ দেয়া শুরু করলে আতঙ্ক বাড়তে থাকে আপনার। অবশেষে খুন করার জন্য প্রস্তুত হন আপনি।

"ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্যই। কিন্তু আমার চোখ এড়িয়ে যায় ধাঁধার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ টুকরো : কুনিহিকো হিদাকার সাথে আপনার সম্পর্কের ধরন। কেন আপনার মনে হল এই বিষয়টা গোপন রাখতে হিদাকাকে খুন করা প্রয়োজন? যে লোকটার সাথে সাম্প্রতিক কয়েক বছর ধরে বন্ধুত্বের সম্পর্ক চলছিল আপনার। আপনার অথবা আপনি যা করেছেন সেই ব্যাপারে নিজের উপন্যাসে কোনো ইঙ্গিত-ই দেয়নি সে। এমনকি যদি মিয়াকো ফুজিওর সাথে হিদাকার সমস্যাও বাঁধে, তবুও কেন আশা করলেন না আপনার গোপন ব্যাপারটা হিদাকার কাছে নিরাপদ থাকবে?

"আপনার স্বীকারোক্তিতে হিদাকার সাথে মিস ফুজিওর এক ধরনের বৈরিতা আছে বলে দাবি করেছেন। আপনার লেখা সবকিছু নিয়েই প্রশ্ন তোলার অধিকার তো আমার আছে এখন, ঠিক না? চলুন কিছু ব্যাপার নিয়ে আলাপ করা যাক যেগুলো এমনিতেই বোঝা যায়। প্রথমত মিডল স্কুলে

হিদাকার সাথে আপনার বন্ধুত্ব ছিল না, এরপর তার সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে ও একসময় গিয়ে তার সাথে একটা ভালো সম্পর্ক দাঁড় করাতে পেরেছেন। এমনকি আপনাকে একজন প্রকাশকের সাথে পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছে সে যেন আপনি একজন লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। শিশুসাহিত্যের লেখক। এছাড়াও মিয়াকো ফুজিওর সাথে বারবার আলাপ কিংবা নিষিদ্ধ প্রান্তর বইয়ে আপনার নাম ও ওই ঘটনার সাথে আপনার সংশ্লিষ্টতা বিচক্ষণতার সাথে এড়িয়ে গিয়েছে সে।

"এইসব ঘটনার ওপর ভিত্তি করে যদি আমরা ধারণা করার চেষ্টা করি মানুষ হিসেবে আসলে কেমন ছিল হিদাকা, তাহলে দেখা যাবে, সে ছিল তার ছোটবেলার-ই প্রতিরূপ 'একটা ছেলে, যে চারপাশের সবার প্রতিই মমতাশীল,' এমনটাই বলা হত তার ব্যাপারে। ফলে বলা যায়, আপনার উদ্দেশ্য যেমনই হোক না কেন, আপনাকে ভালো বন্ধু বলেই মনে করত হিদাকা।

"এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে আমার অনেক সময় লেগেছে। কেন না হিদাকার এই প্রতিচ্ছবি, তদন্তের শুরুতে হিদাকাকে যেরকম ভেবেছিলাম সেটার থেকে একেবারে ভিন্ন। সত্যি বলতে, হিদাকার ছোটবেলার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তার ওই প্রতিচ্ছবি আমাকে ভালোমতোই খুঁচিয়েছে।

"তার ব্যাপারে আমি যা শুনছি ও আপনার মিথ্যে স্বীকারোক্তি পড়ে তাকে যেভাবে ভেবেছি, এই দুইয়ের মাঝে যে বিস্তর ফারাক, সেটাই কি আমার মনের ভেতরকার ওই বিচ্ছিন্নতার কারণ? নাহ–হিদাকার ব্যাপারে ওরকম নেতিবাচক মনোভাবের বীজ আমার মনের মধ্যে বহু আগেই বোনা হয়েছে। এমনকি আপনার গ্রেফতারেরও আগে। অবশেষে বুঝতে পেরেছি এর সূত্রপাত কোথায় : খুনের দিনের ব্যাপারে আপনি যে লেখাটা লিখেছেন ওখান থেকে।

"আমি ঐ লেখাটা প্রথমবার পড়ার সময় মনোযোগ দিয়েছিলাম লাশ খুঁজে পাওয়ার বিবরণের দিকেই। তাছাড়া আরও একটা গভীর ফাঁদ পাতা ছিল ওতে।

"আপনার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি একেবারে জায়গামতই আঘাত হেনেছি আমি। হ্যাঁ, ঠিক...আমি বিড়ালটার কথাই বলছি। যেটাকে খুন করেছেন আপনি।

আপনার অ্যাপার্টমেন্টের গাছের মাটিতে কীটনাশক খুঁজে পেয়েছি আমরা। অতিরিক্ত কীটনাশকটুকু ড্রেনে ফেলে দিলেই ভালো করতেন। বিড়ালের দেহে যে কীটনাশক পাওয়া গিয়েছে সেটা মিলে গিয়েছে আপনার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পাওয়া কীটনাশকের সাথে। বিড়ালটার মালিক ওটার মৃতদেহ একটা বক্সে ঢুকিয়ে তার বাগানে দাফন করেছিল। আমরা কবর থেকে বিড়ালটাকে তুলে ওর দেহ পরীক্ষা করি।

"সম্ভবত আর্টিকেলে বিড়াল নিয়ে হিদাকার সমস্যার কথা পড়েছিলেন আপনি? অথবা তার সাথে আপনার সম্পর্ক ভালো ছিল, সে-ই হয়তো এই ব্যাপারে আপনাকে বলেছিল? তো আপনি মিটবলে বিষ মিশিয়ে বাগানের মধ্যে ফেললেন। ওই মহিলার বিড়াল সেটা খেয়ে মারা গেল। এই সবকিছু আপনি করেছেন আমার মধ্যে হিদাকার ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করতে।

"জানেন, এই কেসে কাজ করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম সাহিত্য জগতে সময় কাটাতে হবে আমাকে, এজন্য এর সম্পর্কে কিছু পড়াশোনা করবো বলে ঠিক করি। তখনই জানতে পারি সাহিত্যে চরিত্র তৈরি বা ক্যারেক্টারাইজেশনের ব্যাপারে। স্পষ্টতই, একটা চরিত্র কেমন সেটা এক-দুই লাইনে পাঠককে বলে দেয় না লেখক। এর পরিবর্তে ওই চরিত্রের বিভিন্ন অভ্যাস, কথা বলার ধরন দেখিয়ে দেয়। যার সাহায্যে একজন পাঠকের কল্পনায় ভেসে ওঠে ওই চরিত্রের প্রতিচ্ছবি।

"তো প্রথমে ওই লেখাটা লেখার সময় আপনি জানতেন যত দ্রুত সম্ভব মূল চরিত্র মানে কুনিহিকো হিদাকাকে তৈরি করতে হবে। তার নিষ্ঠুরতা দেখানোর জন্য তাকে দিয়ে একটা বিড়াল খুন করানোর থেকে আর ভালো কি উপায় থাকতে পারে? কী কাকতলীয় ঘটনা, বিড়ালের মালিকের সাথে ওইদিন-ই বাগানে দেখা হয় আপনার। লেখার শুরুতেই ওই ঘটনাটা লিখে হিদাকার অন্যায় আচরণ আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা গিয়েছে।

"পুরোদমেই বোকা বনে গিয়েছি। এমনকি আপনাকে গ্রেফতারের পর যখন বুঝলাম ওই লেখাটার ওপর ভরসা করা যাবে না, তখনও কল্পনাই করতে পারিনি বিড়ালের ব্যাপারটা মিথ্যে হতে পারে। আর হিদাকার প্রতি আমার প্রথম মনোভাবও সংশোধনের চেষ্টা করিনি।

"প্রথম যখন টের পেলাম বিড়ালটাকে আপনি খুন করেছেন, মাথার ভেতর বাতি জ্বলে উঠল। মনে হল, ঠিক যে কারণে বিড়ালটাকে খুন করেছেন, পুরো অপরাধটা ঘটার কারণও যদি ওটাই হয়ে থাকে? অন্যভাবে বললে, আপনার লক্ষ্য শুধু হিদাকা খুন করাই ছিল না, সেইসাথে তার যশখ্যাতি ধুলোয় মিশিয়ে দেয়াও? তখনই বুঝলাম কোনো একটা দিকে এগোচ্ছি।

"একটু আগেই বললাম, আপনি আপনার অতীত ঢাকতে চাইছিলেন একমাত্র যে ব্যক্তি সেটার ব্যাপারে জানতো তাকে খুন করেই। আপনি এটা অস্বীকার করার কোনো চেষ্টাই করেননি, আমার মনে হয় এই কথাটা একটু হলেও সত্যি। কিন্তু আপনার পরিকল্পনার পেছনে মূল কারণ এটা ছিল না, এটা শুধুই সর্বশেষ ধাপ ছিল আর কি।

"যখন সিদ্ধান্ত নিলেন হিদাকাকে মরতে হবে, তখন আপনার পরবর্তি পদক্ষেপ কী ছিল? প্রথমে আপনি বুঝতে পারলেন আপনার একটা নির্দিষ্ট মোটিভ দরকার। এমন কিছু দরকার যা প্রকাশ পেলে ভিক্টিমের মানহানিই তো ঘটবেই সেইসাথে যেন আপনিও লোকের সহানুভূতি পাবেন। যে সমাধানটা পেয়েছেন সেটার শুরু তার স্ত্রী হাতসুমির পরকীয়ায় আর শেষ জোর করে চাপানো গোস্টরাইটিং দিয়ে। আপনার পরিকল্পনা ঠিকভাবে সফল হলে হাতসুমির সম্মান, হিদাকার চরিত্র সবকিছু তো ধ্বংস হতই, সেই সাথে লেখক হিসেবে যে সম্মান হিদাকা অর্জন করেছে কালি পড়ত সেগুলোতে। এদিকে তার লেখাগুলোর সব ক্রেডিট পেতেন আপনি।

"কষ্ট করে ওই পান্ডুলিপিগুলো লেখা ও রাতের তীব্র ঠান্ডায় ভিডিও বানানোর যোগ্য পুরষ্কার-ই হত সেটা। আমার মনে হয় না শুধুমাত্র নিজের অতীত ঢাকতে এতকিছু করেছেন আপনি। ওটার জন্য একটু কষ্ট করাই যায়, কিন্তু খুনটা ছিল আপনার পরিকল্পনার আরেকটা ধাপ, তাকে খুন করে এযাবৎ হিদাকা যা অর্জন করেছে সেসব ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন আপনি।

"আমি দীর্ঘসময় ধরে ভেবেছি, কেন কেউ এরকম কাজ করবে। নিজের জীবনের অবশিষ্ট যেটুকু সময় আছে, সেটা কেন অন্য কাউকে ধ্বংস করতে কাজে লাগাবে। সত্যি বলতে এরকম আচরণের পিছে কোনো যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাইনি আমি। ভাবছি, আপনার নিজের কাছেও এর কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা আছে কি না, মিস্টার নোনোগুচি।

"দশ বছর আগে ঘটা একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল আমার। সম্ভবত, আপনারও মনে আছে, ঠিক গ্র্যাজুয়েশনের পরেই বখাটে গ্যাংয়ের নেতাকে ছুরি মারে আমার এক ছাত্র। পুলিশ বখাটেদের জিজ্ঞেস করেছিল কেন বারবার আমার ওই ছাত্রকে হেনস্তা করত ওরা। ওরা উত্তর দিয়েছিল, 'তাকে পছন্দ করি না বলে'। শুধুমাত্র ঘৃণা, খাঁটি বিদ্বেষ-ই এর কারণ। ইংরেজিতে যাকে বলে ম্যালিস। আপনি তো ইংরেজি কম্পোজিশনের ক্লাসও নিতেন মাঝে মাঝে, শব্দটা আপনার নিশ্চয়ই পরিচিত।

"আমার মনে হয়েছে, আপনার অবস্থাও ওরকমই কি না। আসলে আপনার অন্তরে থাকা হিদাকার প্রতি অসীম বিদ্বেষ-ই হিদাকার মৃত্যু ডেকে এনেছে। যে বিদ্বেষের পরিমান আপনার নিজের পক্ষেও পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

"কিন্তু এরকম বিদ্বেষ আপনার ভেতর কিভাবে জন্মেছে?

"আপনার ও হিদাকার দুজনের অতীত নিয়েই বিস্তর ঘাঁটাঘাঁটি করেছি আমি। কিন্তু হিদাকার প্রতি আপনার এত ক্রোধের কারণ আমি খুঁজে পাইনি। ভালো ছেলে ছিল হিদাকা...নাহ, আলাদা রকমের ছিল সে। তাকে খুন নয়, ধন্যবাদ দেয়া উচিত ছিল আপনার। আপনি মাসায়া ফুজিওর চামচামি করতেন, হিদাকাকে হেনস্তা করার জন্য উস্কানি দিতেন। তবুও হিদাকা আপনাকে সাহায্য করেছে।

"জানি, তার কাছে নিজেকে ছোট মনে হত আপনার। প্রাপ্তবয়স্ক হয়েও হিদাকাকে কতটা ঈর্ষা করতেন সেটাও জানি। তার একজন সফল লেখক হওয়ার ব্যাপারটা কখনোই মানতে পারেননি আপনি। আপনি যা যা চাইতেন, সবকিছুই অর্জন করে সে। হিদাকার প্রথম সম্মাননা পাওয়ার সময় আপনার অনুভূতি কেমন ছিল, সেটা ভাবলেই গা শিউরে ওঠে আমার।

"কিন্তু এখনও সে আপনার ধরাছোঁয়ার বাইরে, ঠিক না। একজন লেখক হওয়ার জন্য এতটাই মরিয়া ছিলেন আপনি। ভেবেছিলেন তার সাথে সম্পর্ক রাখলে সহজেই আপনার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। তো সাময়িকভাবে হলেও হিদাকার প্রতি আপনার ভেতরে থাকা বিদ্বেষ ভুলে থাকার চেষ্টা করেছেন।

"কাজটা সহজ নয়, ঠিক না? জানি না এটা আপনার দুর্ভাগ্য, প্রতিভার অভাব, নাকি দুইয়েরই মিশ্রণ, কখনোই নিজের স্বপ্নকে ধরতে পারেননি আপনি। শরীরটা ভেঙে পড়া শুরু করলে, টের পেলেন কখনোই নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন না।

"যখন বুঝতে পারলেন নিজের মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, থামাতে পারলেন না নিজেকে। অন্তরে ক্রোধের অনল নিয়ে মরতে ইচ্ছা করছিল না আপনার। এদিকে হিদাকা জানত আপনার অতীতের ব্যাপারে, ব্যাপারটা ফাঁস করে দেয়ার মত প্রমাণ তার হাতে ছিল। তবে এই কারণে ওরকম কিছু করেননি আপনি। এটা শুধু প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। আপনাকে ঠেলে দিয়েছে নিকষ কালো অন্ধকারের পথে। জীবনের শেষ দিনগুলো একটা নিখুঁত অপরাধ ঘটানোর পরিকল্পনা করে কাটিয়েছেন আপনি। একজনকে খুন করে নিজ থেকেই ধরা পড়েছেন যাতে আপনার ভিক্টিমের সবকিছু ছিনিয়ে নিতে পারেন। যেন ধ্বংস করতে পারেন তার সুনাম, সম্মান, খ্যাতি, যা কিছু সে ভালোবাসত। এমনকি চুরি করতে চেয়েছিলেন তার লেখা বইগুলোর ক্রেডিটও।

"এসবই আমার অনুমান। এতক্ষণ যা বললাম এতে আপনার কোনো দ্বিমত আছে? আপনার মৌনতাকে 'না' হিসেবে ধরে নেব আমি।

"যাওয়ার আগে শেষ একটা উপদেশ দিয়ে যাই। আপনাদের ব্যাপারে মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে জেনেছি ওরা মনে করত হিদাকা ও ওই এলাকার অন্যান্য মানুষদের অপছন্দ করতেন আপনি ও আপনার মা। এদের প্রতি একধরনের বিরূপ মনোভাব ছিল আপনাদের। এই বিরূপ মনোভাবের কোনো ভিত্তি নেই। অন্য কারোরও ওদের প্রতি বিরূপ মনোভাব ছিল, এমন কোনো আভাস পাইনি। আমার মনে হয়েছে হিদাকার প্রতি আপনার এই ঘৃণার সৃষ্টি আপনার ভেতর থেকে নয়। আপনার মা-ই হয়তো হিদাকার প্রতি

ঘৃণার বীজ আপনার মধ্যে বপন করে দিয়েছিল। আপনাকে এটাই শুধু জানিয়ে রাখলাম। যেহেতু হিদাকাকে আর দোষারোপ করতে পারবেন না, চাইলে আপনার মাকে দোষারোপ করতে পারেন।

"অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি, তাই না? গলা শুকিয়ে গিয়েছে আমার। সার্জারি করানোর অনুমতি দিয়েছেন আপনি, খোঁজ নিয়ে দেখলাম এটা পরিবর্তন করা যাবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে ডাক্তাররা। আশা করছি আপনার সার্জারি সফল হবে। আরও অনেকদিন বাঁচবেন আপনি।

"যা-ই হোক, সামনে দীর্ঘ বিচারকাজ অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।"

...